অন্তর্গত রক্ত : জীবনানন্দ

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক :
পি. আর. এস.
দি সরস্বতী প্রিন্টিং.ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

জীবনানন্দের নিবিড় অনুরাগীদের উদ্দেশে

Every poem an epitaph
—T S Eliot

salimmo suso, ei primo ed io secondo,
tanto ch' io vidi delle cose belle
che porta il ciel, per un pertugio tondo;

e quindi uscimmo a riveder le stelle
Inferno . Canto XXXIV, L 136-39—Dante

বার্ণিক রায়

রচিত

প্রবন্ধ

হ্বাগ্‌নের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য
প্রতীক অরণ্য
অনুভবের সত্য
কবিতায় মিথ্‌
শিকড়ের সত্য
কবিতা : চিত্রিত ছায়া
ইতিহাসচর্চা
বিদ্যাসাগর
এলিঅট ও বাংলাসাহিত্য
কবিতার একাল
স্মৃতি-বিস্মৃতির ছবি
এলিঅটের নাটক ও অন্যান্য

কবিতা

আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার
শরীরের উদ্ভিজ্জ ছায়ায়
নীল দুপুরের ভয়
হে আমার মৃত্যু
বালির ঘড়ি
উপবর্হণ
এলোমেলো ছড়া
প্রথম সাক্ষাৎ
শুধু বেঁচে আছি
দিব্য কবিতামালা ও সুন্দরবনের এলিজি

নাটক

স্ফুলিঙ্গ
কয়েদখানা
চক্ষুহীন বেদনা (অ্যাবসার্ড)
নীল বিষ
সময়ের ভিড় (অ্যাবসার্ড)
বাবুই (নাট্যোপন্যাস)

ইংরেজি

Looking for an Address
The Fetid Pool

উপন্যাস

বিষণ্ণ বসন্ত
বেদনার্ত স্রোত
ভ্রান্তি
কালো গান
বাপ্পার জন্যে
সন্দেহের সূর্য
নিঃসঙ্গের ডায়েরি — ইত্যাদি

অনুবাদ

এলিঅটের ‘পড়ো জমি’
স্যাঁ-জন্‌ প্যার্সে’র ‘আনাবাস্‌’
উইলিয়াম ম্যাশনের একুশটি কবিতা

ইত্যাদি

নিবেদন

অতিরিক্ত ও অসহ্য যন্ত্রণাবোধ এক অন্ধকার ও দুর্বোধ্য মানসিক স্তরের গভীরে আমাদের নিয়ে যায়। প্রকৃত ও সৎ কবি জীবনের ও জগতের নির্বাসন উদ্বেগ কলঙ্ক ও দুর্দশা—কল্পনার অনুভবের গাঢ়তার সময়ে ক্রিয়মাণ হতে হতে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা সামগ্রিক রূপ লাভ করে প্রতিটি শব্দের সুরে ছন্দে ধ্বনি ও বাক্যের পদের সমূহ সমীচীন ঐক্যের যুক্তির নিয়ম পরম্পরায়; শব্দের একটি ধ্বনির পরিবর্তন ও নিঃসরণও অসহনীয়। এইভাবেই হয়তো, রচনার মধ্য দিয়ে তার আত্মার অভিযান অনন্তে পথ কেটে নেয়। তাঁর জীবনের দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতার উপকরণে উদ্বেগ নির্বাসন দুর্দশা ব্যর্থতা অখ্যাতির জ্বালা এক ধরনের বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ যেমন জাগায় শব্দে-বাক্যে-ধ্বনিতে, তেমনি এক অজানা অবোধ নিহিত সুর তার ওপর ফুলের স্পর্শ লাগিয়ে দেয়; যে-মুহূর্তে উদ্বেগ দুর্দশা নির্বাসনের কথা বলছেন, সেই সময়ই দিবাস্বপ্নের মতো ধানসিরিতে জেগে ওঠে তাঁর চোখের সামনে সোনালি শস্য, শরতের সকাল দুপুর, একটি তন্বীর ছবি, যে তাকে চিনতো-বুঝতো, জীবনানন্দের মর্ম উপলব্ধি করতো, একটা প্যাশন ও রোমাঞ্চের চেয়েও বেশি এক দূরতর অথচ উজ্জ্বল বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথাগত ব্রাহ্মপরিবেশ মারাত্মক মনে হয় তাঁর কাছে, অথচ তিনি ব্রাহ্ম, শ্রাদ্ধবাসরে 'মধুবাতা ঋতায়তে' মন্ত্র আওড়ান। পিতার প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মরীতিনীতিতে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। লেখা চেয়ে নিয়ে না ছাপলে বিষময় প্রচারের তীব্র আঘাত লাগে তাঁর বুকে—এই সব থেকেই তাঁর সম্মিলিত অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার ভেতরে চিন্তাভাবনা কল্পনা ও প্রতিভা, যার সাহায্যে শিল্পের রূপ অভিনব ও অলৌকিক হয়ে ওঠে ; এই অলৌকিক শিল্প দিয়েই জীবনানন্দ চেয়েছিলেন বহুবস্তুর অদেখা আবেদনকে উন্মোচন ও প্রকাশ করতে, যারা 'ডগ্‌মা'য় বিশ্বাসী তাদের কাছে ভীষণ ও মারাত্মক মনে হতো। তিনি জানতেন, সার্থকতা খ্যাতি উন্নতি সংগতি, পারিপাট্যের ক্রিয়া, অনুসন্ধানের আকুলতাকে, সন্দেহ-সংশয়কে, অস্থিরতাকে, বিপ্লব ও আদর্শকে নষ্ট করে দেয়, নিরন্তর অনুসন্ধিৎসাই তাঁর অদিতি; এই অনুসন্ধানের মধ্যেই আয়রনি ও দুর্বোধ্য গভীর অন্ধকার রহস্য, শিকারের সঙ্গে শিকারিও কখন দুর্বোধ্য অমঙ্গলবোধে ও অসহায়তায় জড়িয়ে যায় নিগূঢ় রহস্যে। এলিঅটের মতোই তাঁর বোধে জড়িয়ে থাকে মৃত্যুর মধ্যে জীবন, জীবনে মৃত্যু ; এবং ইয়েট্‌সের মতোই সমান্তরালে অনুভব করেন তিনি : তিক্ত আত্মাকে সৃষ্টি করে মানুষ যতোক্ষণ সমগ্র কিছু করে না তোলে, চন্দ্র সূর্য তারা স্বপ্ন দেখে, আর তখনই চন্দ্র-অতিক্রান্ত স্বর্গ সৃষ্টি করে;

আরেকটি ছবি তুলে বলা যায় : ভয়ংকর অস্পষ্ট আঙুলে পালকময় গৌরব নষ্ট হয়; বাতাসের বর্বর রক্তে পশু সৌন্দর্যকে চেপে ধরে, এই পশুশক্তিতেই সৌন্দর্য তার জ্ঞানকে কি বাড়ায় ? আবার ব্লেকের আদর্শেই ইয়েট্‌সের মতোই জীবনানন্দ তারাদের আছড়েছেন শস্যের মতো; আত্মাকে আছড়েছেন তুষ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বের করবার জন্যে। এইটাই কবিতার পরম রহস্যের আনন্দ। জীবনানন্দের ইতিহাসবোধের মধ্যে হেগেল ও এলিঅট কাজ করলেও সমগ্র বিশ্বের মানুষ অনাদ্যন্ত কাল থেকে সুনিশ্চিত 'আনন্দময় ধ্রুবলোকে' সত্য ও আলোর জন্যে অসংশয়ে যাত্রা করেছে—একথা তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী সুচরিতার লেখায়ই পেয়েছি।

জীবনানন্দ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন ; এই প্রবন্ধগুলিতে কবিতা হয়ে-ওঠার নির্ভুল প্রক্রিয়া ও তথ্য দিয়েছেন; তেমনি যুরোপীয় ও বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের নির্যাস সুপরিস্ফুট, এলিঅটের ধারাতেই চণ্ডীদাস আলাওয়াল ভারতচন্দ্র রামনিধিগুপ্ত দাশরথি রায় ঈশ্বরগুপ্ত মধুসূদনের উল্লেখ করেছেন মূল স্বরূপকে তুলে ধরে ; মধুসূদনের আধুনিকতার পরিমাপ নিতে চেয়েছেন অপূর্বভাবে : হৃদয়ঙ্গমতা ও রসাস্বাদনের ও রূপের পার্থক্যে। বঙ্কিম উপন্যাস লিখলেও তিনি যে-কবি জীবনানন্দের বীক্ষায় স্পষ্ট ধরা পড়েছিলো ; কেননা, তাঁর মতে নাট্যকবি বা ঔপন্যাসিক প্রাতিভাসিক জগতের সামগ্রিকতা ভেঙে ফেলেন, ভেঙে সেখান থেকে বিশুদ্ধতাকে টেনে আনেন। আর লিরিক কবির প্রতিভা তিন ভুবনকে সংশ্লেষে এক করে নেয় ; এর মধ্যে প্রকৃতির সময়, সমাজ, মানবধর্ম, প্রকৃতি, সময়, ভাবনা, ইতিহাস—বেদনার গন্ধের মতো এক হয়ে মিশে থাকে ; কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতায় নির্মলতর হয়ে উঠতে পারে, 'কবিতা মানসের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে'। আমার মনের নিহিত গোপনে দান্তে শেক্‌সপিয়র ও রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় তুলনামূলক বিচার সব সময় কাজ করে ; কিন্তু জীবনানন্দ বহুকাল আগেই 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্ট বলেছেন : দান্তে মানব জীবনের অতল গভীরে রহস্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন ; এলিঅটের ভাষায় ভার্জিলও দান্তেকে পথ দেখাতে সাহস পান না ; আর শেক্‌সপিয়র বিশ্বের মানুষের জীবনে বৈচিত্র্যকে নিপুণ ও সমগ্রভাবে প্রকাশ করেছেন কিট্‌সের 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি'র সাহায্যে; আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য—আমার মনে হয়—দান্তের স্বকীয় গভীরতার কাছে অল্প বিস্তর পরাহত — এই দুই রকম ফসলের প্রাচুর্যই তাঁর সাহিত্যে রয়ে গেছে—অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক ধী-শক্তি ও নিপুণ প্রয়োগ বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের সাহায্যে এক অসাধারণ অলোক-সামান্য গীতিকবির জন্ম দিয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর ও ঔপনিষদিক ভারতবর্ষের মানুষ হিশেবে একটি তৃতীয় সূক্ষ্মানুভূতি ও সংবেদনশীলতা এক নতুন দীপ্তি এনে দিয়েছে।

কিয়ের্কেগার্ড যেমন মানুষের চিরপ্রাণধর্মে টিকে থাকবার কথা বলেছেন, তেমনি গ্রিক

নাটকে আছে আগাগোড়া ছেদ ও বিচ্ছেদের ধারণা এবং মানুষের জীবনের অন্তর্নিঃসহায়তার কথা। জীবনানন্দের কাব্যিক বোধ কতো তীক্ষ্ণ দান্তের সঙ্গে ব্যাসদেবের তুলনায় স্পষ্ট হয়; 'কম্মেদিয়া'য় ভাবনা বেদনা শ্লেষ ধিক্কার আগুন গভীরতা সত্ত্বেও মহাভারত প্রায় 'অনিঃশেষ ক্রন্দসী'কে আলিঙ্গন করেছে বেশি—এই বোধই তাঁর কবিতাকে মহান্ করে তুলেছে এ-যুগে।

তথাপি রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে তাঁর কবিতার ধ্যেয় ছিলেন না : এ-যুগ খুব জটিল বলে, এলিঅটের মতো কাব্যও জটিল বিন্যাস দাবি করে; সেই সঙ্গে সতর্কতা ও অধ্যবসায়; যুগ ধর্ম ও সময়কে স্বীকার করতেই হয় ; তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা : তথাকথিত রোম্যান্টিকতাহীন, সততা সূক্ষ্মতা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ও যুক্তিতে পাঠকের মনকে ধীরে ধীরে সক্রিয় ও প্ররোচিত করে স্বতন্ত্র দীপ্ত হয়ে ওঠে : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, সমাজ রাজনীতি, প্রেম, প্রকৃতির স্পর্শ জেগে থাকে; অতীন্দ্রিয়তা নয়, বৈজ্ঞানিক মন চাই একালে; এই ভাবেই আধুনিক মন এক বিশ্বাস আবিষ্কার করে আলোকের ভাষায়; বিভ্রান্তির যুগে আস্থা দরকার: এই আস্থা বাস্তবের আলোকে মূর্ত, নিজের অন্তর্জগতে সুসংগঠিত ; এই সুসংগঠনের চাই পরীক্ষানিরীক্ষা, উদ্‌ভাবন, বিচার, সতর্কতা, নিরন্তর অনুসন্ধান। এমনিভাবেই অনন্ত পথ খোঁজার মধ্য দিয়ে, দেশি ও পাশ্চাত্য সাহিত্যকে আত্মসাৎ করে আধুনিকতার সামঞ্জস্যময় উজ্জ্বলতা আসবে। এই উজ্জ্বলতায় সংবিদের আনন্দ যেমন, তেমনি কখনো কখনো, লুঙিনুসের ভাষায়, আনন্দময় উন্মাদনাও উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। এবং রবীন্দ্রবিরোধিতায় নতুন বোধের আগুন জাগে প্রশ্নে অপচয়ে ক্ষয়ে অন্ধকারে, রহস্যময় অবাধ বোধে ; কবির সৃষ্টিপ্রেরণা তখন মূর্ত ও আলোকিত হয়। এবং প্রকাশের জন্যে ট্র্যাডিশনালিজম, জর্জিয়ানিজম, ইমেজিজম, আইরিশ জাগরণের ওয়র পোয়েট্রি এবং বিদ্রোহের কবিতার কাছে মুখাপেক্ষী হয়েছেন জীবনানন্দ। যদিও জীবনানন্দেরই ভাষায়, তাঁর কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনা। জীবনানন্দের শেষের যুগের কবিতায়, বুদ্ধদেবের প্রভাবেই, অনেকে সুখ ও আস্বাদনের তৃপ্তি পান না ; কেননা প্রৌঢ় মনে পারিপার্শ্বিক চেতনা, সমাজ-ইতিহাসকে নিয়ে, প্রেম-প্রকৃতি ও সৃষ্টি প্রকাশকে মিলিয়ে উজ্জ্বলতার স্বতন্ত্র আভায় পরিণত। অনেক রক্ত ক্লেশ গ্লানি, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস পেরিয়ে, বিরোধময় অব্যয় 'তবু', তাঁর প্রতিভার স্বতন্ত্র আভায় জ্যোতির্ময়তায় পৌছেছে; এখানেই তো জীবনের ও কবিতার প্রগতি : 'তবু কী যে উদয়ের সাগরে প্রতিবিম্ব জ্বলে ওঠে রোদে!' 'তবু' অব্যয়টি জীবনানন্দের কবিতা আস্বাদনের মূল চাবিকাঠি; সমাজ পারিপার্শ্বিকতা ও নিরবধি সময়ের জন্যে উপমা ও চিত্রকল্পের ছবির অনাধিক্য; কিন্তু সময়ের চেতনার আবেগ কবিতাকে বিস্তৃতি এনে দিয়েছে; কবিতার মধ্যে মানুষের মনের চিরপদার্থ, চির আধুনিকতা সুস্পষ্ট।

কেউ কেউ অবোধের মতো বলে যে জীবনানন্দের কবিতায় শুধু চিত্ররূপময়, ভেতরে

কোনো বার্তা বা রহস্য নেই ; এর কারণ জীবনানন্দ আসক্ত ও ভাবে ভারাক্রান্ত; ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, জ্বালা, যন্ত্রণায়, আবেগে উদ্বেলিত ; তা থেকে প্রকাশ পেয়েছে ঘৃণা আক্রোশ বিদ্রূপ নির্মম তীক্ষ্ণ শ্লেষের আঘাত, বিশেষ করে উপন্যাসে। চিত্ররূপের মধ্যে ছবির সঙ্গে আবেগ থাকে ঠিকই ; যখন প্রকৃত কবিতা হয়ে ওঠে, ছবি ও আবেগের সঙ্গে ধারণার সর্বজনীনতা সংলগ্ন হয়ে যায়। রক্তের মধ্যে যেমন থাকে শ্বেতরক্তকণিকা, বিভিন্ন লবণ, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি, এন্‌জাইম, নতুন সৃষ্ট টিস্যু এবং টিস্যুর ভাঙায় বর্জ্য কণিকা একই সঙ্গে জড়িয়ে অভিনব। কবিতায় নির্বস্তুক বার্তা ও রহস্য অসম্ভবের তোতলামি। মৃত্যুর আগে পৃথিবী ও জীবনকে রাঙা কামনার মতো জীবনানন্দ দেখতে চেয়েছেন; এবং জীবন ও মৃত্যু একই সঙ্গে : 'প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!' কুয়াশাময় মৃত্যুর মধ্যেই প্রাণের উড়ে যাওয়া ; কিন্তু গতি ও ঝাপসা স্তব্ধতাও একই সঙ্গে। আরেক নির্বোধ পাণ্ডিত্য বলে : জীবনানন্দ সমাজপরিবারের বহির্ভূত ; তাঁর সমাজপরিবার বলতে সুচরিতা অশোকানন্দ ও নলিনী দাশের তিনজনের একত্র থাকা বোঝায়। এঁদের মধ্যে বাস করেই জীবনানন্দের কবিতায় দেশিবিদেশি গ্রামীণ নাগরিক অশিষ্ট প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের বিভিন্নতা উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। এই শব্দগুলি থেকেই জীবনানন্দের পারিবারিকতা ও সামাজিকতা। চোদ্দই অক্টোবর উনিশ শো চুয়ান্নতে সন্ধেয় ট্রামে চাপা পড়বার আগে শুনলে তিনি হার্টফেল করতেন। লাজুক ও মুখচোরা থাকলে যে তীব্র সংবেদনায় সমাজ ও পরিবেশকে আরো ভালোভাবে জানা যায়, সম্প্রতি 'বিভাবে'-প্রকাশিত একবছরের (১৯৩১) ইংরেজি দিনলিপিতে তার প্রমাণ। বুদ্ধদেব বাংলাসাহিত্যকে নানান দিক থেকে ক্ষতি করে গেছেন সাহিত্যবোধের পূর্ণতার অভাবে ; জীবনানন্দকে হত্যা করেছেন তাঁকে নির্জনতম ও প্রকৃতির কবি আখ্যা দিয়ে। 'আট বছর আগের একদিন' ও 'ক্যাম্পে' কবিতা পড়েও কি তাঁর এই বোধহীন সিদ্ধান্ত করতে অন্তরে প্রাণনা জাগে!

জীবনানন্দের কাব্যের বিচার ও রসাস্বাদন সময়কে ধরে কালানুক্রমিকভাবে যাথার্থ্যে আকস্মিক কিছু উদ্‌ভাস চমকে দেয় আমাদের, কিন্তু সেটা করা দুঃসাধ্য। ব্রাহ্মপরিবেশের অতি-সংযমের বিরূপতায় তাঁর কবিতা যৌন প্যাশনে তীব্র : তাঁর বিয়ে হয়েছিলো উনিশ শো তিরিশের ৯ মে, প্রথম সন্তান কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম ফেব্রুয়ারির উনিশ শো একত্রিশ—৩ ফাল্গুন : দাম্পত্য জীবনের অস্বচ্ছতাও প্রেমের কবিতার বিচ্ছেদকে তীব্র করেছে, উপন্যাসে নারীর মন না-পাওয়া ও বেদনা সর্বত্র, যদিও প্রকাশের গভীরতায় অতল জগতের নতুন রূপ দেখা যায়। কোন্ কবিতা আগে, না পরে জানা যায় না। পরের কাব্যে আগের কবিতা ঢুকে গেছে, আগের কাব্যে পরের কবিতা অন্তর্ভুক্ত ; এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটির নাম জীবনানন্দের দেওয়া নয়; উল্লম্ফিত অর্থ-প্রতিপত্তি-অলা প্রকাশকের দেওয়া নাম ; সুচরিতা দাশের সাক্ষ্যে মনে হয়, পদবিন্যাসের স্বভাব-অনুযায়ী হয়তো নাম দিতে চেয়েছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'; শুধু তাই নয়, যাঁরা এই

গ্রন্থটিকে নকল করেছেন তাদের চোখে ধরা পড়েছে প্রকাশনকাল শুধু বিভ্রান্তিকর নয় (১৯৩৪ আছে, হবে ১৯৩২); পঙ্‌ক্তি ও শব্দের অদলবদল এবং বাইরে থেকে নতুন শব্দ প্রবেশ করেছে কবিতায় ; দুটি ছোট কবিতা যুক্ত করে একটি ভূমিকা-কবিতা ছাপানো হয়েছে ; দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে করা হয়েছে ছোট পঙ্‌ক্তি ; মাত্রার যোগবিয়োগ ঘটানো হয়েছে কানের ছন্দের সৌকর্যে ; জীবনানন্দের নিজের শব্দও বর্জিত। জীবনানন্দের কবিতার ছন্দের সুরধ্বনি মিশে আছে যতিছেদচিহ্নে, ড্যাশ, সেমিকোলন, কমা ও কোলনে। অরুণকুমার সরকার বলেছিলেন জীবিত থাকতে আমাকে যে প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত এ-সমস্ত বাদ দিয়ে ছাপিয়েছিলেন, তাঁর পছন্দ নয় বলে। 'কানের ছন্দ' এবং প্রেসকপিতে একই কবিতার ওপর দুটি 'টিক্‌' চিহ্ন দেওয়ার তথ্যে মনে হয়, শব্দগ্রহণবর্জনে, ড্যাশ-কমা-কলোন-সেমিকোলন বাদ দেওয়ার নেপথ্য ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু, যিনি দিলীপকুমার গুপ্তের গৃহশিক্ষক ছিলেন, যাঁর কাছে শেষের যুগের কবিতা গ্রাহ্য ছিলো না ইতিহাস ও নিরবধিকালের মধ্যে জীবনানন্দ বিস্তৃত হয়েছিলেন বলে—ইতিহাস-সমাজযুক্ত পারিপার্শ্বিকই জীবনানন্দের শেষের যুগের কবিতার প্রাণ। জীবনানন্দ একটি চিঠিতে বলছেন (২.৭.৪৬) : 'আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপর 'বনলতা সেন'-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।' সমাজ-ইতিহাসের পরিপার্শ্বের বিস্তৃতির বিশালতা তো বুদ্ধদেব কখনো ছুঁতে পারেননি জীবনে— রাগটা বোধ হয় ঐখানেই। 'বেলা অবেলা কালবেলা' দিলীপকুমার গুপ্ত ছাপেন নি সম্ভবত এই কারণেই। বইটির নামকরণের তাৎপর্য নিয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখতে চেয়েছিলুম ইয়েট্‌সের অনুসরণে বাঙালির জাতীয় সংস্কারের শিকড়ের মূল ধরিয়ে দিয়ে ; অন্তরে প্রোথিত চির সংস্কারের প্রবাহকে চিহ্নিত করে ; আমার সেই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা চুপসে গেলো যখন জানলুম বইটির নাম জীবনানন্দ দেন নি। খাতা থেকে প্রেস কপি করেছেন যাঁরা, তাঁরাই দিয়েছেন নামটি ; যদিও অনেক নামের মধ্যে এই নামটি ছিলো খাতার পেছনে। এবং জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কবিতার প্রকাশিত রূপ আস্বাদন করতে আমি বিব্রত; জীবনানন্দ কবিতার পরিমার্জনায় হয়তো একটি শব্দের পরিবর্তে দু- তিনটি শব্দ পাশে লিখে রাখতেন; কোন্‌টা যে বসাতেন তিনি, আমরা জানিনা : 'এখনো রাত্রিশেষ হলে রোজ পতঙ্গ পালক জল শিশির নিঃসৃত ভোরে'; জলের বিকল্প লিখেছেন কবি 'পাতা' একসঙ্গে। পাণ্ডুলিপি থেকে যিনি কবিতাটি টুকেছেন, তাঁর মতে হয়েছে 'জল', কিন্তু কবিতার অনুষঙ্গে আমার মনে হয় 'পাতা' শব্দই সার্থক। জীবনানন্দের কবিতার 'টেক্‌স্‌ট'ই ঠিক নেই ; অন্তত শেষের দিকে, সুতরাং তাঁর বিচার কী করে হবে যথার্থভাবে। আমরা যেন দেরিদা'র 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শনে'র 'অন্ধ বিন্দু'র মধ্যে পৌঁছুই, যেখানে লেখক তাঁর ব্যবহৃত ভাষার পূর্ণ প্রভু নয়, অর্থ থাকা-না-থাকা নির্ভর করে পাঠকের ওপর।

রূপান্তর ও বিকল্প প্রয়োগে কবির সচেষ্ট প্রয়াস যেমন কবিতাকে নিটোল ও সংহত করে, তেমনি কবির মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ায় রচয়িতার নিরন্তর সংলগ্নতারও পরিচয় দেয়। কিন্তু জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা ব্যর্থ বলে মনে হয়। আর একথাও মনে হয়, জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কবিতা প্রকাশিতের চেয়ে উঁচু মানের নয়। তবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। যে-কোনো তাৎপর্যময় কবিই যুগ থেকে নিহিত বোধের সামগ্রিকতায় ভবিষ্যৎকে তুলে নিতে চান। দেশকালজাত নতুন বোধের বিশিষ্ট প্রকাশে হৃদয়ের চির পদার্থের অস্তিত্বেই চিরন্তন আধুনিকতা নক্ষত্রজ্যোতি পায়।

অনেকে মনে করেন বিষ্ণু দে'ই দেশিবিদেশি মিথ্, দেশজ রূপকথা, সংস্কৃতির তাৎপর্য এবং পৃথিবীর ব্যক্তি-মানুষের, শব্দের বস্তুর উল্লেখে পারঙ্গম বাংলাকবিতায়, কিন্তু জীবনানন্দ তার থেকে আরো জটিল, আবহে কুহকময় ইয়েট্‌সেরই মতো; মিথ্ অনুষঙ্গ উল্লেখ যথার্থ উপলব্ধি করে তাঁর উল্লিখিত কবিদের রচনা তুলনামূলকভাবে পড়লে জীবনানন্দের কবিতাপাঠ আরো গভীর হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর উল্লিখিত বিদেশি কবি, কবিতা ও সমালোচকদের নাম : অডেন, আইন্‌স্টাইন, আরাগঁ, আর্নল্ড, আর্‌ভিং, আঁদ্রে জিদ্, আনাতোল ফ্রাঁস, ইয়েট্‌স, ইস্‌কাইলাস্, এলিঅট, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কামিংস্, কিয়ের্কেগার্ড, কড্‌ওয়েল, কিঙ্‌লিঅর, কিট্‌স, কোল্‌রিজ, কান্ট, গ্যেটে, চসার, জেফ্রিও, জন্‌সন, টেনিসন, টমাস মুর, টোমাস মান, ট্রট্‌স্কি, টলস্টয়, ট্রোলোপ, ড্রাইডেন, ডান, ডিলান টমাস, দান্তে, দালি, নিট্‌শে, পাউণ্ড, পোপ, পতঞ্জলি, প্লেটো, প্রুস্ত, প্যাস্‌কাল, ফ্লোবেয়ার, ব্রেঁতো, বলাকা, ব্লেক, বাল্মীকি, বাইরন, বের্গসঁ, ব্যাস, ব্রাউনিঙ্, বার্নস্, বোদ্‌লেয়ার, ব্রিজেস, ভালেরি, ভোল্‌টেয়ার, মার্ক্‌স্, মালার্মে, মেটারলিঙ্ক, মেরিডিথ্, রিল্‌কে, র‍্যালে, র‍্যাঁবো, রোঁলা, রঁসার, রিচার্ডস, লরেন্স, লেনিন, ল্যাম্, লঙ্‌ফেলো, লঙিনাস, শেলি, শেক্‌সপিয়ার, সেইন্ট্‌স্‌বেরি, সফোক্লেস, স্কট, সক্রাটেস, স্টোয়িক, স্যাঁত্ বভ্, হপ্‌কিন্‌স, হারফোর্ড, হোমার, হাউস্‌ম্যান্, হেরিক, হিউগো, হাক্স্‌লি প্রভৃতি। মিথ্ ও উল্লেখের মধ্যে আছে : আসিরিয়, অগস্ত্য, অনিরুদ্ধ, অর্জুন, অনুরাধা, অশোক, অম্বাপালী, অদিতি, আরব, আত্তিলা, আলেক্‌জান্দ্রিয়া, ইবালিশো, ইলাহি, ইরান, ইছামতী, ইন্দ্র, ইউট্রি (yewtree) ঈসিস, উজ্জয়িনী, উমা, উর, উশীর, এশিরিয়া, একুয়োমেরিন আলো, ওডিসিউস ওরিজেন, কুহক, কঙ্কাবতী, কালীদহ, কন্‌ফুসিয়াস্, কিন্নর, কমলা, কৌটিল্য, ক্রুশ, ক্যারাভেন, ক্যাম্বেল, খুল্লনা, খ্রিস্টের রক্ত, গাঙুড়, গাণ্ডীব, গজল, গেৎসিমানি, গন্ধর্ব, গরুড়, গ্রেল, গলগোথা, চাঁদ, চম্পা, চন্দ্রশেখর, চেঙ্গিস, চিন. চৈত্য, জ্যাসন, টায়ার, টাইফুন, ডাইনির মায়া, ডেভিড, ডঙ্কা, ডাইনোসর, তেপান্তর, তিলোত্তমা, তক্ষশীলা, ত্র্যম্বক, ত্রুবাদুর, দেবযানী, দধীচি, দ্বারকা, দশমহাবিদ্যা, দামাস্কাস্, ধনপতি, ধর্মাশোক, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, নাইন্‌টিন্ থ্রি, ধানসিরি, নিনেভ, নির্বাণ, নৃসিংহ, নচিকেতা, নাগার্জুন, নিনাশ, নাইট, প্রজ্ঞাপারমিতা, পাটলিপুত্র, পদ্মা, পিতৃলোক, পিরামিড, পশ্‌মিলা চুল,

প্রভাস, ফিনিসিয় সার্থবহ, ফা-হিয়েন, বিদিশা, ব্রহ্মবাদিনী, বিম্বিসার, বৈশালী, বুদ্ধ, বেদের অনুষঙ্গ ('পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের আড়ালে আরো এক আলো দেখেছিলো'—সাবিত্রীমন্ত্র) বৃহস্পতি, বারুণি, ব্রহ্ম, বৈতরণি, বেহুলা, ব্যাবিলন, বাসব, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, ব্রায়ার, বাউলের ঘর, মিয়েস্‌মার, ম্যাগ্‌ডালিন, মধুকর ডিঙা, মথুরা, মিশর, মেম্নন, মানিকমালা, ময়ূরপঙ্খী, মেঘনা, মৈত্রেয়ী, মহেন্দ্র, মনু, মমি, মিরুজিনি, যোনিচক্র, যাজ্ঞবল্ক্য, যক্ষ, রোহিণী, রাধিকা, রামেসেস, লহনা, ল্যাজারাস, লিবিয়া, শুক, শ্রাবস্তী, শঙ্খমালা, শঙ্খিনীমালা, শ্রীমন্ত, শয়তান, শুক্র, শুকতারা, সব্যসাচী, সতী, সপ্তমীর চাঁদ, সুপর্ণ, শঙ্খ, সুজাতা, সঙ্ঘমিত্রা, সীতা, সল, স্বাতী, সেপ্টোককাস, স্লটমেশিন, সেন্ট্‌পল্‌স্‌, সোভিয়েট, স্ফিংক্স দানবী, হ্যালোটোসিস (রোগ) প্রভৃতি।

জীবনানন্দ যে-কালে কবিতা লিখেছিলেন নারকীয় অবক্ষয় ও পচন দেখে, প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সেই নরকের আরো গভীর স্তরে আছি আমরা ; জীবনানন্দ তবু ইতিহাসকে মেনে নাচিকেত আভা পেয়েছিলেন, আমাদের কপালে সেটুকুও নেই, সুধীন্দ্রের 'অমা' শুধু ; সুতরাং প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে আমাদের রক্তে জীবনানন্দ আছেনই; এমনকি প্রকাশের নিহিত সঙ্কেতটুকুও হারিয়েছি ; প্রকাশের নিটোলতা ছাড়া কবিতা হয় না।

জীবনানন্দের শতবর্ষের প্রকাশের অনেক ঘোলা জলের প্রবাহ দেখবার প্রতীক্ষার জন্যেই বইটির প্রকাশে বিলম্ব—এর জন্যে দুঃখিত। বিলম্বজনিত অবিচার সহ্য করেছেন শ্রীপ্রবীর অধিকারী ও শ্রীউজ্জ্বল দাস। এঁদের কাছে আমি ঋণী। আর সাতাশ বছর ধরে জীবনানন্দের ভাষার ছন্দের সুরের ছবির কুহকে মজে থাকাও যেন এই বইয়ের প্রকাশে সমাপ্তি ঘটলো—মনে হয়; কিন্তু কুহকের মায়া কি রক্ত থেকে যায়!

সূচি

জীবনানন্দ ও পৃথিবীর আধুনিক কবিতা ১৩

জীবনানন্দের কবিতার ক্রমপরিণাম ৫৬

জীবনানন্দের কবিতার যোগসূত্র ও অস্তিত্ববাদ ৮৯

জীবনানন্দের কবিতায় ‘যোনিচক্র’ ও ‘ইতিহাসযান’ ৯৬

ভাষাদর্শন ও জীবনানন্দের ভাষা ১০৮

জীবনানন্দের একটি কবিতা : ‘কুড়ি বছর পরে’ ও আনুষঙ্গিক ১১৭

জীবনানন্দের রবীন্দ্রনাথ ১৩৪

বিশুদ্ধ কবিতা ও জীবনানন্দ ১৪৬

জীবনানন্দের কবিতা : ‘রাত্রি’ ১৫০

জীবনানন্দের কবিতা : ‘বোধ’ ১৫৫

জীবনানন্দের কবিতার প্রথম পর্ব ১৫৮

পরিশিষ্ট

জীবনানন্দ : অনন্য বোধের দ্যুতি ১৬৫

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ ১৭৪

জীবনানন্দ ও পৃথিবীর আধুনিক কবিতা

আধুনিকতার শুরু বোদ্‌লেয়ারে, কিন্তু তার আগে ভের্‌লেনের মধ্যে ধরা পড়েছিলো, তাঁর বিখ্যাত 'Poems Saturniens' কবিতায় বলেছিলেন : কাজ ও স্বপ্ন তার পুরনো চুক্তি ভেঙে ফেলেছে, শতাব্দীতে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, 'নীল সামঞ্জস্য ও শক্তির বিচ্ছেদ ভয়ংকর তাৎপর্য নিয়েছে।'* এই সামঞ্জস্যের বিচ্ছেদের ভয়ংকরতাই একালের মানুষের অভিশাপ, সত্তার চিন্তাময় ভীষণতায় যার পরিণতি বিংশ শতাব্দীতে। বোদ্‌লেয়ার তাঁর 'জর্নাল্'-এর একশ তিন অংশে যুগের ছবি সুন্দর করে বলেছেন : সংবাদপত্রে এমন দিন নেই যাতে প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় মানুষের কামবিকৃতির ভয়াবহ চিহ্ন, এই সঙ্গেই দান, ন্যায়ধর্মিতা, পরোপকার সম্বন্ধে মারাত্মক গর্ব এবং সভ্যতার প্রগতি সম্বন্ধে নির্লজ্জ উক্তি। প্রতিটি জর্নালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভয়ের জাল। যুদ্ধ, অপরাধ, চুরি, লাম্পট্য অত্যাচার, রাজকুমারের জাতির সাধারণ ব্যক্তির পাপকর্ম, সর্বজনীন বর্বরতার উন্মত্ততা। এই জঘন্য ক্ষুধা-উদ্রেককারী বস্তু নিয়েই সভ্য মানুষ রোজ তার সকালের বাসি খাবার খায়। এ পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু অপরাধ চুঁইয়ে দিচ্ছে : খবরের কাগজ, রাস্তার দেয়াল ও মানুষের মুখ। আমি এটা বুঝতে পারি না, কেমন করে শ্রদ্ধেয় মানুষ ঘৃণার কাঁপন-ছাড়া তার হাতে সংবাদপত্র নেয়। পুঁজিবাদী সমাজসম্বন্ধে বোদ্‌লেয়ার সচেতন ছিলেন : বাণিজ্য মূলত শয়তানের। বাণিজ্য ঋণের প্রতিদান, ঋণের মধ্যে এই স্বীকৃতি থাকে : আমি তোমাকে যা দিই, তার চেয়ে তমি আরো বেশি দাও। প্রতিটি ব্যবসায়ীর আত্মিক রূপ হলো পুরোপুরি নীতির কলুষ। ব্যাবসা স্বাভাবিক, তাই লজ্জাকর : ব্যাবসা শয়তানের, কারণ আত্মকেন্দ্রিকতার নীচতম ও ঘৃণ্যতম রূপ। তাঁর যুগের মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছেদ তিনিই লক্ষ করেছিলেন : দেখেছিলেন একটি মানুষ অন্য মানুষকে বোঝে না, যদি বা বোঝে, তাহলে একমত হয় না। বুদ্ধিজীবীরা কখনো একমত হয় না, মূঢ় আলোচনায় আনন্দ পায়, বাজে বই পড়ে সময় কাটায়, এতেই ব্যঙ্গপরায়ণ, আমোদ পায়, এটাই তাঁর যন্ত্রণার পুরস্কার, অন্য দিকে আধ্যাত্মিকতার রহস্য তাঁর গতিময়তার উপায় বলে মনে হতো। বুর্জোয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি-নীতি-সাহিত্য ও শিল্পের ওপর তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণ্য ধিক্কার ছিলো। দুর্নীতি নীতিহীনতা শিল্পে নীতি বুর্জোয়াদের এই সব শব্দকে মুখের বলে মনে করতেন তিনি। বুর্জোয়াদের প্রশংসিত মৃত্যুহীন মূর্তি ও ছবি দেখে বেশ্যারাও লজ্জায় চোখ ঢাকে, তারা ভাবতে পারে না, প্রকাশ্যে কীভাবে এরকম কুৎসিত ও অসৌজন্যকে দেখাতে পারে লোক; বোদ্‌লেয়ারের এই সমাজচেতনতাই তাঁর কবিতাকে স্থায়ী মূল্য দিয়েছে ; এই সমাজের মধ্যে বাস করেই তাঁর মনে হয়েছিলো, তিনি নির্বেদের মরুভূমিতে বাস করছেন, চারদিকে ভয়, ভয়ের মধ্যেই কোথাও হয়তো মরূদ্যান। সংগীত, দাসপ্রথা, সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলা, বেশ্যা, আধ্যাত্মিকতা, বুদ্ধিজীবী, বুরোক্র্যাট সকলের সম্বন্ধেই তাঁর চিন্তা ও অনুভব ছিলো প্রখর; বুদ্ধিজীবীদের তিনি মনে করতেন পৃথিবীর শত্রু। প্রেম-সম্বন্ধেই তাঁর চিন্তা ও

---

* Aujourd'hui, L.' Action et Le Reve ont brise Pacte Primitif par les siecles use. Et plusieurs ont trouve funestse ce divorce. De L.' harmonie immense et bleue et de la Force.

অনুভব সার্ত্রেকেও হার মানায়, ইয়েট্‌সের মধ্যেও তাঁর কিছু ঢেউ লেগেছে ঃ প্রেমের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, পরিণাম ভুল বোঝাবুঝিতে। এই ভুল বোঝাবুঝিই আনন্দ সৃষ্টি করে। মানুষ চিৎকার করে ওঠে। আঃ, আমার দেবদূত! আর রমণী ঘুঘুর মতো শব্দ করে বলে ওঠে : মাম্‌মা! এই দুই মূঢ় বিশ্বাস করে তারা একই চিন্তা করছে দুজনে। সেতুবিহীন ব্যবধান—পরস্পরের সংবেদ ও সংবাদের ব্যর্থতার কারণ তাদের মধ্যে থেকেই যায়—নরনারীর মধ্যে সেতুবন্ধন হয় না। ধর্মসম্বন্ধে মনে করতেন, চিন্তার রাসায়নিকতাই হলো ধর্ম। এখান থেকেই মৃত্যুর বোধ এসেছে। নারী সম্বন্ধে তাঁর বোধ ও ধারণা দেকার্তের মতো, ডানের সঙ্গে সাদৃশ্য চমকে দেয় ঃ নারী ও প্রকৃতি নৈসর্গিক বলে ঘৃণ্য, বুদ্ধির কোনো বালাই নেই।

সুতরাং বাইরের দিকে থেকে দেখলে বোদ্‌লেয়ারের কাব্যে যৌনতার বিকৃতির ও ইন্দ্রিয়ময়তা, পাপের প্রতি সচেতন ঝোঁক, প্যাশনের ভয়ংকর আনন্দ, রুচির জটিলতা আমাদের আঘাত দেয়; মনে হয় অপরাধ পাপ ও দুষ্কর্মের ধর্মই তিনি প্রচার করতে চাইছেন, অনুতাপ ও স্বীকারোক্তিতে তাকে ধুইয়ে দিতে চান ধর্মীয় বোধে। কিন্তু তাঁর বোধের গভীরতা, ইন্‌স্টিংক্ট ও সেন্সিবিলিটি যুগের এই ব্যভিচারে ভয়ংকর কেঁপে উঠেছে শান্ত আঁধার জগৎ থেকে, তাই তিনি একাকী নির্জন; নির্বেদের শুষ্কতা তাঁকে ঘুরিয়ে মারে অথচ এমন এক দেশকালহীন জগতের অতলান্ত গভীরে শান্ত হতে চান, যেখানে রাসায়নিক মিলন ঘটে সব কিছুর, তা তাঁর কাছে চির অপ্রাপণীয়ই থেকে যায়, তাই মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁকে উচ্চকিত করে।

যুগের যে-বিরোধ ও জটিলতা, বিভ্রান্তি, যা থেকে তিনি মুক্তি চান, অথচ পান না, জড়িয়ে পড়েন, একদিকে ইচ্ছাশক্তিতে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন ইতিহাসের মধ্যে, অন্যদিকে নারীর দেহের স্বাভাবিকতায় ব্যবসায় চাষির অচেতন মনোভাবে একাত্ম হন। তিনি বিদ্রোহ করেন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে আদমের মতো, অ্যাব্রাহাম বা জোভের মতো নয়, তাই নির্জন একাকী জনতা ও মানুষকে ঘৃণা করে গভীরে গহ্বরে নরকে বা স্বর্গে, অজানা ও নতুন বিস্ময়ে পেতে চান ; তাই নারীদেহের ভোগে, বেশ্যাগৃহে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রেম ও প্রেমের অজানাকে উড়িয়ে দেন লাম্পট্যে, আবার অন্যদিকে মানুষের কাছে এসে মানুষকে ঘৃণা করেন, আঘাত করেন, নির্জনে নিভৃতের শুদ্ধতার জন্যে আফ্রোদিতের প্রেমের দুইরূপই একসঙ্গে তিনি পেতে চান ও অনুভব করেন, ঈশ্বরীর সর্বজনীন কামনাবিহীন প্রেমের সঙ্গে যৌনতার তীব্রতা তাঁকে মাতায়। প্লেটো ও খ্রিশ্চান প্রেম একই সঙ্গে নিবিষ্ট।

তাই তাঁর লেখায় কবিতায় আয়রনি ও প্যারাডক্স, বিরোধাভাস ও বিষমতা দুই মিলে একসঙ্গে তাঁর যুগের জটিলতার মধ্যে আত্মার যন্ত্রণার আলোর গন্ধ ও সামঞ্জস্যময় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে , এখানেই তিনি আধুনিক ; কেননা এযুগ হিস্টিরিয়ার মতো, তাঁর আত্মার মধ্যেও হিস্টিরিয়া জন্ম নিয়েছে, বিচ্ছেদ তৈরি করে: আনন্দ ও ভয় একসঙ্গে কাজ করে। কোকেনের নেশায় বিলাসের ঐশ্বর্যের সঙ্গে শৃঙ্খলার ঐক্য লক্ষ করেন। বিশৃঙ্খলার অশান্ত আলোড়ন দূর হয়ে যায়ে; 'সিথেরে' কবির আস্বাদিত নারীর প্রতীক, এই দ্বীপ অন্ধকার ও ক্লান্ত, অথচ সংগীতে প্রসিদ্ধ, আসলে শ্রীহীন (c'est une pauvre terre), আরো ভেতরে দৃষ্টি ফেলে দেখেছেন, এখানে পচা মড়া ঝলছে ফাঁসিকাঠে, এবং এই পচা মড়া কবি

নিজেই। জীবনানন্দ সিথেরের দ্বীপের রহস্যমাধুর্যে গন্ধের উচ্ছ্বাসে ও সবুজের উজ্জ্বল বিস্ময়ে প্রাণিত ও অনুভাবিত দ্বীপের চিত্রে। কিন্তু এর মধ্যে যে-ঝুলন্ত পচা মড়া আছে জীবনানন্দ কল্পনাও করতে পারেন না। বোদ্‌লেয়ার জানেন সৌন্দর্যের মধ্যে সুষমতা ও সামঞ্জস্যই মূল, কিন্তু তার মধ্যেও বিলাস শান্ত-প্রশান্তি ও প্যাশনকে মিলিয়েছেন ঃ La, bout n'est qu'ordrc et beaute Luxe, calm et volupte. আধুনিক কবিতায় এই বিরোধের যন্ত্রণাময় ঐক্য।

২

প্রথম জীবনে ইয়েট্‌স পালানো-রোম্যান্টিকতায় নির্জন নিভৃতে বিশুদ্ধ সত্তাকে প্রকৃতির রূপের গন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে পেতে চেয়েছিলেন। মাটির ঘরে বেড়া দিয়ে বাস করতে চেয়েছিলেন, সেই কুঁড়েঘরের চারধারে বিনের সারি থাকবে, মৌমাছির মৌচাক গুঞ্জরিত করবে ধ্বনি। এই মৌমাছি গুঞ্জরিত নির্জন ফাঁকা জায়গায় অরণ্যের কবি একাকী বাস করতে চাইছেন; এই তাঁর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা; এই নির্জন অরণ্যের শান্তি ধীরে ধীরে নেমে আসবে, ঝিঁঝির ডাকে স্তব্ধ সকালের পর্দা থেকে এই শান্তি আসবে নেমে, মধ্যরাত্রির মৃদু আলো, দুপুরে নীলবেগনি উদ্‌ভাস, সন্ধ্যায় শ্যামার পাখার কাঁপন— এক অলৌকিক রহস্যের বিস্ময় ও কল্পনার স্তব্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, এই মুখর বিদ্বেষ জগৎ থেকে উঠে এখন তিনি সেখানেই যাবেন; কেননা দিনরাত্রি সর্বদা তিনি তীরে মৃদুধ্বনিময় হ্রদের জলের চুম্বন শব্দ শোনেন। তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে শহরের ফুটপাথে হ্রদের জলের চুম্বন শব্দ, পাখির গান, ঝিঁঝির ও মৌমাছির গুঞ্জরন তার গভীর হৃদয়ের কন্দরে শুনতে পান। বাইরের প্রকৃতিচিত্র ধ্বনিরূপ অন্তরে নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে কবির মনে শহরে বাস কববার সময়—কবিতার রোম্যান্টিক সেন্টিমেন্টালিটির মুক্তি এখানেই। এবং স্পষ্ট চিত্রময় ধ্বনির সংগীত এর আরেক বৈশিষ্ট্য ; ছন্দের প্রথা ভেঙে নতুন কিছু আনছেন ছন্দের অভিনবত্বে; এদিক থেকেও এই কবিতার তাৎপর্য ইয়েট্‌সের জীবনে স্বীকার্য। মাত্রা এক হলেও স্বরবর্ণের ঝোঁকে ছন্দের সুর বিলম্বিত মাধুর্য এখান থেকেই। যদিও 'ইনিস্‌ফ্রি' কবিতার সুর পালানো, একমখীন, আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নরাজ্যের। তথাপি স্বপ্নরাজ্যের আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবের সঙ্গে ধুলো রক্তের পাকে পাকে জড়িয়ে দ্বন্দ্বদীর্ণ হয়ে বাইজান্‌শিয়্যামে পূর্ণ রূপ নিয়েছে। এবং এখান থেকেই ফরাশি সাঙ্কেতিকতার প্রভাব লক্ষণীয়। কবিতাব সাঙ্কেতিকতায় বলেছেন : সব শব্দ, সব রঙ্‌, সব রূপ, পূর্বনির্দিষ্ট শক্তির, জন্যে অথবা অনুষঙ্গের জন্যে অনির্ণেয় অথচ বিশিষ্ট ইমোশন জাগিয়ে তোলে, আমি বলতে চাই, বিশেষ অশরীরী শক্তিকে নামিয়ে নিয়ে আসে, আমাদের হৃদয়ের ওপর যার পদধ্বনিকে আমরা ইমোশন বলতে পারি, এবং যখন ধ্বনি রঙ্‌ রূপ সংগীতের সম্বন্ধে, পরস্পরে সন্দর সম্পর্কে যেন একটা শব্দ, একটা রঙ্‌ একটা রূপ হয়ে ওঠে, তাদের সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের জাগরণে একটি ইমোশন জাগিয়ে থাকে এবং তবু একটি ইমোশন। সাঙ্কেতিকতার এইরূপ নিশ্চয় মালার্মের নয়, মালার্মে চেয়েছিলেন বিশুদ্ধ আইডিয়াকে জাগাতে, তাঁর কথায় : 'যারা সাহিত্যে ভাষা ব্যবহার করে তারা এর উদ্দেশ্য জানে; এর উদ্দেশ্য জাদুতে; এই জাদু বাস্তব জগৎকে বিলীয়মান অলৌকিক জ্যোতিতে রূপান্তরিত করে লিখিত ভাষার মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ ও বস্তুপদার্থের অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ জগৎ থেকে বিশুদ্ধ আইডিয়া কি নিয়ে আসে না।' ফল শব্দ উচ্চারণে ফুল

বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায়, ফুলের দৃশ্য পাপড়ি হারিয়ে গিয়ে সংগীতময় সুগন্ধিযুক্ত আইডিয়া উঠে আসে। ইয়েট্‌সের কাছে ইমোশন জাগানোই বড়ো কথা, আইডিয়া নয়, ইমোশনের মধ্যেই সুরভিত সংগীত মিশে থাকে। এদিক থেকে বোদ্‌লেয়ারের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য বেশি। বোদ্‌লেয়ার বলেন : প্রকৃতি এক মন্দির, যেখানে সজীব স্তম্ভ কখনো সম্মিলিত শব্দ চলে যেতে দেয়, মানুষ প্রতীক অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যায়, পরিচিত দৃষ্টিতে এই প্রতীকেরা মানুষকে দেখে। এই প্রকৃতিই এখানে শব্দের প্রতীক, তাই প্রকৃতিবর্জিত নয়, বর্জিত নয় বলে বাস্তবের ছবি সুস্পষ্ট, তার সঙ্গে গন্ধবহ সংগীত। ইয়েট্‌স্ এই যৌবনেই স্বপ্নের সঙ্গে ঐতিহ্যকে যক্ত করেছেন ঃ আমি উঠবো এখন, যাবো—এই উক্তির মধ্যে বাইবেলের প্রতিধ্বনি ধর্মের বিশুদ্ধতার মতো স্বপ্নের ও আকাঙ্ক্ষার বিশুদ্ধতায় জাগরণ ও চেতনা। এখানেই ব্লেকের সঙ্গে মিল, এ নির্বোধ স্বপ্ন নয়। ছবি ও সংগীত এখানে পরস্পরে যুক্ত; ইনিস্‌ফ্রি, কুটিরবেড়া, বিনের সারি, মৌমাছি, মৌচাক ও অরণ্যের নির্জন স্থান, শান্তির নেমে আসার ছবি, ঝিঁঝি, রৌদ্রের উদ্‌ভাস, রাত্রির মৃদু আলো, শ্যামাপাখির ডানা, তীর, জল, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথ—এই প্রত্যক্ষ ছবির সঙ্গে মৌমাছির গুঞ্জরন, শান্তি নেমে পড়ার শব্দ, ঝিঁঝির গান, শ্যামাপাখির ডানায় শব্দ, তীরে চুম্বনময় জলের ধ্বনি—মিলে এক সাঙ্কেতিক সমন্বয়ে নিটোল অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে, যদিও সরল ও একমখীহীন। তব বাস্তবের সঙ্গে বিরোধে ছবির বিরুদ্ধতা জেগে উঠেছে, সেই স্বপ্নের শুদ্ধতাকে বুকে নিতে চাইছেন বাস্তবের ফুটপাতে, যে-ফুটপাত ধূসর, কলঙ্কিত। এখানে সব ছবিতে চিত্রিত, সাধারণ গদ্য উক্তি নেই। এই ছবি ও সংগীতের স্বপ্নের বিশুদ্ধতার রূপ জীবনানন্দকেই প্রাণিত করেছে ধূসর পাণ্ডুলিপির জগতে।

কিন্তু এই সময়েই তাঁর কাব্যের, প্রেমের বিশিষ্টতা ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছিলো : যতোদিন প্রেমের দুঃখ আসে নি, ততোদিন মানুষের ছবি ও তার কান্না ঢেকে পড়েছিলো, ঘরের ছাঁচে চড়ুইয়ের চিৎকার। উজ্জ্বল চাঁদ—পাতার রূপ উজ্জ্বল—যে-মুহূর্তে নারী তার রক্তিম বিষাদময় ঠোঁট নিয়ে চোখের জলে উপস্থিত হলো, সেই মুহূর্তেই মানুষের ছবি ও কান্না দেখা দিলো। ছায়াময় হিজল তরুবীথির ধারে ইঁদর-ধূসর প্রবহমান জল তাঁর প্রিয়তমাকে ভয় দেখায়। প্রেমের মধ্যে ইঁদুর-ধূসর জল ও ভয় মিশে যাচ্ছে। এবং একজন মানুষ প্রেমে নারীর মধ্যে তীর্থযাত্রী আত্মাকে ভালোবাসে (But one man loved the pilgrim soul in you)। যদিও সেন্টিমেন্টাল রোম্যান্টিকতার বিষণ্ণতা 'শাদা পাখি'তে আছে ঃ গোধূলির নীল নক্ষত্রের শিখা আকাশের কিনারে ঝলে আছে এবং মৃত্যুহীন বিষণ্ণতাকে হৃদয়ে জাগাচ্ছে। লিলি, গোলাপ, শিশিরমাখানো; এবং স্বপ্নময় মানুষ তাদের কাছ থেকে ক্লান্তি আসছে। তাই কবি ও তাঁর প্রিয়া ক্লান্তির হাত থেকে শাদা পাখি হয়ে উড়ে যেতে চান, এই ক্লান্তি থেকে পালাবার জন্যেই অসংখ্য দ্বীপ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কল্পসমুদ্রতীর আঘাত দেয়, যেখানে সময় ভুলিয়ে দেবে, দুঃখ আর আসবে না তাদের কাছে। মডগনকে নিয়ে এই কল্পজগতের সৃষ্টি ও ব্যর্থতা এখান থেকেই শুরু। এবং পরীর দেশের স্বপ্ন সোনালি ও রুপোলি আকাশ, নাচিয়ে নিষ্পাপ সৌন্দর্যের সঙ্গে ক্ষুধার্ত পা, ফলের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র—দুই বিরোধ একসঙ্গে মিশে গেছে। এই চন্দ্রসূর্যের মিলনের সামগ্রিকতাই ইয়েট্‌সের কবিতার মূল্য। কিন্তু এই স্বপ্নেও মানুষের জ্বালা শেষ হয় নি, যতোদিন প্রকৃতি আছে, ততোদিন এই জ্বালা থাকবেই। মানুষ তাই তার কবরেও শান্তি

পায় না (The man has found no comfort in the grave) এবং এ-যুগের অশ্রান্ত চিন্তার শিকার তাঁকেও বিদ্ধ করেছে ; তাই মৃত্যুর মধ্যেও তাঁর শান্তি নেই। এখানেই রোম্যাণ্টিক স্বপ্নচারী পরীর দেশে পলায়নপর, নির্জন অরণ্যে আকাঙ্ক্ষার বিশুদ্ধতার দূর দ্বীপে উধাও বাস্তবের আঘাতে ও যুগের জিজ্ঞাসার আস্বাদে তিনি আধুনিক। জীবনানন্দের সঙ্গে এখানেই তাঁর মিল।

এখানে ভাষা হয়তো সংহত তীব্র তীক্ষ্ণ অলংকারবর্জিত নয়, বিশেষণহীন গদ্যের কঠোরতা আসে নি, ছন্দের সুরের বিষণ্ণতার বিলম্বিত ধ্বনি এড়াতে পারেন নি। কিন্তু 'দ্বিতীয় আবির্ভাব' কবিতা সেই উদ্দিষ্ট আদর্শ সাধনার সার্থক দৃষ্টান্ত। এখানে ইয়েট্স্ যেমনি আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি এই আধুনিকতার সঙ্গে এলিঅটের পার্থক্যও সূচিত হয়েছে ফর্মের দিক থেকে, রীড যাকে জৈব ঐক্য বলেন ফর্মের, এই কবিতায় ফর্মে তা সুস্পষ্ট। য়ুরোপের ধ্বংসক্ষয়ী ইতিহাস যেন, কবির ভবিষ্যদ্ দৃষ্টির কাছে মুহূর্তে উদ্ভাসিত দানব পশু ঘূর্ণি—ইয়েট্সের প্রিয় প্রতীক ও আর্কিটাইপ, কিন্তু প্রচলিত পৃথিবীর ধর্মের ভীষণতা সৌন্দর্যপ্রিয় ইয়েট্স ভাবতে পারেন নি। এখানে ভীষণতা, পশু, রক্তক্ষয় এদের সঙ্গে ব্লেকের নিষ্পাপ একসঙ্গে মিশে গেছে। বাইবেলের ম্যাথু'র খ্রিস্টের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সেন্ট জোনের খ্রিস্টবিরোধী আবির্ভাব একই সঙ্গে যুক্ত। জ্ঞানীর অসামর্থ্য ও পাপীর প্যাশনময় তীব্রতার পাশাপাশি অবস্থান এ যুগের সাহিত্যের ও মানষের নির্মম চিত্র। যে-কথা এলিঅটের সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে, সেই কেন্দ্রচ্যুতির কথা, সত্তার টুকরো অণুর পরিণামের রূপ—ইয়েট্স্ও বলেছেন এখানে। জর্জীয় কবিতায় মানুষের ও সভ্যতার যে-অবক্ষয় ও মূল্যহীনতার ও বর্বধতার ছবি ইঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছিলো মসৃণ ছন্দের পেলব শব্দ ভেদ করে : এই দু'জন কবি তাঁদের রূপ পূর্ণ করে দেখিয়েছেন : বস্তু সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন, কেন্দ্র কিছুই ধরে রাখতে পারছে না!; নৈরাজ্য শুধুই বাঁধামুক্ত হয়ে পড়েছে জগতে ; রক্তে-আঁধার বন্যা খুলে গেছে, এবং সর্বত্র নিষ্পাপের উৎসব নিমজ্জিত, শ্রেষ্ঠদের দৃঢ় প্রত্যয় নেই, আর সেই সঙ্গে যারা পাজিপাঝাড়া তাঁর প্যাশনময় তীব্রতায় পূর্ণ।

এ যেন এক নিশ্বাসে ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায়-নির্দেশে-উল্লেখ-অনুষঙ্গে-মিথে সমগ্র যুগের সম্পূর্ণ রূপটিকে প্রাণের নিহিত নিটোলতার জৈব রূপে ইয়েট্স্ প্রকাশ করেছেন। এর আগেই দুটি পঙ্ক্তিতে ক্রমান্বয়ে বিস্তারমান ঘূর্ণির রূপ ছবিতে স্পষ্ট করেছেন, এই বিস্তৃত ঘূর্ণির মধ্যে নিয়ত ঘুরছে বাজপাখি বা ফ্যাল্কন ঃ ফ্যাল্কন বা বাজপাখি মানুষের প্রতীক, বাজপাখির শ্যেন দৃষ্টি মানুষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গেই তুলিত। তাই তার পেছনে ধাবিত শিকারীকে, তাকে মারবার জন্যে উদ্যত অস্ত্রের ধ্বনিকে শুনতে পাচ্ছে না, অর্থাৎ মানুষের তীক্ষ্ণ ও সদাজাগ্রত সর্বব্যাপক বুদ্ধি যোগ রক্ষা করতে পারছে না, তাই অতর্কিতে যে-কোনো সময় মারা যায়।

এই কারণেই এর পরের পঙ্ক্তিতেই কেন্দ্রচ্যুতি ও বস্তুর টুকরো রূপের কথা (Things fall apart; the centre cannot hold;) এবং যেখানে কেন্দ্রচ্যুতি, সেখানে তো নৈরাজ্যের বাঁধ ভেঙে পড়বেই; এবং এই নৈরাজ্য শিকারীর রক্তক্ষুধায়, মানুষহত্যায়, গদির ও সিংহাসনে এবং অধিকারের লোভে ; তাই ম্যাক্বেথের রক্তসমুদ্র ভেসে উঠেছে।

উনিশ শো উনিশের আগের বছরে সারা পৃথিবীতে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের নামে মানবহত্যার কলঙ্কিত স্মৃতি ম্যাক্‌বেথ্‌কে মনে পড়িয়ে দিয়েছে ইয়েট্‌সের মনে : এই রক্তসমুদ্রের সঙ্গে নিহত মানুষের, নিষ্পাপত্বের সঙ্গে ব্লেকের নিষ্পাপ সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ছে, এই নিষ্পাপ ও সৌন্দর্য আজ নিমজ্জিত, এর পরেই একটি বাক্যে একালের নিষ্ক্রিয় মানুষের ব্যর্থতার সঙ্গে দষ্কৃতকারীদের পাপকর্মের তীব্রতা গদ্য উক্তির মতো পাশাপাশি বসিয়ে আগের বর্ণিত ছবি ও উল্লেখের সারাৎসার বলে দিলেন। অনুভূতির যুক্তির সংহত জটিল ক্রমপারম্পর্য ও নিটোল রূপ সেই সঙ্গে সমগ্র মানবসভ্যতার অনষঙ্গময় স্মৃতি—যা এলিঅটে প্রকট, কবিতাটিকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পের পর্যায়ের নিয়ে গেছে।

এই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পর দ্বিতীয় স্তবকে পাঠক প্রত্যাশা করে কবিতার শীর্ষনামে যে, খ্রিস্টের আবির্ভাবে পুনরায় করুণা ও মৈত্রী ও নিষ্পাপ সৌন্দর্য ফিরে আসবে। কিন্তু কবির মনের ভাণ্ডারের থেকে যে-বিরোধময় চিত্রকল্প বেরিয়ে এসেছে তাতে দেখা গেলো, মরুভূমির বালিতে কোথাও ইজিপ্টের স্ফিংক্‌স্‌ সিংহের শরীরে ও মানুষের মাথায় সূর্যের মতো নিষ্করুণ ও শূন্য দৃষ্টি মেলে উরু ধীরে ধীরে নাড়াচ্ছে। নিশ্চয় আবির্ভাব হাতের কাছে, নিশ্চয় দ্বিতীয় আবির্ভাব হাতের কাছে, এর পরেও আবার বিস্ময়সূচক 'দ্বিতীয় আবির্ভাব'! এতে প্রত্যাশাও জাগছে, বিস্ময়ে সংশয়ও উঠছে মনে, এতো জোরের সঙ্গে কবি যে-আবির্ভাবের কথা বারবার বলেছেন সেটা কী? তখনই বলছেন, তাকে শব্দে বলা যায় না, মনের ভাণ্ডার (Spiritus Mundi) থেকে বিরাট চিত্রকল্প তাঁর দৃষ্টিকে আঘাত হানছে ঃ যখন আঘাত হানছে, তখন দ্বিতীয় আবির্ভাব তার করুণা ও মানবতার নয়। ইজিপ্টের মরুভূমিতে বালিতে স্ফিংক্সের; তার দেহটা সিংহের মাথাটা মানুষের, সূর্যের মতো তার দৃষ্টি অকরুণ ও শূন্য, আস্তে আস্তে উরু নাড়াচ্ছে, আর সেই সঙ্গে ঘৃণায় ও ক্রোধে মরুভূমির পাখিদের ছায়া পাক দিয়ে ঘরছে, হত্যার ভয়ে অর্থাৎ স্ফিংক্স পূর্ণ জেগে নেই, দুঃস্বপ্নের স্বপ্ন দেখছে; নইলে ভয়েও পাখিদের সাহস হতো না ওর ওপর পাক খাবার।

তাই অন্ধকার আবার নেমে এলো। ইয়েট্‌সের চিরপ্রচলিত ইতিহাসবোধ, দু'হাজার বছরের খ্রিশ্চান সভ্যতার পর বর্বর সভ্যতার অন্ধকার নেমে এলো, সেখানে এখন স্ফিংক্‌স্‌ জেগে উঠবে নিষ্করুণ ও শূন্য দৃষ্টি মেলে ধ্বংসের হত্যার রক্তপাতের জন্যে। প্রথম স্তবকের বাজপাখির অসহায়তা দ্বিতীয় স্তবকের পাখির পাখ-খাওয়া ও অসহায়তার সঙ্গে যোগ রচনা করলো। স্ফিংক্‌সের অনুষঙ্গে ইজিপ্টের আদিম সভ্যতা ও গ্রিসের ওয়েদিপাওসের স্ফিংক্‌স্‌-কথিত মড়কের ইঙ্গিত এক সঙ্গে জাগছে ঃ তাই ব্যাখ্যার সূত্রে ইয়েট্‌স্‌ বলছেন : আমি এখন জানি, পাথুরে ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখছে নতুন করে জেগে উঠবার জন্যে। তাই সে বর্বর পশু, তার সময় হয়েছে শেষ জাগবার, নতুন করে জন্মাবার জন্যে বেথল্‌হেমে, এই হিংস্র বর্বর পশু জবুথবু হয়ে পড়ে আছে, খ্রিশ্চান ধর্মের প্রতি ইয়েট্‌সের তীব্র ধিক্কার, যে-ধিক্কারে আদিম বর্বর সভ্যতার পশু জাগছে, রবীন্দ্রনাথের ছবির পশুর মতো। যেখানে মকভূমি বালি, স্ফিংক্‌স্‌, বাজপাখি, সূর্যের মতোন নিষ্করুণ দৃষ্টি ঘৃণায় ক্রোধে মরুভূমির পাখির পাক-খাওয়া, পাথুরে ঘুম, দুঃস্বপ্নের পীড়ন, বর্বর পশু, জবুথবু হয়ে-থাকা—ভীষণ ভয়ংকর দুঃস্বপ্নময় আদিম বর্বর সভ্যতার ছবিতে

বর্তমান জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন : আধুনিক সাহিত্যে মানুষের মনে ও বাইরে যে ভীষণতা চেপে ধরেছে, পিকাসোর ছবিতে এলিঅটের কাব্যে, আগে বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় যার রূপ দেখা গেছে; এখানে নিটোলতায় গভীরতায় তীব্রতায় সংহতিতে আরো মর্মস্পর্শী। ইয়েট্‌স্ শেষ রোম্যান্টিক বলেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-চমক-আঘাত-আয়রনি তাঁর কাব্যে বড়ো নয়, গভীরতর অন্তস্তলশায়ী নিবিড় অনুভূতি বা ইমোশনকেই তিনি কাব্যে চিত্রসংগীতে রূপায়িত করতে চান গতিময়তায়; কিন্তু আবার অ-রোম্যান্টিক সংহতির শুদ্ধতার মধ্যে নাটকীয়তার দ্বন্দ্ব ব্রাউনিঙের কাছ থেকে পেলেও তিনি এ-যুগের দ্বন্দ্বই নিয়েছেন আত্মার বিচ্ছেদের। এই আত্মবিচ্ছেদময় নাটকীয়তার সঙ্গে প্রসঙ্গ-উল্লেখ-নির্দেশ-অনুষঙ্গ-মিথ প্রভৃতি মিশে জটিলতার গতিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে; বলা বাহুল্য, এগুলি তিনি পেয়েছেন আধুনিক কবিদের কাছ থেকেই, এলিঅটীয় প্রভাব অনপেক্ষিত নয়। মূলত, নিবিড় নিটোল গভীর ও তীব্র অনুভূতির পারম্পর্যময় গতিময়তার পরিণামে সুসংহতিযুক্ত শিল্পরূপের সার্থকতাই ইয়েট্‌সের কাব্যকে চিরঞ্জীব করেছে।

৩

'প্রুফ্রক' সম্বন্ধে এলিঅটের টেক্‌নিকের প্রশ্ন মনে আসতে পারে, 'প্রিল্যুড'ও বিচার্য: এলিঅটের কবিতা সম্বন্ধে মন্‌রোর উক্তি বিশেষ স্মরণীয় : 'তাঁর রসিকতা কৌতুকবোধ তাঁর মনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। ইমোশনকে দূর করে রাখবার জন্যে নয়, কিন্তু ইমোশন যখনই ভেতরে ঢোকে তাদের চাবকে দেবার জন্যে।' এ কৌতুক ও মজা বুদ্ধিজাত এবং বুদ্ধির কাছে ইমোশন চাবুক খায়। অর্থাৎ বুদ্ধিই প্রাধান্য পায়। ইয়েট্‌সের কাব্যে নিবিড় নিহিত বিশুদ্ধ ইমোশনই সংহতরূপে তীব্র হয়ে ওঠে। প্রুফ্রক দান্তের নরকের পথের মতো বিংশশতাব্দীর নরকেই যাত্রা করেছে, এই নরকের পথের বর্ণনা দিয়েছেন টুক্‌রো-টুক্‌রো, বিচ্ছিন্ন, লাফানোভাবে, এক চিত্রকল্পের সঙ্গে আরেক চিত্রকল্পের সম্পর্ক ও পারম্পর্য দুরান্বয়ে, সিনেমার ছবির মতো দ্রুত ও ত্বরান্বিত সব মিলিয়ে, ঐক্য গড়তে প্রথমত অসুবিধে হয়, মনে হয় কেন্দ্রের সঙ্গে বোধ হয় যোগ নেই, কোনো কেন্দ্র নেই; তা নয়, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ রেখেই বিপরীতে বিসদৃশ সমান্তরাল বিরুদ্ধ চিত্রকল্পও নির্দেশে অনুষঙ্গময় বিস্তারতায় সমগ্র য়ুরোপকে ধরতে চাইছেন। কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ না থাকলে এলিঅট কবিই হতেন না। তবে ইয়েট্‌সের কেন্দ্রের ঐক্য অনুভূতির নিবিড়তায় ও নিটোলতায় যতোটা সহজে ধরে উপলব্ধি করতে পারা যায়, এলিঅটের কেন্দ্রকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ দরকার।

এপিগ্রাফে গুইদোর কথার তাৎপর্যই প্রুফ্রকের তাৎপর্য : আর অধিক গতিছাড়া এই অগ্নিশিখা অর্থাৎ নরকের অগ্নিশিখা একই থাকবে। এ-যেন আমাদের বিংশশতাব্দীর মানুষ গুইদোর মতোই না-ভালো না-মন্দ, নিষ্ক্রিয়, ক্লীব; কামনা আছে, কিন্তু প্রেমের বীর্য নেই, নারীকে সঙ্গমে পেতে চায়, কিন্তু সাহস করে এগোতে পারে না, তাই মনে মনে যাত্রা করে কুয়াশা-ধোঁয়া নোংরা সন্ধ্যায়, হোটেলে মেয়েদের দেখে দিবাস্বপ্নে, মৎস্যকন্যাদের দেখে জলকেলি করতে ইচ্ছে হয় : যৌবনে দেহজ কামভোগ করেছে কিন্তু বিয়ে করেনি, তাই প্রৌঢ় বয়সে নারীসঙ্গে সঞ্জীবিত হবার জন্যে উন্মুক্ত। সমস্ত কবিতাটিই নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বময় তর্কবিতর্ক, স্বপ্নকামনা ও স্মৃতির অনুষঙ্গে

আলোড়িত : তাহলে এখন চলো তুমি ও আমি যাই, আকাশে যেখানে সন্ধ্যা ছড়িয়ে রয়েছে টেবিলের ওপর ইথারে অজ্ঞান রুগীর মতোন। ইথারে-অজ্ঞান সন্ধ্যারুগী, আমাদের এ যুগের মানুষের মনও এমনি নির্বোধ ; চলো, যাই, এখন একটু ফাঁকা রাস্তার ভেতর দিয়ে, একরাত্রির শস্তা হোটেলে, অস্থির রাত্রির বিড়বিড়ানির বিশ্রাম, চিঙ্ড়িমাছের খোসায়ভরা করাতকুচির ধুলোয় ঢাকা রেস্তোরাঁয়। কথা নয়, বিড়বিড়-করা, অর্থহীন প্রলাপই এখন প্রেমের গুঞ্জরন। তারপর আবার রাস্তা, এই রাস্তা চলেছে প্রতারণাময় উদ্দেশ্যের ক্লান্তিকর তর্কের মতো। বাইরের জগতের যুক্তিতর্ক ক্লান্তিকর যেমন, তেমনি উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বার্থসিদ্ধির; বিশুদ্ধ বুদ্ধি নেই। এই প্রতারণাময় ও ক্লান্তিকর যুক্তির রাস্তা মারাত্মক প্রশ্নে টেনে নিয়ে যায়, এবং এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, তাই নিজের সত্তাকেই সে বলছে : জিগ্যেস করো না, এটা কী? চলো আমরা ঘুরে আসি। এরপর যেখানে যাচ্ছে সেখানে ঘরে দেখতে পাচ্ছে রমণীদের, আসছে-যাচ্ছে, মিকেলাঞ্জেলোর কথা বলছে। ভেতরে এই নির্বোধ মহিলাদের সঙ্গেই বাইরে জানালার শার্সিতে পীত কুয়াশার পিঠ ঘষা দেখতে পাচ্ছে। অর্থাৎ ভেতরে ও বাইরে চারদিকেই ঝাপসা অবস্থা, চেতনা বুদ্ধি আলো কোথাও নেই। অক্টোবর-রাত্রির লণ্ডনের বর্ণনার মধ্যে নোংরা ঝুল ও কুয়াশা—এটা প্রুফ্রকের, একালের শহরে মানুষদের। এই নোংরা পরিবেশের মধ্যেই একটি মখকে দেখবার বাসনা জাগছে ঠিকই, কিন্তু শত শত অনিশ্চয়তা বহু দৃষ্টি ও পুনর্বিবেচনা এগোতে দিচ্ছে না। আবার সেই মহিলাদের কথা মনে পড়ছে, যারা মিকেলাঞ্জেলোর কথা বলে। কিন্তু প্রুফ্রক তো রেনেসাঁসের শিল্পীর মহান্ ঐশ্বর্য ও বীর্য পায় নি, তাই কি বাসনা তাঁর কথায়! মনে মনে ভাবছে সাহস করে প্রেমনিবেদন করবার, সাহসের কথা বলতে গিয়েই তার মনে হচ্ছে তার চুলের মাঝখানে টাকের চিহ্ন; রমণীরা হয়তো বলবে, তার চল পাতলা হয়ে গেছে। পোশাকের পরনের মধ্যেও বুড়োটে ভাবে তারা, বলবে; তার হাত পা কেমন রোগা। তাই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। এবং সে তো জেনেছে সব, কফির চামচে দিয়ে সে জীবনকে মেপেছে, বড়ো কিছু করবার তার সাহস নেই। তাদের চোখে সে স্থির, ভাবছে পিনের ওপর এলোমেলোভাবে ঘুরছে, পিনবিদ্ধ, দেয়ালে মোচড়াচ্ছে; যার মনের মধ্যে এই অবস্থা, নাবীকে কীভাবে তার প্রণয় নিবেদন করবে। তার সমস্ত দিন ও রাত্রি পথের সিগারেটের শেষাংশের টুক্রো দিয়ে গড়া, জীবনের কিছুই নেই।

এর আগেও সে নারীদের ভোগ করেছে, প্রদীপের আলোয় হাল্কা ব্রাউন চুলে ডুবে গেছে, সেই স্ফূর্তিই বাধা দিচ্ছে, শার্ট-পরা বিবিক্ত মানুষের পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠতে সে দেখেছে, যে-মানুষটি জানালায় ঠেস দিয়ে আছে। আসলে এই ধোঁয়া প্রুফ্রকের জীবনের। কিন্তু তার ইচ্ছে ছিলো তার একজোড়া যদি দাঁতালো নখর থাকতো, তাহলে নীরব সমুদ্র সে হেঁটে পেরিয়ে যেতে পারতো। সুইনি এদিক থেকে প্রুফ্রকের উল্টো চরিত্র, তার যৌনশক্তি প্রচণ্ড, মেয়েদের মেজাজ বোঝে, তার রুচি কদর্য, বেশ্যাসঙ্গম করতেও তার বাধে না, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত কাউকে দেখলে অন্যের কাছে যায়; যে-রমণী বাথরুম থেকে তোয়ালে জড়িয়ে চওড়া পায়ে নরম শব্দে ঘরে ঢোকে, উবে-যাওয়া নুন আনে, পরিচ্ছন্ন ব্র্যাণ্ডির গ্লাস নিয়ে আসে, সুইনির এই পাশব শক্তি

নেই প্রুফ্রকের শরীরে। কিন্তু সঙ্গমের ছবি দেখে ঘুমুচ্ছে, ক্লান্ত হচ্ছে, অসুস্থ হচ্ছে, মেঝেতে দুজনে ছড়িয়ে শুয়ে আছে; কিন্তু তখনই যৌনশক্তির সঙ্কট ঘনিয়ে উঠতে পারে, তার সংশয় জাগছে, মুহূর্তকে সঙ্কটে টেনে নেবার শক্তি কি তার আছে? এই কারণেই তার কান্না ও প্রার্থনা; তখন ভাবছে—তার মাথায় টাক পড়েছে, সে জানে প্রফেট নয়, বড়ো ব্যাপার তার মধ্যে কিছু নেই, মহত্ত্বের মুহূর্ত ফস করে শুধু জ্বলে। সে যে চিরকালের চাপরাশি দেখেছে, যে তার কোট ধরে এবং ঘৃণ্য হাসি হাসে, সেই চাপরাশি সে নিজেই, নিজের ওপরেই তার ঘৃণ্য হাসি। তাই সে ভীত।

হাসি দিয়ে কিছু কামড়ে ধরো—বলের মতো বিশ্বকে আঁকড়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, নিরন্তর প্রশ্ন তাকে ব্যাকুল করে। তার মনে হয়, ল্যাজারাসের মতো মৃত্যু থেকে সে ফিরে আসে এবং তাকে সব কিছু বলে। এবং সেই সময়েই যৌন কামনার চিত্র জেগে ওঠে; রমণী তার বালিশ ঠিক করে নিয়ে তাকে বলবে : আমি যা বলছি তা ঠিক এ নয়। কিন্তু সে-রমণীকে নিবেদন করতে পারছে না, শুধু ছবি ভেসে উঠছে; যেন জাদুলণ্ঠন পর্দায় বিভিন্ন নক্‌শায় স্নায়ুমণ্ডলী ছুঁড়ে দিয়েছে, স্বপ্ন দেখছে দিনে, বালিশ ঠিক করতে করতে শাল ছুঁড়ে দিতে দিতে, জানালার কাছে যেতে রমণী বলবে: না না মোটেই না, এটা আমি যা বলছি।

এই বাসনার সঙ্গেই আত্মবিশ্লেষণ ও সচেতনতা, যার মধ্যে যুগের সমগ্র ছবি : না, আমি রাজকুমার হ্যামলেট নই, তা হতেও চাই নি! আমি পারিষদ্ চাটুকারদের দল ভারি করেছি, একটা বা দুটো দৃশ্যে রাজকুমারকে পরামর্শ দিয়েছি, নিঃসন্দেহে সহজ উপায়, সর্বদা বশংবদ, কাজে লাগলে খুশি, কূটবুদ্ধিতে পারঙ্গম, সাবধানী, সব ব্যাপারে সতর্ক, বাগাড়ম্বরপ্রিয় অথচ ভোঁতা বুদ্ধি, প্রায়ই সর্বাংশে হাস্যকর, প্রায়ই ভাঁড়।

মনের এই আত্মসচেতনতার পরেই শরীরসম্বন্ধে সচেতনতা : আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি, বুড়িয়ে যাচ্ছি, গোটানো আমার ট্রাউজারের বোতাম পরাবো। যার চুল পাতলা হয়ে গেছে, সে চুল পেছন ফিরে টানতে চায়, দাঁত যার নড়ে গেছে, সে পিচফল খেতে চায়; স্বপ্ন দেখে শাদা ফ্ল্যানেলের টাউজার পরে সমদ্রতীরে বেড়াতে যাবে, সমুদ্রকন্যাদের গান শুনবে, তারা পরস্পরে গাইছে। তারপরেই বলছে, আমি ঠিক ভাবছি না তারা আমার কাছে গান গাইবে। এর পরেই আবার স্বপ্ন দেখছে, সমুদ্রকন্যারা সমুদ্রের ওপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছে, ঢেউদের শাদা চুল বাতাসে পেছনে আঁচড়িয়ে দিচ্ছে, শাদা ও কালো জল বাতাসে বইছে, স্বপ্ন এবার আরো উত্তাল হয়ে উঠছে মরীচিকার মতো : সমুদ্রকক্ষে তারা দীর্ঘকাল কাটিয়েছে, সাগরকন্যারা লাল ও ব্রাউন রঙের শৈবালের মালা তাদের পরিয়েছে গলায়, মানুষের কণ্ঠ যখনই জেগে ওঠে এবং তারা দুজনে ডুবে মরে।

এই কবিতাটির মধ্যে এলিঅটের প্রথম যুগের কাব্যের ভাবনা ও রূপের বীজ নিহিত। প্রুফ্রক যেমন কাপুরুষ ভীরু দুর্বল, যৌনবাসনা থাকা সত্ত্বেও সাহস করে নারীকে প্রেম নিবেদন করতে পারছে না বয়েসের কথা ভেবে, সুইনি জন্তুর শক্তিতে উল্টো। প্রুফ্রকের মধ্যে রোম্যান্টিক প্রেমের আদর্শের শালীনতা আছে, সুইনির তা নেই। আবার 'পোর্ট্রেইট অব্ এ লেডি' কবিতায় নারীর বয়েস হওয়া সত্ত্বেও এক যুবককে

সে বলতে পারে : 'আমরা কেন বন্ধুত্বে দুজনে গড়ে উঠতে পারি না'। আর যুবাও এখানে কাপুরুষ, হয়তো মহিলার কবরস্থ জীবনের জন্যেই। তাই কবিতা শেষ হয়েছে মৃতের পতনের সার্থক সংগীতে। এই নারীর সঙ্গে কথা বলা মৃত্যুরই কথা বলা। তাই লাফর্গের চমকের আঘাতে কবিতার এই শেষ পঙ্‌ক্তি দীপিত : 'এবং আমার কি হাসবার অধিকার থাকা উচিত নয়?' এবং 'প্রিল্যুড' কবিতার শেষ স্তবকে এ-যুগের মানুষের বিবেকের কথাই শীতের রাত্রির ও নোংরা রাস্তার বর্ণনায় ব্যক্ত। কালো কলুষিত রাস্তার বিবেক বিশ্বকে ধারণ করতে ধৈর্যহীন, বাইরের বর্ণনা আত্মায় ও বিবেকে একাত্ম; ইথারগ্রস্ত রুগী প্রুফ্রকের মতো নির্বোধের প্রতীক। এবং প্রায় সব কবিতায়ই অক্টোবর, ডিসেম্বর ও শীতের রাত্রির সময়ের বর্ণনা; জীবনানন্দ কি এখান থেকে অগ্রহায়ণের হেমন্তের রিক্ততার প্রতীক পেয়েছিলেন! এদেরকে মিলিয়ে শূন্য জগতের কল্পনা এলিঅটের কাব্যভাবনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রথম যুগে। এই শূন্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাসে, 'ফোর কোয়ার্টেট্‌সে'।

প্রুফ্রক ভীরু দুর্বল কাপুরুষ, শুধু তাই নয়, তার রোম্যান্টিক আদর্শ পরাজিত ব্যর্থ হবার ভয় তাকে এগোতে দিচ্ছে না, সে দ্বিধাগ্রস্ত, তার মনের মধ্যে সমুদ্রকন্যার সৌন্দর্য, কিন্তু তার চারদিকে নোংরা পরিবেশ, নিঃসাড়তায় তার সংবেদনা চলে যাচ্ছে। তার বাসনা আছে, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয় এবং তার বাসনা দিবাস্বপ্নের, হয়তো এ-যুগের অভিশাপ ও তার চরিত্রের ত্রুটি, সে প্রেম নিবেদন করতে চায়, আসলে তার কোনো প্রেম নেই, যৌনতায় আক্রান্ত, আগেও সে যৌনতায় দেহসম্ভোগ করেছে, এখনও যৌন সম্ভোগ করতে উন্মুখ। তাই এই চরিত্র নাটকীয় এবং ট্র্যাজিক। ট্যাজিক এই কারণে, প্রুফ্রকের চরিত্রের ত্রুটির জন্যে সে অন্তর্দ্বন্দ্বময়, এবং অসহায়তায় সে করুণ। কিন্তু সে আত্মসচেতন, এই আত্ম-সচেতনতাই এলিঅটের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। অতি-সচেতনতাই চরিত্রটিকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে। সে জানে, এ-যুগে ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে উঠবার কোনো সুযোগ নেই, তাই সে হাস্যকর ভাঁড়, কিছুটা ভোঁতা।

শেক্‌স্‌পিয়রের নায়ক হতে গেলে তাকে তো বীর, কর্মে সাহসী, নির্ভীক, সংগ্রামে অদম্য হতে হবে, এগুলির কোনোটা তার নেই, তবু হ্যামলেটের কথা সে বলছে; কেননা, হ্যামলেটের দ্বিধাদোদুল্যমান অনিশ্চয়তা ও অতিসচেতন চিন্তা তার মধ্যেও; কাঁকড়ার মতো সে পেছন দিকে হাঁটছে : বাদামের খোলার মধ্যে বন্দী হয়ে অসীম মহাশূন্যের রাজা ভাবছে নিজেকে; যে-ভীষণতা অনুভব করছে (dread) প্রুফ্রক, সেই ভীষণতা হ্যামলেটেরও : I am most dreadfully attended. তার নিষ্ক্রিয়তার জন্যে নিজেকে ভাবছে সে : নির্বোধ কাদায়-জড়ানো বদমাশ, জীর্ণ উদ্দেশ্যসম্বন্ধে নিষ্ফল। এবং নীরস বাসন-মাজা চাকর। প্রুফ্রকের চরিত্রের মূল সত্য : Thus consceince does make cowards of us all : And thus the native hue of resolution Is sickled o'er with the pale case of thought. এর সঙ্গে লাফর্গের 'রবিবার' (Dimanches) কবিতার প্রথম অংশ মিলিয়ে পড়লে দেহ ও আত্মার, অন্তর ও বাইরের পিগ্‌মিলিয়ানের মতো আত্মকণ্ডুয়নের তৃপ্তি ও অশান্তি, নিজের গড়া-রূপের সঙ্গে প্রেমে পড়ে জগৎ ভুলে-যাবার আয়রনিময় ব্যঙ্গ মিশে যায়।

সে কাপুরুষ ভীরু বলেই হ্যামলেটের মতোই ঘৃণিত, অবমানিত, নিমজ্জিত, তার বুদ্ধি সে ব্যবহার করতে পারছে না, জগতে তাই তার মূল্য নেই, অর্থহীন। অর্থহীন বলেই মিথ্যা দিবাস্বপ্নে ও ফ্যান্টাসির মধ্যে দিন কাটায়। এই অর্থহীনতা থেকেই জীবনে নৈরাশ্য, নৈরাশ্য থেকে শূন্যতা; ইন্দ্রিয়ের যৌনতায় কামনায় সে ভোগে, অথচ শক্তি নেই, এই ঘৃণিত লজ্জা তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে এগোতে দিচ্ছে না জীবনে। তাই সে বিবিক্ত, বন্ধ্যা ভয়ে নিজের মধ্যে কুঁচকে যায়, ভৃত্যের ঘৃণার সে লক্ষ্য, ঘৃণিত চাপা হাস্যময় মৃত্যুর লক্ষ্য। অথচ দিবাস্বপ্ন ও ফ্যান্টাসিতে দেখছে সমুদ্রকন্যারা তাকে ও তার প্রিয়াকে মালা পরিয়ে দিচ্ছে সমুদ্রশৈবালের। এই দিবাস্বপ্ন সমুদ্রে তলিয়ে দেয়, যেমন নাবিক মরীচিকায় তলিয়ে যায়।

হ্যামলেট যেমন এই জগৎকে কল্পনা করেছিলেন, তেমনি প্রুফর্কের কাছেও এই জগৎ ফ্যান্টাসিময়, বাউণ্ডুলে, নিষ্ফল ও উন্মত্ত। তাই এই বন্ধ্যা পরিবেশে সে একাকী, এখানে নারী বেশ্যা ও বন্ধ্যা। প্রত্যক্ষ জগৎ স্বপ্নের মতো ভাসমান, কোনো রিয়্যালিটি নেই, তাই নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতাই এখানে একমাত্র সত্য। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার নগর-জীবন ধোঁয়াচ্ছন্ন, জ্বলন্ত সিগারেটের অংশবিশেষ, টুক্‌রো। জীর্ণ, শূন্য, ভাঙা, এই টুক্‌রো ভাঙা জগতে মানুষ তাই নিজের কোশে আবদ্ধ। যৌনতার আসক্তি আছে, কিন্তু শক্তি নেই; তাই ভীষণতার বোধ, মৃত্যুর চাপা ঘৃণ্য হাসি। যেহেতু রেনেসাঁসের মানুষের বীরের নায়কের শক্তিবীর্য নেই, তাই আত্মধিক্কার ও আত্মগ্লানিতে সে নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, নিজে হাসে ও হাসায়, এই আয়রনির দ্বন্দ্ব 'তুমি' ও 'আমি'র মধ্যে; এই 'তুমি'কে, নিহিত সত্তাকে, মুখোশ পরিয়েছে বাইরের আমি, এইভাবেই বেঁচে থাকা। ইয়েট্‌স্‌ও তাঁর মুখোশ কবিতায় এরই সত্য নাটকীয় ভাবে বলেছেন : পাছে তুমি আমার শত্রু হও তাই আমি খুঁজবো। ও. না হে আমার প্রিয় যা হবার তা হতে দাও: তাতে কি আসে যায়, ওখানে তোমার মধ্যে আমার মধ্যে আগুন ছাড়া কিছুই নেই। প্রথমে 'তুমি' ও 'আমি'র মুখোশে বৈরিতা, কিন্তু তারপরেই মুখোশের সঙ্গে আত্মার, আত্মার সঙ্গে মুখোশের একাত্মতা।

প্রুফ্রক কবিতার রূপকল্প বা ডিজাইনে তিনটির সুস্পষ্ট প্রভাব, আমার মনে হয়, ব্রাউনিঙের স্বগতোক্তি; কিন্তু এই স্বগতোক্তির সঙ্গে জেম্‌সের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আত্মদ্বন্দ্বময় সংলাপের তীক্ষ্ণ তীব্রতা এবং লাফর্গের আত্মব্যঙ্গবিদ্রূপে, দ্বিধাবিভক্ত সত্তার স্পষ্ট রূপ একালে প্রত্যক্ষ; এরি সঙ্গে ডানের কবিতার বুদ্ধির সচেতনতা। এখানে এই কবিতায় লাফর্গের প্রভাব অতি সম্পষ্ট টেক্‌নিকের দিক থেকে। কথ্যভঙ্গি ও কথ্যভাষার ছন্দের সুর একালের গানের মতো ছড়িয়ে আছে, নিবিড়তায় নয়, ভাঙা টুক্‌রো কলির সুরে। ইয়েট্‌সের সঙ্গে এলিঅটের রূপকল্পের পার্থক্য দুস্তর : এলিঅট যেন ক্যামেরায় একালের নগরের শীতের কুয়াশাময় নোংরা রূপ ছবিতে তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন মানুষের বাড়ির নর্দমার ড্রয়িংরুমের বাগানের ছবি। বাইরের ছবিকে একটার সঙ্গে আরেকটায় মেলাচ্ছেন বিসদৃশ আঘাতের চমৎকারিত্বে, তারপর সেটাকে মানুষের আত্মার সঙ্গে একাত্ম করে দিচ্ছেন, যেমন ইথারগ্রস্ত সন্ধ্যার সঙ্গে মানুষের আত্মা মিশে গেছে এক হয়ে। এই টুকরো ছবিগুলিকে সাজিয়ে একটা ইম্‌প্রেশন তৈরি করেছেন ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবির মতো : এই ছবিগুলি ম্যাজিক লণ্ঠনের

ছায়ায় নক্‌শায় আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে নিক্ষেপ করছে মনের পর্দায় : But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen : শুধু পাঠককে নয়, কবিতার চরিত্রকেও এবং এইটেই এলিঅটের কাব্যের টেকনিকের বৈশিষ্ট্য। এবং যেহেতু জাদুলণ্ঠনের রহস্য ও অনুষঙ্গ স্বপ্ন ও স্মৃতি থাকে এবং স্নায়ুমণ্ডলীর জটিলতা নিবিড়, সেইহেতু এলিঅট সমগ্র য়ুরোপের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক নৃতাত্ত্বিক মিথ্‌ধর্মীয় ও পৌরাণিক এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গকে এর সঙ্গে স্মৃতি-স্বপ্নে মিলিয়েছেন। ইম্‌প্রেশনের ছায়াছবির প্যাটার্নের সঙ্গে এই অনুষঙ্গজনিত জটিলতাই এলিঅটের কাব্যকে দুর্বোধ্য করে তলেছে। এই জটিলতার ঐশ্বর্য-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের অভাবের জন্যে বিদেশিদের যথার্থ উপলব্ধিজাত আনন্দ পেতে অসুবিধে হয়। কিন্তু বর্তমান জীবনের ছবি থেকে ভাবনার ও সুরের আনন্দ অনায়াসে আস্বাদ্য।

বুদ্ধিকে কলুষিত করেছে বলে গুইদো নরকে এবং প্রুফ্রক বুদ্ধিকে যথার্থ ব্যবহার করতে পারে নি বলে, এ-কালের নরকে সে। উদ্ধৃতি এই সমান্তরালতা নিয়ে এলো। প্রথম পঙ্‌ক্তিই দ্বিধাবিভক্ত সত্তার ছবি অথচ প্রেমনিবেদনের আর্তিতে লাফর্গের রীতি। সেই সঙ্গে নগরের ইমেজ, ছবির সমাহার একে-একে মনের পর্দায় ঢুকছে, শেষ লাইনে প্রশ্নাকুলতা হ্যামলেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে : আমায় প্রশ্ন করো না। দুটো পঙ্‌ক্তিতে নির্বোধ রমণীদের সঙ্গে মিকেলাঞ্জেলোর উল্লেখ প্রুফ্রকের সঙ্গে রেনেসাঁসের মানুষের বিরোধ। তারপরেই কুয়াশা ও ধোঁয়ার ছবি নরকেরই ন্যায় আদরের বেড়ালের মতো জানলার শার্সিতে মখ ঘষছে। ছবির শেষেই চিন্তাজাত অনিশ্চয়তা হ্যামলেটের, হ্যামলেটের সঙ্গে আবার পুনরাবৃত্তি ঘটলো মিকেলাঞ্জেলোর, এরপর নিজের বর্ণনায় আত্মসচেতনতা ও আত্মদ্বন্দ্ব। পরের স্তবকে স্মৃতি : আমি এর মধ্যে জেনেছি এবং পিনবিদ্ধ চেহারার অসহায়তা, সিগারেটের টুক্‌রোর জীবন, যৌন সম্ভোগের স্মৃতি, রাস্তার বর্ণনা, তার ইচ্ছা দাঁতালো নখর নিয়ে নীরব সমুদ্রে হেঁটে পেরোয়, সেই সূত্রেই দিবাস্বপ্ন যৌনতার অক্ষমতা, মুহূর্তকে সঙ্কটে নিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয়ের আশা, পরে পৃথিবীটাকে বলের মধ্যে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা, এরপরেই বাইবেলের অনষঙ্গে ল্যাজারাসের উল্লেখ, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবনের মিথ্, খ্রিস্টের করুণায় ল্যাজারাস জীবনে ফিরে এসেছিলো, জন্ম-মৃত্যু একই লীলার দুটি অংশ, সারা জীবন এলিঅট নানাভাবে এই মিথ্ ব্যবহার করেছেন; ল্যাজারাসের উল্লেখের পর এই ছবির ব্যবহারে ম্যাজিক লণ্ঠন মনের পর্দায় কীভাবে ছবির নক্‌শা তৈরি করছে, এই টেক্‌নিকের পরিচয়। তারপর আত্মবিশ্লেষণ, যে-বিশ্লেষণে হ্যামলেটের সঙ্গে তুলনা ও প্রভেদ, ভাঁড়ের সঙ্গে নিজেকে বর্ণনা করে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বেদনা; এই বিচ্ছিন্নতার বেদনার সঙ্গে ধয়াপদের মতো মিকেলাঞ্জোলোর উল্লেখ, শেষে ফ্যান্টাসির স্বপ্নে সমুদ্রকন্যাদের দ্বারা শৈবালের মালা পরে সমুদ্রবক্ষে দীর্ঘকাল বাস করে সমুদ্রে তলিয়ে যাবার অমোঘ পরিণতি, ভ্রান্ত নাবিকের মতো। এই ছবির সমাহারের সঙ্গে অনুষঙ্গময় জটিলতার আত্মদ্বন্দ্বজনিত নাটকীয়তাই এলিঅটের কবিতার টেকনিক।

এই ইমেজ শুধু নয়. ইমেজ পারসেপ্‌শন হয়ে স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে, পারসেপ্‌শন ও স্মৃতি বর্তমান ও অতীতকে যেমন মেলাচ্ছে, তেমনি জগতের সঙ্গে মন মিলে যাচ্ছে; এই ইমেজ একটার সঙ্গে আরেকটি মিলে এগোচ্ছে সামনের দিকে। সামনে এগোবার

সময় স্বগতোক্তির নাটকীয়তা গড়ে উঠছে তীব্রভাবে।

শুধু বের্গসঁ নয়, আমার নিজের বিশ্বাস, এলিঅটের কবিতার ফর্ম ব্রাউনিঙের স্বগতোক্তির চেয়েও আরো সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করে হেন্‌রি ও উইলিয়াম জেম্‌সের মনস্তাত্ত্বিক রীতি।[১] কল্পনার ভাবলোকে তাঁর আস্থা নেই রোম্যান্টিকদের মতো, এই কারণে তাঁর কবিতা মনস্তাত্ত্বিক গদ্যিকতা ও জটিলতায় নাটকীয় বলে অনেকে কাব্যগুণের অভাব দেখেন তাঁর লেখায়। ইয়েট্‌স্ কল্পনাময় ইমোশনে আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকেই এমনভাবে উধাও করে নিয়ে যান, আমরা মাটিতে পা রাখতে পারি না তাঁর সঙ্গে; আমরা কল্পনায় উধাও হয়ে উর্ধ্বভাবলোকে উড়তে থাকি। কল্পনা ও ইমোশনের মধ্যে তিনি জটিলতা ও অনুষঙ্গ তৈরি করেন, জীবনানন্দের 'বিপন্ন বিস্ময়' ইয়েটসের 'মৃত্যু' কবিতাতেই আছে : মুমূর্ষু জন্তুদের মধ্যে ভীষণতা ও আশা নেই; মানুষ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে, ভয় পেয়ে আশা করে। তবে ইয়েট্‌সের মৃত্যু বীরেরা তৈরি করেছে বলে তারা অমর।

৪

ইয়েট্‌সের 'সত্তা ও আত্মার সংলাপে' গম্বুজের শান্তি এবং বাইজিন্‌শিঅ্যামের শিল্পের শাশ্বত সৌন্দর্য, যা দেশ ও কালের অতীত, এখানে ভেঙে পড়েছে। সত্তা ও আত্মার মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরকালের, আত্মা চায় সত্তাকে বাদ দিয়ে নির্বিকল্প হতে; কিন্তু মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে, ততোদিন সে সত্তাকে নিয়েই থাকে, যে-সত্তার মধ্যে কাদা ও রক্ত লেগে থাকে, সে নিয়ত সংগ্রামে জয়ী হয়। মুমূর্ষু মানুষ শুধু ভীষণতা ও আশা নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে না, বীরের মতো সে মৃত্যুকে তৈরিও করে, মৃত্যুর অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ইয়েট্‌সের মধ্যে এই দুই জগতের বিরোধময় সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের মধ্যে মানুষের রক্তের আনন্দ ফুল হয়ে আছে। জীবনানন্দের কাব্যে এই জাতীয় সংগ্রাম অনুপস্থিত।

আত্মা সত্তাকে চাইছে সেই পুরাতন ঘোরানো সিঁড়িতে ওপরে ওঠাতে, মনকে সে উর্ধ্বে স্থিত রাখতে; ভাঙা, ভেঙে-পড়া পাঁচিলের ওপর। নিশ্বাসবিহীন নক্ষত্রজ্বলা বায়ুর ওপর থাকতে; নক্ষত্রলোকের স্থিরবিন্দুতে নিবিষ্ট রাখতে চাইছে, এলোমেলো চিন্তাকে স্থির করতে চাইছে সেখানে যেখানে সব চিন্তা শেষ হয়ে গেছে; এবং সেখানেই পরম অন্ধকার, তাই আত্মার জিজ্ঞাসা : আত্মা থেকে অন্ধকার কে আলাদা করতে পারে?[১]

সত্তা উত্তর দিচ্ছে : তার হাঁটুর ওপর পুরোনো তরবারি, যে-তরবারি প্রেম যুদ্ধ যৌনতা ও জীবনের প্রতীক; ঠিক আগের মতোই ক্ষুরের ধারে তীক্ষ্ণতা, দর্পণের মতো স্বচ্ছ ও সুন্দর, বহু শতাব্দীতেও দাগ লাগে নি। তরবারিটা ঢাকা আছে পুরোনো রেশমি নক্‌শা-কাটা কাপড়ে; এই কাপড় সৌন্দর্যের প্রতীক; যদিও কাপড় ছেঁড়া, তবুও এর ওপরে তরবারিকে রক্ষা করছে। এখানে সৌন্দর্য জীবন ও ক্রিয়া একই সঙ্গে।

আবার আত্মার প্রশ্ন : মানুষের কল্পনাময় বস্তুর এই জিনিশ স্মরণে আসবে কেন,

---

[১] ম্যাক্‌নিস্ সর্বপ্রথম টেক্‌নিকের এই রহস্য ধরেছিলেন ইয়েট্‌সের সঙ্গে এলিঅটের তুলনামলক আলোচনায়। অথচ গ্রোভার স্মি[illegible] ম্যাক্‌নিসের নাম স্বীকারই করেন নি।

[১] উপনিষদ্ ও গীতায়ও এই জাতীয় অনুভব সর্বত্র ছড়ানো।

যে-বস্তুর মধ্যে প্রেম ও সংগ্রাম একই সঙ্গে প্রতীকিত। সেই বহু প্রাচীন রাত্রিকে স্মরণ করতে বলছে, যেখানে কল্পনা পৃথিবীকে ঘৃণা করবে, বুদ্ধি এধার-ওধার বিভ্রান্তিঘেরা থেকে নিবৃত্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে।

এ-যেন নির্বাণের অন্ধকার, আত্মা উপনিষদের সর্বময় আলোর পূর্ণতা নয়; এখানেই ইয়েট্‌স্ এশিয়া ও ভারতীয় ধর্মীয় বোধের ব্যাপকতায় বিভ্রান্ত, শঙ্করে সীমিত। সত্তা এর উত্তরে ক্রিয়া ও কর্মের সঙ্গে আচ্ছাদনের পুষ্পিত সৌন্দর্যের কথা বলছে, জীবনের আস্বাদের আনন্দের কথা ব্যক্ত, এতে হৃদয়ের রক্তিম আভা, এই তরবারি গম্বুজের উল্টো দিনের প্রতীক, আর গম্বুজ রাত্রির প্রতীক, আত্মা সৈনিকের অধিকারের শনদ ঘোষণা করছে, আরেকবার অপরাধ করবে সে : And claim as by a soldier's right A charter to commit the crime once more.

আত্মা নির্বাণের প্রতিভূ; তার উক্তি, এইরকম পূর্ণতা সেখানে উচ্ছ্বসিত, মনের বেসিনে পড়ে যায়, মানুষ বোবা বধির ও অন্ধ হয়ে যায়। বুদ্ধি জানে না, কী হওয়া উচিত, জ্ঞাতা জ্ঞাতকে জানে না। অর্থাৎ স্বর্গে আরোহণ করে। মৃতেরাই সেখানে ক্ষমা পায় এবং আত্মা সে-কথা চিন্তা করলেই তার জিহ্বা পাথর হয়ে যায়।

আত্মার এই কল্পনায় মালার্মের কিছু ছায়া আছে। কেননা মালার্মের বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতাও তো গতিহীন ঠাণ্ডা, বরফে স্থির, এ জগৎ থেকে নির্বাসিত।

ইয়েট্‌সের চিন্তা ও ভাবনা এবং অনভবে একটা দিক এই রাত্রির প্রতীক, অন্যদিকটা দিন, কর্ম ক্রিয়া প্রেম সৌন্দর্য যুদ্ধ ও যৌনতা, জনয়িতা ও যৌনতা, দুয়ে মিলে অপবাধময় সৃষ্টি, কলুষিত উৎকর্ষ, সে কখনো এক প্রান্তে স্থির থাকতে পারে না, এই দুই মেরুতে তার আবর্তন, বা ঘূর্ণির মধ্যে ওঠা-নামা, ইতিহাসের মতো এক পর্ব শেষ হলে আরেক পর্ব, জিউসের দৈবিতার সঙ্গে মানষী লেডার সঙ্গম, অথবা ম্যাক্‌নিস্ যাকে সুন্দরভাবে বলেছেন, মানুষী পাশব রাজহাঁস যৌনতার সৃষ্টি করেছে, যে-সৃষ্টি ধ্বংসের, কিন্তু ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি ও তার আনন্দ, তাই সত্তা এখানে জয়ী। এই সংগ্রামের কথা রবীন্দ্রনাথ কখনো কল্পনাই করতে পারেন না; এটা আপ্ত বাক্য: 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন', যদিও এর কথা এলিঅট 'দ্য ফ্যামিলি রিয়ুনিয়নে' আরো তীব্রভাবে বলেছেন আগে, কিন্তু দঃখের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তপস্যার জ্যোতিলাভের কোনো চিহ্ন নেই রবীন্দ্রনাথে, এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের স্পর্শ পেয়েও সংগ্রামে আধুনিক নন। আর এলিঅট এই সংগ্রাম থেকে যেন একটু এড়িয়ে থাকতে চান, তাঁর মধ্যে দেহ-আত্মার বিরোধ তীব্র; ইন্দ্রিয় ও যৌনতা জয়ী হয়েছে প্রথম দিকে; শেষে যেন স্থির কিছুতে পৌঁছুতে চাইছেন সংগ্রামকে এড়িয়ে, জীবন ও মৃত্যুকে, দেহ ও আত্মাকে, কর্ম ও নিষ্ক্রিয়তাকে এক করে নিয়ে, যেখানে গোলাপ ও আগুন যেন, দান্তের অনুসরণে, এক হয়ে যায়, L'amour che move il sole l'altra stella. কিন্তু ট্র্যাজিডির নায়কের সংগ্রাম, ব্যর্থতা থেকে পরাজয়ের ট্র্যাজিক আনন্দ ইয়েট্‌সের কবিতায় মানুষের বেঁচে থাকবার সংগ্রামকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে, সত্তা আত্মাকে বাদ দিচ্ছে না, কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে শেষে।

জীবন্ত মানুষ অন্ধ, সে তার জীবনের জল ফোঁটা ফোঁটা পান করে। কী এসে

যায় যদি নর্দমা অশুদ্ধ থাকে! কী বা আসে যদি আবার একবার আমি বাঁচি হয়ে-উঠবার জন্যে! সংগ্রামকে সহ্য করো। বাল্যের কলঙ্ক, বাল্যের দঃখদুর্দশা মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। অসমাপ্ত মানুষ ও তার ব্যথা তার নিজের ঝাপসা নোংরার মুখোমুখি করে তুলছে।

যে-মানুষ শেষ হয়ে গেছে সে-কি শত্রুর মধ্যে? স্বর্গের নামে সে কেমন করে পালাবে কলুষময় ও বিকৃত রূপ থেকে, ঈর্ষার দৃষ্টির দর্পণ তার চোখের ওপর নিক্ষিপ্ত, যতোক্ষণ না শেষে সে জানে আকার তারই আকার বা রূপ হবে? পালিয়ে কী লাভ যদি সম্মান শীতের ঝড়ে তাকে দেখে?

তাই, আত্মা ঘোষণা করছে, আমি আবার বাঁচতে খুশি, অন্ধ মানুষের নর্দমার ব্যাঙের বাচ্চাদের মধ্যে যদি নিক্ষেপ করতে হয় এ-জীবন, তাহলেও আপত্তি নেই। অন্ধ মানুষ অন্ধ মানুষদের ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে! অথচ সবচেয়ে উর্বর নর্দমায়, সেই মানুষই মূর্খামি করে অথবা কষ্ট পায়, যদি সে গর্বিত নারীকে পাণিপ্রার্থনা করে, সেই নারী যদি তার আত্মার সগোত্র না হয়। আমি খুশি এর উৎস অনুসরণে, চিন্তায় ও ক্রিয়ায় প্রতিটি ঘটনায়। ভাগ্য নির্ধারণ করি, আমার নিজের ভাগ্যকেই ক্ষমা করি। যখন এমনিভাবে আমরা বিমর্ষ মনোভাবকে দূর করি, এক বিরাট মাধুর্য বুকের মধ্যে বয়ে যায়, আমরা অবশ্যই হাসবো এবং আমরা গান গাইবো, প্রতিটি বস্তু আমাদের আশীর্বাদ করছে, প্রতিটি বস্তুর ওপর আমরা দেখি আশীর্বাদ ঝরছে।

শেষ পঙ্ক্তিটিতে ভারতীয় 'ঈশাবাস্যম্' যেন আভাসিত। ছন্দ যেমন এর নাটকীয়তাকে তীব্র করেছে, তেমনি আত্মা ও সত্তা দুটি বিশিষ্ট চরিত্র, তাদের ছবি সুস্পষ্ট, দুয়ের মধ্যে নাটকীয়তা, নিজের স্বগতোক্তির মতো নাটকীয় নয়, 'প্রুফ্রকে' 'পোর্ট্রেইট অব্ এ লেডি'র মধ্যে যা বর্ণিত। এবং দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুও স্থির, স্বর্গ ও পৃথিবীর সঙ্গে রাত্রির নির্বাণ ও আলোয় ক্রিয়াময় সচেতনতা, এই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরেই নানা ছবি, চিত্রকল্প, বস্তুর রূপ একসঙ্গে পরপর সাজানো হয়েছে, এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে পরিণামে সত্তা ট্র্যাজিক আনন্দে জয়ী হয়ে নিজেকে আশীর্বাদপূত মনে করছে, সমস্ত পৃথিবীতে দেখছে আশীর্বাদ ঝরছে। এমনিভাবে অনুভবের স্থির নিটোলতা, বিরোধের মধ্য দিয়ে ঐক্য গড়ে উঠেছে পরিপূর্ণতায়, এই বিরোধের মধ্যেও বিষয়বস্তু ও সঙ্কেত একই সঙ্গে তীব্র নিবিড়তায় রহস্যময় অনুষঙ্গ জাগিয়ে তুলছে। এই সুসংহত নিবিড়তা সংক্ষিপ্ততা, তার সঙ্গে বিষয় ও সঙ্কেতের অনুষঙ্গ, বিরোধময় নাটকীয়তা, মিথের শিকড়, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের নানাবিধ উল্লেখ ও নির্দেশ, যেমন এই কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনে জাপানি সাতোর কাছ থেকে তরবারি উপহার পেয়ে তাকে শিল্পের সঙ্কেতে রূপান্তরিত করেছেন; মরিসের ও তাঁর পিতার কাছে চিত্রধর্মিতা, নোহ্-নাটকের আদর্শে বিশিষ্ট ভঙ্গির নির্দিষ্টতা, রোম্যান্টিক কবিদের কল্পনা ও ইমোশনের গভীরতা এবং কথ্যভাষার সংগীতের সুর—এ সবই এই আত্মা ও সত্তার দ্বন্দ্বে উপভোগ করা যায়।[১]

---

[১] শেক্সপিয়রের নাট্যপ্রতিভাসম্বন্ধে বলতে গিয়ে কোল্‌রিজ যে-কথা বলেছিলেন, আমার সেই কথাগুলি মনে পড়ে, এই কবিতার ঐক্য সম্পর্কে : Yet instead of unity of action I should greatly prefer, though scholastic and uncouth words, homogeneity, proportionateness and totality of interest, এভাবেই 'single energy' ব্যক্ত হ

এই কবিতাটির সঙ্গে 'দুটি বৃক্ষ', 'রক্ত ও চাঁদ', 'প্রতীক', 'গম্বুজ', 'উন্মত্ত জেন', 'দোলায়মান' কবিতাগুলি অতুলনীয়। রক্ত ও চাঁদ কবিতার শেষে আছে : মনে হচ্ছে মৃতের সম্পত্তি, জীবনের সামঞ্জস্য নেই, আর শক্তি, যার মধ্যে রক্তের দাগ লেগে আছে, সে হচ্ছে জীবনের সম্পত্তি। কিন্তু চাঁদের মুখে কোনো কলঙ্ক থাকে না যখন সে মেঘের মধ্যে দিয়ে গৌরব দেখে। অর্থাৎ মেঘ ও চাঁদ একসঙ্গে মিশলেই কলঙ্কহীন। 'দুই বৃক্ষে'র দাঁড়কাকের নম্রচোখ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। 'দোলায়মান' কবিতার প্রথমেই বলছেন নিরাভরণ ভাষায়, কিন্তু আবেগের তীব্রতায় : মানুষকে দু'রকমের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। জ্বলন্ত অথবা শিখাময় নিশ্বাস দিন ও রাত্রির বিরোধকে শেষ করতে আসে, হৃদয় বিবেকের দংশনে ক্ষত। তারপরেই আতঙ্কিত, তাহলে আনন্দ কী? এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ-প্রশ্নাকুলতা; তা থেকে রহস্যময়তা; 'উন্মত্ত জেন' কবিতায় আছে এতো বিভিন্ন পরিবর্তনে ঈশ্বরে সব জিনিশই স্থির থেকে যায়। বিলাপের সঙ্গে সংলাপে এর তীব্রতা আত্মা ও সত্তার নাটকীয়তার মতোই : 'একটি নারী গর্বিত হতে এবং শক্ত হতে পারে যখন কাউকে সে প্রেমে চায়; কিন্তু প্রেম, প্রেমিকের প্রাসাদকে বিষ্ঠায় নিক্ষেপ করে : কারণ কোনোটাই একমাত্র বা সমগ্র নয়. যা বিদীর্ণ হয় নি। এই আত্মবিচ্ছেদ সার্ত্রের মতো, ভালেরির মতো ইয়েট্সের প্রেমেও। প্রেমের এই বিচ্ছেদ একেবারেই নেই বললেই হয় বাংলাকবিতায়। হয়তো তন্ত্র ভলিয়েছে বাংলার কবিদের, যা রোম্যাণ্টিকতার নামান্তর, রামানন্দের গানে এর উজ্জ্বল উদাহরণ : না সো রমণ না হাম রমণী/দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।'

'লাপিস্ আজুলি' অর্থাৎ এই কবিতাটির মধ্যেও বিরোধ আছে; প্রাচ্য ও যুরোপীয় জীবনবোধের বিরোধী চিত্র ও জীবনবোধ এর মধ্যে সম্পষ্ট, যে-ইয়েট্স্ ভারতীয় রূপকথা ও কাহিনীর মধ্যে, কিংবদন্তির মধ্যে নিজের আদর্শ খুঁজেছিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের বস্তুর প্রাণময়তার সঙ্গে ভারতীয় 'সর্বম্ এজতি'র মিল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, সর্বব্যাপ্ত শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রাণময় করুণা ও আনন্দই ছিলো তাঁর ধ্যেয়; চঞ্চলতা, অস্থিরতা সংগ্রাম যাতে না আসে, তার জন্যে প্রার্থনাই করেছে অনসূয়া। এই বোধ রবীন্দ্রনাথে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে উঠেছিলেন, তাই বিস্ময়ের ভরা আনন্দে বলে উঠেছিলেন 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় : ভারতীয় সভ্যতার মতো রবীন্দ্রনাথও খুশি হয়েছিলেন আত্মাকে আবিষ্কার করবার জন্যে, স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করবার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছিলেন আকাশের পাখির নিষ্পাপতা ও সরলতা, এটাই ধ্যান করেছিলেন ইয়েট্স্ উনিশশো তেরো পর্যন্ত, যদিও তাঁর মন ও কবিতা তখন ভিন্ন ধারায় বইছিলো, তিনি তাঁর বিছানায় ডাইনিকে দেখেছিলেন, মনের মধ্যে নির্দেশ গড়ে উঠেছিলো, কঠোর শ্রমে চেষ্টায় এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার (Toil and grow rich) এবং তার মধ্যে যে ম্যাজাই তৈরি হচ্ছিল তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন. এই সব ঋষিরা জিশুর ক্রুশ-বিদ্ধতায় অসন্তুষ্ট; কেননা দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাতে রোধ করা যাবে না। জন্তুর, মেঝের মধ্যে, অনিয়ন্ত্রণযোগ্য রহস্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো; দ্বিতীয় আবির্ভাবে যার তীব্র চিত্র, এবং 'জার্নি অব দ্য ম্যাজা'ই কবিতার এলিঅট জন্ম-মৃত্যু মৃত্যু-জন্মের পারে নতুন জীবন দেখতে চাইছিলেন—এখানেই ইয়েট্স্ ও এলিঅটের খ্রিশ্চান বোধের

ইতিহাসের প্রভেদ; চেতনায় এলিঅটের ইতিহাস হেগেলীয় না হলেও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সঙ্গে স্রোতের ধারায় যুক্ত। সুতরাং ইয়েট্সের ধ্যানের মিস্টিকতা ও স্বপ্নের রহস্যময় স্তব্ধতার সঙ্গে বাস্তবের ও তাঁর অনুভবের বিরোধ ঘটছিলো নিয়ত।

‘নীলকান্তমণি’ কবিতায় এই বিরোধ প্রতীচী ও প্রাচ্যের প্রতীক। এই উপহৃত নীলকান্তমণিতে খোদিত ছিলো এক চিনীয় দৃশ্য, চিনে ভাস্করের আঁকা : মন্দির বৃক্ষ পথ প্রাচীর তাৎপর্য। এর মধ্যে একান্ত শান্ত সমাধান আছে, কিন্তু পশ্চিমের ট্র্যাজিডি নেই, বীরের কান্না নেই, ট্যাজিক আনন্দ নেই। এই সূত্রেই পশ্চিমের ট্যাজিডির নায়কদের কথা বলছেন কবিতার প্রথম দিকে, এই ট্র্যাজিক বীরদের সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার ধ্বংস ও অস্থিরতা পরিবেশের সত্যের মতো জড়িত। এখানেই কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিশে যায় ইয়েট্সের কাব্যে।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রমণীরা চিত্রকলা সংগীত ও কাব্যসম্বন্ধে পীড়িত; কেননা, মারাত্মক কিছু করা দরকার, নইলে অ্যারোপ্লেন জাপ্‌লিন বেরিয়ে এসে বোম মেরে শহর ধূলিসাৎ করে দেবে। অর্থাৎ ধ্বংসের সময়ে শিল্পকলার কোনো মূল্য নেই।

কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যেই ট্যাজিক নাটক গড়ে ওঠে; হ্যামলেট, কিঙ্‌লিয়র আত্মগর্বে গটগট করে হেঁটে যায়, সেখানে আসে ওফেলিয়া কর্ডেলিয়া। শেষ দৃশ্য এখনো আসেনি, বিরাট মঞ্চে যবনিকা নেমে আসবে, নাটকে যদি তাদের ভূমিকা সার্থক হয় তাদের কথার অভিনয়ে তারা কাঁদবে না। অভিনেতারা জানবে হ্যামলেট ও লিয়র খুশি। এই খুশিই সব ভীষণকে অন্যরূপে পরিবর্তিত করবে। সব লোকই এই দিকেই লক্ষ করছে, দেখেছে ও হারিয়ে গেছে, তারপর অন্ধকার; স্বর্গ আলোকিত হয়ে ওঠে . ট্র্যাজিডি এতেই চূড়ান্তভাবে গড়ে ওঠে। যদিও হ্যামলেট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়; লিয়র ক্রুদ্ধ হয়, শতসহস্র মঞ্চের ওপর পর্দা সহসা নেমে আসে, এক ইঞ্চি বা আধ আউন্স পরিমাণের কিছুই বাড়ে না।

এই সমস্ত মানুষ পায়ে হেঁটে, জাহাজে চড়ে, টের-ঘোড়ার গাধার ও খচ্চরের পিঠে এসেছিলো, সভ্যতা তরবারি অর্থাৎ সংঘর্ষে গড়ে উঠেছে, এর ফলে মানুষ ও তাদের জ্ঞান যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছে। ক্যালিম্যাকাসের শিল্পকর্মও টেকে নি, দীর্ঘ প্রদীপের চিম্‌নির আকারের শিল্প, ক্ষীণ তালবৃক্ষের কাণ্ডের মতো একদিনের বেশি টিকতে পারে নি। সব জিনিশেরই পতন হয়, আবার গড়ে ওঠে। এবং যারা আবার গড়ে তোলে, তারা খুশি।

এর পরে উপহৃত নীলকান্তমণির ওপর চিনেম্যানের খোদিত শিল্পের বর্ণনা দিয়েছেন ইয়েট্স্ কিট্সের গ্রিক পাত্রে নিখুঁত বর্ণনার মতো : দুজন চিনেম্যান, তাদের পেছনে একজন, তাদের মাথার ওপর লম্বা পা-অলা পাখি দীর্ঘ জীবনের প্রতীক, তৃতীয় ব্যক্তিটি নিশ্চয় ভৃত্য, সে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চলেছে। প্রাচ্যদেশীয় জীবনের মধ্যেও সংগীতের আনন্দ আছে।

পাথরের বিবর্ণতা, চিড়, টোল, মনে হয় জলের স্রোত, নতুবা তুষারপাত, উঁচু ঢাল তুষারে আচ্ছন্ন, তবু কিশ্‌মিশ ও চেরিশাখা, বাড়িতে যাবার ক্ষুদ্র মাঝপথ মধুর করে দিয়েছে।

এবার খোদিত শিল্প থেকে ইয়েট্‌সের কল্পনায় নতুন ছবি অর্থ ও তাৎপর্য বেরিয়ে আসছে, বস্তুর শুধু বর্ণনা নয়, কল্পনায় দেখছেন চিনেম্যানরা পাহাড়ের চূড়োয় উঠছে, দেখে খুশি হচ্ছেন, সেখানে তারা বসেছে; পাহাড়ের ওপরে, আকাশে ট্র্যাজিক দৃশ্যের চারধারে চিনেম্যান্‌রা বিস্ময়ে তাকাচ্ছে। বিষাদময় সংগীতের কথা জিগ্যেস করছে; হাতের নিপুণ আঙুলে সুর বাজাতে শুরু করেছে তারা। বহু কুঞ্চনের মধ্য দিয়ে তাদের চোখ, তাদের পুরাতন উজ্জ্বল চোখ খুশি।

এখানেও খশি কাজ করছে, খশি জাগছে বিষাদময় সংগীত থেকে, তাদের চোখের বিস্ময়ের মধ্যেও কুঞ্চন, জীবনের বহু অভিজ্ঞতার জীর্ণতা ও যন্ত্রণা আছে; কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার সংঘর্ষজাত ট্র্যাজিক বীরের আনন্দে বীরের কান্না নেই। পশ্চিমী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য : old civilizations put to the sword.

প্রতীচ্যের মধ্যে এই বীরত্বই তার শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাচ্যে শান্ত নীরবতা, সংঘর্ষ নেই; হ্যামলেটের ও লিয়রের দ্বন্দ্ব নেই চিন্তার ও মননের, সমাজের ও দ্বন্দ্বের আঘাতে হিস্টিরিয়া উঠে আসে না, যা থেকে ট্যাজিডির আনন্দ সৃষ্টি হতে পারে। ‘মেরু’ কবিতাতেও এই একই কথা, সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সভ্যতার এগিয়ে যাবার কথা' সভ্যতার সংগঠনের মধ্যে বহু ইল্যুসন। এবং মানুষ ভীষণতা থাকা সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দীর মধ্য দিয়ে শিকারির লোভ থেকে নিবৃত্ত হয় না; লুট করে, রাগে উপ্‌ড়ে ফেলে এবং রিয়্যালিটির নিঃসঙ্গতায় এসে পৌঁছোয়। ইজিপ্ট ও গ্রিসের ও রোমের সভ্যতা এমনি এসেছে এবং চলে গেছে। অন্যদিকে রিক্ত সন্ন্যাসী মাউন্ট মেরু ও এভারেস্টে আছে বসে, চলমান বরফের নীচে রাত্রে এরা গুহাময়, অথবা যেখানে বরফ ও শীতের ভীষণ ক্ষুব্ধ ঝড় এই সব রিক্ত সন্ন্যাসীদের নগ্ন শরীরে আঘাত করছে, এই সন্ন্যাসীরা জানে যে রাত্রির চারিদিকে দিন আনে, জানে উষার আগে তার গৌরব ও স্মরণস্তম্ভ চলে যায়। এমনি করেই সভ্যতার ভাঙাগড়া চলে, এই ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি, এখানেও ইজিপ্ট পশ্চিমী সভ্যতার নিয়ত সংঘর্ষের ভীষণতায় এগোয়, এশীয় সভ্যতা রাষ্ট্রসমাজপরিত্যক্ত নির্জনে শিখরে ধ্যানে নিবিষ্ট, তার দ্বন্দ্ব প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের মধ্যে নয়, নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব পশ্চিমী সভ্যতার স্বরূপ। ‘দ্য স্ট্যাচু’ কবিতায় এই দুই সভ্যতার প্রভেদ আরো সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাত। পশ্চিমী সভ্যতার মূল নিহিত আছে পিথাগোরাসের সংখ্যায়, ব্রোঞ্জে ও পাথরে এই সংখ্যা যেন চলমান; কিন্তু তবু তাদের সংখ্যায় কোনো চরিত্র নেই, চরিত্র গড়ে ওঠে প্যাশনের জীবন্তরূপে, তরুণতরুণীরা যখন মধ্যরাত্রে প্রকাশ্য স্থানে দুজনকে চেপে ধরে, জীবন্ত ঠোঁট সুগঠিত মুখের ওপর চেপে আসে, তখনই এর চারিত্র বোঝা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ ও গঠন পিথাগোরাসেব। আর এশীয় সভ্যতার চরিত্র অস্পষ্ট অমেয়তা। স্যালামিসে বহু-শির উন্নত-তরেঙ্গর ওপর দাঁড় সাঁতরায় না। এশীয় সভ্যতার স্বরূপ বুদ্ধের মধ্যে :

> ... Empty eyeballs knew
> That knowledge increases unreality, that
> Mirror on mirror mirrored is all the show
> When gong and conch declare the hour to bless

Grimalkin crawls to Buddha's emptiness.

কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতা, যার সঙ্গে আইরিশ জাতীয়তা অচ্ছেদ্য, জানে, কাকে বুদ্ধি হিশেব সংখ্যা ও পরিমাণ বলে।

লেডি গ্রেগরি আবে থিয়েটারে ট্যাজিডির যে-আদর্শ উল্লেখ করেছিলেন, ইয়েট্সেরও সেই আদর্শ : যে-লোক মারা যাচ্ছে ট্র্যাজিডি অবশ্যই তার কাছে আনন্দের : (Tragedy must be a joy to the man who dies.) ইয়েট্স্ একটি চিঠিতে এই কথা বলেছেন: কেউ আমাকে চিনেভাস্করের খোদাই-করা একটি বিরাট উপহার পাঠিয়েছে, এতে পাহাড়ের দৃশ্য আছে, তাতে আছে মন্দির বৃক্ষ, পথ, সন্ন্যাসী ও শিষ্য, পাহাড়ের ওপরে উঠবার চেষ্টা করছে। সন্ন্যাসী শিষ্য কঠিন পাথর ইন্দ্রিয়ময় প্রাচ্যের চিরন্তন বিষয়। নৈরাশ্যের মধ্যে বীরের কান্না। কিন্তু না, আমি ভুল করছি, প্রাচ্য তার সমাধান সে সব সময়েই শেষ করেছে এবং তাই ট্র্যাজিডির কিছুই সে জানে না। আমরা, পুব নই, বীরের কান্নার ধ্বনি অবশ্যই তুলবো। (১৯৩৫, ৬ই জুলাই)

প্রাচ্যসম্বন্ধে, বিশেষ করে, ভারতীয় চেতনাসম্বন্ধে ইয়েট্সের এ ধারণা ভ্রান্ত; ঋগ্বেদের বা উপনিষদের কথা বাদই দিই, নারদসম্পর্কে পুরাণের উক্তিতে অবগুণ্ঠিত বা অর্ধঅবগুণ্ঠিত দৃষ্টি নেই, এই জগৎ ও বিশ্বসৃষ্টিসম্বন্ধে অক্লান্ত : কৃতশ্রমং কৃত প্রজ্ঞং ন চ তৃপ্তং সমাধিতঃ।

কিন্তু তবু এই কবিতার রূপগঠন চমৎকার, সজীব প্রাণের হয়ে-ওঠার মতো নিত্য নতুন, অথচ বিরোধের মধ্যে টেন্শনের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন চলেছে, একই স্তবকের মধ্যে বিরোধ, স্তবকের সঙ্গে স্তবকের বিরোধময় যোগ, সেই সঙ্গে দুই বিরোধের নাটকীয়তা হ্যামলেট ও কিঙ্লিয়রের সঙ্গে; জগৎপরিত্যক্ত পর্বতশিখরে ধ্যানী প্রাচ্যের বিরোধ, এই নাটকীয় বিরোধ একবিন্দুতে মিলে গেলো; পশ্চিমী সভ্যতায় যারা ধ্বংসের পর আবার সৃষ্টি করে তারাও খুশি, কুঞ্চনের মধ্যে পুরনো উজ্জ্বল চোখ—অর্থাৎ পুবও খুশি, পশ্চিম ও পুবের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও দুই সভ্যতার এক জায়গায় মিল, কিন্তু গতি ও প্রতিক্রিয়া আলাদা : And those that build them again are gay. পশ্চিমের এই বীরদের সঙ্গে এশীয়বাসীর শান্তির ধ্যানের খুশি : Their eyes mid many wrinkles, their eyes, Their ancient, glittering eyes are gay. (Lapis Lazuli)

এই প্রতিটি চিত্র স্থির সুস্পষ্ট ভাস্করের খোদাইয়ের মতো, কখনো চিত্রের রঙে উজ্জ্বল, ছবির সঙ্গে ছবির উড়ে-যাওয়া নয়, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রমণীদের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত অ্যারোপ্লেন জ্যাপ্লিন ও কিঙ্বিলিবোম্ চোখের ওপরে সাম্প্রতিক ছবির সম্পষ্টতায় ভাসে। তারপরেই প্রসঙ্গ-উল্লেখ-নির্দেশ, হ্যামলেট-লিয়র-ওফেলিয়া-কর্ডেলিয়া। কিন্তু প্রথম স্তবকের হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের সঙ্গে এদের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে, সাম্প্রতিক হিস্টিরিয়াগ্রস্ত নারীরা শিল্পে বীতস্পৃহ, কিন্তু সাহিত্যের বা ট্র্যাজিডির এই নারীদের কাছে ভীষণতা রূপান্তরিত খুশিতে। এর পরেই তৃতীয় স্তবকে ভাষা মহান ও মার্জিত, পশ্চিমী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্ণীত। পুরাতন সভ্যতা তরবারিতে নির্ভর, অর্থাৎ কর্ম ও উদ্দীপনা, তাই ভাঙলেও আবার গড়ে ওঠে। চতুর্থ স্তবকে নীলকান্তমণিতে খোদিত ছবির ইঙ্গিতময় বর্ণনা। পঞ্চম স্তবকে এই দৃশ্যের বর্ণনা কল্পনায় নীত হয়ে

কবির নিজের অর্থে ও তাৎপর্যে নতুন হয়ে উঠেছে, এই এশীয় ধ্যানীরাও বয়সে পুরাতন, অভিজ্ঞতায় চোখে কুঞ্চন, অভিজ্ঞতায় শোকের সংগীত, কিন্তু তারা জীবন থেকে বহু দূরে, পাহাড়ে ও আকাশে। কিন্তু পশ্চিমী-সভ্যতার প্রতীক ক্যালিম্যাকাস্‌দের শিল্প সমুদ্র বাতাসের উত্তালতা ছুঁয়ে আছে। এলিঅটে এই জাতীয় জৈব ফর্ম নেই। ভাষার এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন এতো গভীর ইঙ্গিতময় নয় অনুষঙ্গে।

৫

ইয়েট্‌সের সঙ্গে মিল জীবনানন্দের কয়েকটি দৃশ্যে, ছবিতে, পঙ্‌ক্তির অনুবাদে, পরিকল্পনার রোম্যান্টিকতায় শুধু নেই; ইয়েট্‌সের আত্মিকতার সঙ্গে জীবনানন্দের মিল প্রচুর, জীবনের ভাবনায় ও ছন্দে এবং রূপকল্প ও প্যাটার্ন-রচনায়। এলিঅটের কাব্যের কয়েকটি ধ্বংসের ছবি হয়তো চিত্রে ধরা পড়েছে জীবনানন্দের কাব্যে, বিচ্ছিন্নতার সূত্রে; কিন্তু ইয়েট্‌সের মধ্যে যে-দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব, যে-দ্বন্দ্বে সত্তাই জয়ী হয় আত্মার স্বপ্নকে বুকে নিয়ে; মালার্মের সেই কল্পমায়া মূর্তি যার মধ্যে বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা নির্দিষ্ট হয়ে আছে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন বলে সে অচঞ্চল, গতিহীন, শীতল স্বপ্নে, স্বপ্নও এ জগতের নয় বলে বরফের মতো শীতল, এই জগৎ ঘৃণ্য, তাই ঘৃণ্য জগৎ থেকে দূরে বরফের মতো শীতল স্বপ্নে আমাদের স্বপ্নের বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা নিহিত, এই প্রয়োজনের জগতের বাইরে নির্বাসনে স্বপ্নের ও বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতাময় সৌন্দর্যরূপী রাজহাঁস বরফে স্থির হয়েছে শুদ্ধ শুভ্রতায়। (Fantôme qu'a ce lieu son pur éclat assigne.) কিন্তু এই কল্পমায়া মূর্তির বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতায় নির্বাসিত হয়ে স্থির হতে চায় না শীতল বরফে; তার সঙ্গে দ্বন্দ্বেই বরং তার তীব্রতা, তবু তাকে নিয়েই এ জগতে ট্র্যাজিক আনন্দে সে বেঁচে আছে অন্তর্দ্বন্দ্বে লড়াই করে; এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নাটকীয়তার মধ্যে যুগের কালের ও ইতিহাসের আঘাত ও যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব জড়িয়ে আছে; কালযুক্ত ইতিহাসচেতনা বাস্তবের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনাকে তীব্র করে তুলেছে : এই স্বপ্নকল্পনা সৌন্দর্য বাস্তব ইতিহাস কালের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইয়েট্‌স্‌ ও জীবনানন্দের কবিব্যক্তিত্বকে কাব্যে চিত্রিত করবার সুযোগ দিয়েছে। যদিও জীবনানন্দের অন্তর্দীপ্ত ইতিহাসচেতনা হেগেলীয়; মানুষের ইতিহাস শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মার্কস্‌কে মনে পড়িয়ে দেয় : সেখানে যে-চিন্তা আগে ছিলো, সে-চিন্তা আর আসবে না, সৌন্দর্য থেকেই সৌন্দর্যের মৃত্যু হয়, উৎকর্ষ থেকে উৎকর্ষের মৃত্যু, প্রাচীন বংশধারা মুছে গেছে : এবং সমস্ত জিনিশ অনির্দিষ্ট রূপের ঘূর্ণিতে আবার ডুবে যাচ্ছে (and all things run On that unfashionable gyre again) লেডার ইতিহাসেও সেই একই সত্য, এই ঘূর্ণির ওঠানামার দ্বন্দ্বে অভিজ্ঞতালাভের নামই জ্ঞান। তাই পরীর কল্পনায় মধ্যযুগীয় রহস্যে অতীতের ইতিহাসের দূর কল্পনায়, লোকসাহিত্যের স্বপ্নের স্পন্দনে যখন দুজনেই পালিয়ে যেতে চেয়েছেন রোম্যান্টিক কবিদের মতো, সেখানেও রক্তের যুক্তিহীন স্রোত পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিচ্ছে (Irrational streams of blood are staining earth;) সেখানেও কাদা ও রক্ত সংবেদন শরীরে লেগে আছে। অর্থাৎ ইতিহাসের ও কালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, এবং এই দুই মেরু দুজনের কবিব্যক্তিত্বকে ও তাঁদের কাব্যের রিয়্যালিটিকে গড়ে তুলেছে; সুতরাং এই পলায়ন নির্বাসন নয় মালার্মের মতো।

দুজনেই রোম্যাণ্টিক আদর্শে ব্লেকের ও কোল্‌রিজের কল্পনাকে আশ্রয় করে প্যাটার্ন ও রূপকল্প ঐক্যে পরিণামী ও নিটোল করে তুলেছেন। কল্পনাই তাঁদের কাব্যের রূপগঠনের হয়ে-ওঠার শ্রেষ্ঠ উপায়, কোল্‌রিজ যার নাম দিয়েছেন: 'ইন্‌আইন্‌স্‌বিল্‌ডঙ্‌' (Ineinsbildung). সব মিলে এক হয়ে ওঠে। উপাদানের সংবেদনার বিশৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্য ঐক্যে এক হয়ে ওঠে সমগ্রতায়। সেখানে কোনো অসাধারণ অস্পষ্টতা ও অপরিচ্ছন্নতা নেই, প্রত্যেকটি মোটিভ্‌ই ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় যুক্তির দুর্বোধ্য রহস্যে গড়ে ওঠে। ইয়েট্‌স্‌ শিল্পী হয়ে এই ভিন্ন ইডেনের স্বপ্ন দেখেছেন, কারণ এতে মানুষের বিভিন্ন প্যাশন ও মোটিভ্‌ ঐক্যময়। সত্তার ঐক্য গড়ে-তোলা দুজনেরই উদ্দেশ্য; তাই কিট্‌সের 'অভাবাত্মক সামর্থ্যে'র প্রতিবাদ করেছেন যুক্তির স্থির সমন্বয়ে, কেননা 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি' বা 'অভাবাত্মক সামর্থ্য'। শুধ এই অনিশ্চয়তা সংশয় ও সন্দেহকে মারাত্মক এক বিশৃঙ্খলায় নিয়ে আসে. অনিশ্চয়তা-জাত বিশৃঙ্খলার জন্যে এজরা পাউণ্ড ও এলিঅটকে ইয়েট্‌স্‌ কখনো পছন্দ করেন নি, কেননা সত্তার ঐক্য তাঁরা ইচ্ছে করে ধরতে চান না, সত্তা যেন নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তনের সঙ্গে ঐক্যহীন সত্তা এর-ওর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে, এক হচ্ছে, ছেড়ে যাচ্ছে, এগোচ্ছে, দেহ ও মনের সঙ্গে মিলছে, ভাঙছে শুধ। হেন্‌রি জেম্‌স্‌ ও উইলিয়াম জেমসের ইম্‌প্রেশনের স্রোত নিয়েই প্রুফ্রকের মনস্তাত্ত্বিক নাটকীয়তা। ইয়েট্‌সের নাটকীয়তায় নোহ্‌ নাটকের ও ছবির স্থির চিত্রের বহু রঙের উদ্‌ভাস আসে। ভাঙা লাফানো টুক্‌রো ছেঁড়া ছবি ও চিত্রকল্পের স্রোত ইম্‌প্রেশনের মতো দুজনের কবিতায় কখনো দেখা যায় না। ইয়েট্‌সের মনে হতো এলিঅটের কবিতায় কখনো ইম্‌পাল্‌স ও এ্যাটিটিউড ইম্‌প্রেশনের মতো বিশৃঙ্খল হয়ে ভেসে চলেছে, সুগঠিত ও সংগঠিত নয় ঐক্যে। পরিপূর্ণ সমগ্র ঐক্য তাই প্রকাশ পায় না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ না পেলে বস্তুর রিয়্যালিটিও ধরা পড়ে না, টুক্‌রো সংবাদ বা তথ্য ধরা পড়ে। এই কারণে ইয়েট্‌স্‌ দেশের লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যে শিকড় খুঁজেছেন, আধুনিক কবিতায় আধুনিক মানুষের নিরাশ্রয়তা দেখেছেন, এই নিরাশ্রয়তা এসেছে সংশয়বাদ থেকে। এই সংশয়বাদ থেকে পালাবার জন্যেই তাঁর কবিতাকে পুনঃসৃষ্টি করেছেন কাব্যের পুরনো রূপগঠন গ্রহণ করে। উপেক্ষায় এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন : 'আমাদের সংশয়বাদকে মর্যাদা দেবার জন্যেই আধুনিক কবিতা ও আধুনিক মানুষ এই শব্দ আবিষ্কার করেছে।' ইয়েট্‌স্‌ ও জীবনানন্দের ফর্ম : An image of mysterious wisdom won by toil. তবে জীবনানন্দ বাঙালি বলেই হয়তো ট্র্যাজিক বীরত্ব ও সংগ্রামের পরিবর্তে গীতিকবিতার একমুখীন সরলতার গভীরতায় ব্যাপ্ত হতে চান।

৬

ইয়েট্‌স যেমন সত্তার ঐক্যগঠনের জন্যে প্রতীককেই গ্রহণ করেছেন তাঁর অনুভবের সঙ্গে নিসর্গ জগৎকে মিলিয়ে দিতে, যেখানে অনুভূতির সঙ্গে বুদ্ধি, বুদ্ধি ও অনুভূতি জ্ঞানের একটা সামঞ্জস্য নিয়ে আসে সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে, যে-উপাদান শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম নয়, দেশের জাতীয় ও প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে জাদু ও গুহ্যবিদ্যার অভিভব একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে এবং অনুভূতির ও

বেদনার মধ্যে ভিক্টোরিয় যুগের পলায়নী মনোভাব, ক্ষয়িষ্ণু কবিতার বিষণ্ণতা ও বিবর্ণতা এবং বিবর্ণতার সঙ্গে হৃদয়ের এলিয়ে-পড়া ভঙ্গুরতার মধ্যে সাহসের অভাবে পৃথিবী থেকে উধাও হবার বাসনা জড়িত। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মধ্যযুগীয় মনোভাবের সঙ্গে চিত্রধর্মিতার যোগ, সেই সঙ্গে মিথ্ লোকসাহিত্য, ভাস্কর্য নাচ গান ও স্বয়ংচালিত ও অচেতন স্বাধীন লেখা—এই সব উপাদান একসঙ্গে জটিল দুরূহ দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ও রহস্যময় করে তুলেছে—তেমনি এলিঅটের অন্বিষ্ট পৃথিবীর মিথ্-প্রসঙ্গ-উল্লেখ-নির্দেশ থাকলেও তাঁর কবিতার ফর্মের মধ্যে প্রথম দিকে চলচ্চিত্রের কোলাজ, মার্কিনী দর্শন ও মনস্তত্ত্বের ইম্‌প্রেশনধর্মিতা ও চেতনাপ্রবাহ, ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবির রিয়্যালিটির বিপর্যয়, আলো ও রঙের বিশ্লেষণ, ফর্ম ও রঙের বিচ্ছেদ ও ব্যবধান এনে দিয়েছে, রঙের উজ্জ্বলতায় গোটা রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। যে-রূপ বাইরে দেখছি, সেইরূপ আমার পারসেপ্‌শন ও চিন্তার সঙ্গে মিশে মুহূর্তের চলমান ইম্‌প্রেশন দ্রষ্টার অনুভবে ও চোখে গড়ে ওঠে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে সেটা ফুটিয়ে তোলাই ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবির মৌল আদর্শ। তাই এর স্পষ্ট রূপ ও রেখা দেখতে পাওয়া যায় না, চলমানতা ও স্রোতধারাই এর লক্ষণ, এ কারণে সাংগীতিক রীতি এর মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে; মনের ছবির প্রভাব ও পিকাসোর প্রথম দিকের অনুসরণ নবীন কবিতালেখক এলিঅটকে প্রভাবিত করেছিলো।

এই ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবির সঙ্গে জেম্‌সের ইম্‌প্রেশন ও চেতনাপ্রবাহের যোগ আছে; নদীর স্রোতের মতো প্রবহমানতায় ইম্‌প্রেশন চলে; সব কিছু মিলে এই চলমানতার মধ্যেই ঐক্য আসে। ইম্‌প্রেশনগুলি কাটাকাটা নয়, আবার সংযুক্ত ও শৃঙ্খলাযুক্ত নয়, বস্তুকে ভাঙছে দ্রষ্টার পারসেপ্‌শন ও চৈতন্য, সেইহেতু বস্তুর যে-ইম্‌প্রেশন গড়ে উঠেছে, সেই ইম্‌প্রেশনের মধ্যেই তার নির্বাচন হয়। বাক্যের মধ্যে শব্দের অর্থের স্থিরধর্মিতা যেমন আছে, তেমনি বাক্যের শব্দের অর্থের পুরোটায় চলমানতাও আছে এবং দুয়ে মিলেই বাক্যের ভেতরে অস্পষ্টভাবে সমগ্রের বোধ ধরিয়ে দেয়।

হেন্‌রি জেম্‌স্ তাঁর উপন্যাসে চৈতন্যের এই নাটকই তৈরি করতে চেয়েছেন, তিনি চাইতেন সমস্যা চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকুক, তারই ফলে চরিত্র হয়ে উঠবে, ধীরে ধীরে নিজের চিন্তা-অনুভূতি'কে প্রকাশ করবে, হয়তো কিছু ভ্রান্তি, অস্পষ্ট মূঢ়তা বিভ্রান্তি অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগ ঘটবে, চরিত্র ভুল করবে, তবু এর মধ্যে বুদ্ধি এমনভাবে নিহিত থাকে যে বাইরের প্রতীয়মান জগৎ তার পারসেপ্‌শনে প্রতিফলিত হয়, এবং সমস্তটা মিলে সিটয়েশন ও গল্প তৈরি করে। এইভাবে সামগ্রিকতায় একটা বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপ গড়ে ওঠে। এর ফলে চরিত্রের ভেতরটা দেখানো সহজ হয়। পরস্পরের সম্পর্কে বস্তু ও চরিত্র উন্মোচিত হয়, দেশ কাল একই সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় চরিত্রের ইম্‌প্রেশন ও বোধে। বাইরের জগৎ আলোকিত হয় চরিত্রের মনের জগতের দ্বারা, মনের জগৎ ও উপন্যাসের টেক্‌নিক, এখানে কোনো গল্প বলে না, ব্যাখ্যা করে না, বর্ণনা দেয় না, চরিত্র যেন সব কিছু গ্রহণ করে প্রতিফলকের মতো, সব কিছু ধরে পূর্ণ করে, চরিত্রের পারসেপ্‌শনের মধ্যে ইম্‌প্রেশনের স্রোতেই সমস্ত গল্পটা প্রতিফলিত হয়,

চরিত্র ও সিটুয়েশন মিলে যেমন একসঙ্গে হয়ে ওঠে, বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও গল্পের নিহিত তাৎপর্যও উঠে আসে। এবং এই রীতিই এলিঅট প্রুফ্রকের চরিত্রে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

সেই সঙ্গে স্পর্শ আছে বের্গসঁ'র কাল-পরিমাণের। সিনেমায় বস্তুর যথাযথ রূপ দেখা যায় ; কিন্তু সেইরূপ সত্য নয়। যেমন গাণিতিক নিয়মে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত সময়ের গতি সত্য নয়, কেননা পরিবর্তনে বস্তুর প্রতিটি অবস্থা কখনো দেখা যায় না, বস্তুকে বুদ্ধি দিয়ে দেখলে এ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; কিন্তু বুদ্ধির বাইরে এর সত্য নিহিত। এই সত্যের মধ্যে আছে পরিবর্তন, আর এই পরিবর্তনে পারস্পরিকভাবে জড়িয়ে আছে অতীত ও বর্তমান, পরস্পরে একটার সঙ্গে আর একটা এমনভাবে ঢুকে গেছে যে কাউকে কখনো আলাদা করা যায় না ; তাই কালপরিমাণের সঙ্গে স্মৃতি জড়িত, কোনো কিছু মনে করলেই স্মৃতিতে বস্তু জেগে ওঠে, স্মৃতিতে জেগে-ওঠা বস্তু বর্তমানের সঙ্গে মিশে যায়। তাই অতীত বর্তমান আর বাইরের সঙ্গে গাণিতিক ক্রমপরম্পরায় আলাদা নয়, আমাদের চৈতন্যের মধ্যে ঐক্য কম। এই কালপরিমাণের বোধই প্রুফ্রকের ইম্‌প্রেশনে মিশে গেছে।

মোপাসাঁ সম্বন্ধে হেন্‌রি জেম্‌স্‌ বলেছিলেন : মোপাসাঁ'র প্রতিটি গল্পই ছবি ও আইডিয়ায় একসঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত; কিছু বলে না, বর্ণনা দেয় না, এর সমস্যার পূর্ণরূপ ওই দুই উপাদানে চিত্রিত। একথা প্রুস্তের রচনাপদ্ধতিসম্বন্ধে আরো খাটে। ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতি ও তার ক্ষয়ের চিহ্নকে নায়কের ইম্‌প্রেশন ও অনুভূতিতে তুলে ধরেছে বিস্ময় ও উদ্বেগের চিরন্তন অভিজ্ঞতা, একই সঙ্গে উদ্বেগে ও বিস্ময়ে সে কেঁপে উঠেছে, ভাগ্যের এই ধাঁধার মধ্যেই মানুষ জড়িয়ে গেছে। তা থেকে তার মুক্তি নেই। মানুষের অবচেতনে এই ধাঁধার রহস্যকে তিনি দেখেছেন। সেই অবচেতনে অনুভবের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। এই অনুভবের বাস্তবতার মধ্যে নানারকমের উদ্দেশ্য সঙ্কল্প মর্জি ইন্‌স্টিংক্ট খেলা করে, মাঝে মাঝে বুদ্ধির যোগ ঘটে ঘটনা ও বাইরের জগতের সঙ্গে, তারপরই ছিঁড়ে যায়। ঘটনা ও আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন বাস্তবে মেলে না। তাই উন্মাদনা, নৈরাশ্য ও হতাশা এবং মর্বিডিটি ছেয়ে যায় অনুভবের চিন্তায়। দ্বিতীয়ত, সময়ই প্রুস্তের ধ্যেয় বস্তু। তিনি স্মৃতির জাদুতে বেঁচে থাকতে চান সজীব হয়ে। এই স্মৃতিই চিত্রকল্প তৈরি করে, সেই চিত্রকল্পকে মনে হয় অতীতের রক্তহীন ভূত, চৈতন্যের ছায়া, বিস্মৃত অভিজ্ঞতা, মুহূর্তে যে-অতীত আলোকিত হয়ে জেগে ওঠে; ইমোশন ও ইম্‌প্রেশন একসঙ্গে মিশে যায় তখন ফুলের গন্ধ ফলের আস্বাদ যৌবনের যৌনতার আনন্দ ও আস্বাদ নিয়ে আসে। প্রুস্তই নিজেই বলেছেন : জীবনের ছবি বহু ও বিচিত্র সংবেদনা নিয়ে আসে সঙ্গে করে। উদাহরণত, বইয়ের মলাটের দৃশ্য নামকরণের চরিত্র থেকেই দূরের গ্রীষ্ম রাত্রির চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বনে তোলে। সকালবেলায় কফির স্বাদ একটি সুন্দর দিনের ক্ষীণ আশা নিয়ে আসে আমাদের কাছে; এই সুন্দর দিন হয়তো পূর্বে কখনো আমাদের দিকে হেসেছিলো বাঁশির সুরে রাঙানো বল বা পোর্সেলিন থেকে উঠে-আসা ভোর হবার আগে, এই বল বা পোর্সেলিনকে মনে হয় জমানো শক্ত দুধের মতো। একটা ঘণ্টা, শুধু একটা ঘণ্টা নয়, এই ঘণ্টা গন্ধে

ধ্বনিতে কল্পনায় আবহাওয়ায় ভরা একটা ফুলদানি। আমরা যাকে রিয়্যালিটি বলি, সে হলো সংবেদনা ও স্মৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক, এই দুটো একই সঙ্গে আমাদের আবেষ্টন করে, সিনেমাফটোগ্রাফিক দৃষ্টি এটাকে নষ্ট করে দেয়, কারণ এর ফর্ম বা রূপ সত্য থেকে একে আলাদা করে, লেখককে এ সত্যই আবিষ্কার করতে হবে এই কারণে যে সত্তার দুই বিভিন্ন অবস্থাকে চিরকালের জন্যে লেখক সংযোগ করতে পারবেন শব্দগুচ্ছে। প্রুস্তের রচনারীতির মধ্যেও তাঁর সময়ের এই অনুষঙ্গময় স্মৃতি পূর্ণতররূপে স্ফুট। অসংখ্য অনুচ্ছেদে ড্যাশে, বাক্যে অনুনিবিষ্ট ছোট ছোট বাক্যে অথবা হঠাৎ কখনো অস্বাভাবিক দীর্ঘ বাক্যে প্রুস্তের অনুভূত বিষয় চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, সেই সঙ্গে মিশেছে আয়রনি ও হাস্যকৌতুক। এই স্মৃতি ও সংবেদনার মধ্যেই তো প্রুফ্রক ফ্যান্টাসি দেখে এবং মৃত্যুতে ডুবে যায়।

জয়েসের মধ্যেও সেই একই রীতি যার প্রভাব ও অভিভব এলিঅটে, অন্তত প্রথম যুগে সুস্পষ্ট : এই জীবন নিরন্তর গতি, ওপরে মনে হয় এর কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এর নিহিত গভীরে অন্তস্তলে গভীরতর অর্থ সমুজ্জ্বল, দেশ-কাল মিলেই দেশ-কাল ছাড়িয়ে যায়, আধুনিক জীবনের বিশৃঙ্খলার অন্ধকার শেষে সবই নিরর্থক মনে হয়; কিন্তু সব মিলে সংগঠনের রূপে গড়ে ওঠে, যুক্তির গঠনের চেয়ে অনুষঙ্গময় গঠন একসঙ্গে স্রোতের মধ্যে ধরা পড়ে। 'প্রুফ্রকে'র 'প্রিল্যুডে'র 'পোর্টেট অব্ এ লেডি'র আপাত অর্থহীনতার অন্তরালে এই অনুষঙ্গময় গঠনের ঐক্য শিল্পের নতুন রূপ এনে দিয়েছে।

উইধাম (Wydham) লিউয়িস তাঁর উপন্যাসে সংগীতের স্ট্যাকাটো বা লাফানো ঝোঁকের দিকে নজর দিয়েছেন, এলিঅটের লেখায় এই স্ট্যাকাটো রূপ সুস্পষ্ট।

কন্‌রাডের উল্লেখ শুধু তাঁর লেখায় নেই, তাঁর রীতিও গৃহীত তাঁর কাব্যে। কন্‌রাড উপন্যাসের মধ্যে চেষ্টা করেছেন মানুষের চৈতন্যের বহু রূপ একসঙ্গে তুলে ধরতে; যা প্রত্যক্ষ, তাকে ছাড়িয়ে অদেখাকে জাগিয়ে তোলার রীতিই তাঁর ধ্যেয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে-রহস্য আছে, পরিবর্তনময় হারিয়ে-যাওয়া রূপের মধ্যে যে সত্য আছে, সেই রহস্যময় উধাও সত্যকে ধরবার চেষ্টাই তাঁর উপন্যাস। তাই ইম্‌প্রেশনগুলিকে তিনি সমন্বিত করতে চান অন্তর্গত স্বগতোক্তির মাধ্যমে। এই কারণে শব্দের ব্যবহারে ধ্বনির সুরময় ছবিকে একসঙ্গে শব্দের মধ্যে জাগিয়ে দেন—এই রীতি কন্‌রাডের কাছেই শিখেছিলেন।

আধুনিক উপন্যাসে লরেন্স আধনিক মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার রচয়িতা বলে পরিচিত, মানুষের যৌন কামনার মুক্তি ও স্বাধীনতা এনে সমাজকে সুস্থ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। এবং তিনি জয়েস্ ও প্রুস্তকে উপন্যাসের টেক্‌নিকের জন্যে নিন্দা করেছেন; কিন্তু ভার্জিনিয়া উল্‌ফের আলোচনায় ধরা পড়ে, তিনি ইম্‌প্রেশনধর্মী উপন্যাসের রীতিকে পোস্ট-ইম্‌প্রেশনধর্মী টেক্‌নিকে নিয়ে গেছেন, যেমন সেজানে থোকা-থোকা রঙের চাপে বাস্তবের প্রত্যক্ষের অতীত মনের গভীর রহস্যের কথা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ছবিতে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের কাছে ধরা পড়েছিলো, লরেন্সের উপন্যাসের প্রতি পাতায় দৃশ্য ও শব্দ এতো দ্রুত ও সরাসরি বয়ে যায় যেন

মনে হয় পাতার পর পাতায় তিনি স্বাধীন দ্রুত হাতে এই শব্দ ও দৃশ্য বসিয়ে গেছেন, একটি বাক্য দুবার চিন্তা করা যায় না, একটা শব্দও গঠনের পরিকল্পনায় বেশি ব্যবহৃত হয় নি, প্রতি পৃষ্ঠাতেই শব্দ থেকে চিত্র ও অনুভব যেন কেঁপে ওঠে, মৃদুভাবে চকচক করে যায়; সংবেদনার জালেই প্রতিটি চরিত্র সম্পর্কিত। এই শব্দ ও দৃশ্যের দ্রুততার পেছনে লরেন্সের মনের প্রবণতা সংযোগে সঙ্কোচনে বর্জনে দ্রুততায় ছবির মতো রঙে রেখায় ইম্‌পাল্‌সের ভেতরের গতিকে সুস্পষ্ট করা চাই, এতে মৌল অনুভূতির অবচেতন ক্রিয়া কাজ করে। লরেন্সও এ-সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন : চরিত্রের স্থির 'অহং' আর নেই; এখন আরেক 'অহং' বেরিয়ে আসে; এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মৌলিক অপরিবর্তিত উপাদানের বিশেষ অবস্থাকে আবিষ্কার করাই লেখকের কর্তব্য। কয়েকটি চরিত্রের বিকাশ নয়; সমস্ত চরিত্র মিলে একটা ছন্দোময় রূপ গড়ে তোলে, বেহালার ছড়ে যদি বালির রেকাবিতে রেখা আঁকা যায়, তাহলে বালি অজানা রেখার দিকে আমাদের টানে। লরেন্স বেহালার ছড়ে প্রত্যক্ষ জগতের বালির ওপর দ্রুত গতির রেখায় নিহিত তাৎপর্য। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ যদিও পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম ধারাব লেখিকা, তাতে প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎ সেন্সপার্‌সেপ্‌শনের স্তর থেকে মনের গভীরে স্তরে গিয়ে পৌঁচচ্ছে, মনের বিশেষ ইচ্ছা সংকল্প ও বোধের অনুসারে বস্তুর সারাৎসার নতুন রূপে গড়ে ওঠে; তিনি বলেন : তোমার অনুভবের জটিলতায় বিভ্রান্ত হয়ে তুমি রাত্রে বিছানায় গিয়েছো; তোমার মস্তিষ্কে একদিনে হাজারো আইডিয়া ঢুকে গেছে, মিশে গেছে হাজার ইমোশন, সংঘর্ষ বাঁধিয়েছে হাজারো চিন্তা, বিশৃঙ্খলায় উধাও হয়ে গেছে আশ্চর্য রকম। লেখককে তবু তুমি অনুমোদন করবে সমস্ত বস্তুকে কৌশলে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে, মিসেস ব্রাউনের চিত্রকল্প, তার বাইরের বিস্ময়কর রূপের সঙ্গে তার ভেতরকার যোগ কোনো প্রকারেই নেই, তার ভেতরে আকস্মিক বিক্ষোভ, দুর্বোধ্যতা, টুক্‌রো, ব্যর্থতা, অথচ বাইরে এর প্রকাশ নেই; ভেতরকার এগুলি ব্যর্থতা নয়।

মস্তিষ্কে হাজারো আইডিয়ার সঙ্গে ইমোশন এবং অন্যরকম বিশৃঙ্খলা যে এর সঙ্গে মিশে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছে, এখানেই এলিঅটের কাব্যরীতির সঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রীতির গভীরতর সংযোগ। এর মধ্যে ইম্‌প্রেশনের খেলাই লক্ষ করা যায়। যদিও ব্রাউনিঙের নাটকীয় স্বগতোক্তির সঙ্গে এলিঅটের রীতির যোগ আছে সামান্য, কিন্তু জেম্‌সের রীতি, সেই সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসের অন্তর্গত স্বগতোক্তি, যার উৎস জেম্‌সের উপন্যাসে, ইম্‌প্রেশনের ভেতরে এলিঅটের কবিতায় বিশেষভাবে কৌতূহলপ্রদ। উপন্যাসের এই রীতিকেই তিনি কাব্যে গ্রহণ করেছেন, এখানেই আধনিক বাস্তব মনস্কতা, তাঁর আত্মানসন্ধানী সচেতন আত্মবিশ্লেষণী মনোভাবের সঙ্গে মিশে গেছে; এই রীতিগ্রহণের জন্যেই তাঁর কবিতা অনেকটা গদ্যের মতো মনে হয়। তাঁর কবিতা থেকেই এই সত্য উঠে আসে, যদিও তথ্যগত প্রমাণও আছে প্রবন্ধে, বিশেষ করে, তাঁর রীতির শুরু এজরা পাউণ্ডের প্রবন্ধে; গল্প তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তিনি মাধ্যমই গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন; গাঢ় সংহতি, আলো-আঁধারের খেলা তাঁর প্রয়োজন ছিলো, তিনি ঘুরে বেড়ান, প্রয়োজনীয় অস্পষ্ট অন্ধকার যোগ করতে চেষ্টা করেন, হয়তো তিনি বেশি করে ফেলেন, মাকড়শার

জালের মতো উপন্যাস তিনি তৈরি করেন, অথবা বেরিয়ে আসে। বাইরের জগতের ইম্‌প্রেশন-পারসেপ্‌শনে কী রকম মাকড়শার জাল তৈরি করে আলো-আঁধারে—এলিঅটের কাব্যে তারি রূপ। এর কারণ এলিঅট কাব্যে যে-মানসিকতা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা ভাঙা অ্যাটমের মতো : De Bailahache, Fresca, Mrs. Cammel, whirled Beyond the circuit of the shuddering Bear In fractured atoms. আমাদের চিত্তকে অণুতে অণুতে ভেঙে দেখতে চেয়েছেন, কেমনভাবে নাইট্রোজেন-অ্যাটমের বিশৃঙ্খলার মতো আমাদের ভেতরে কোনো ঐক্য নেই। ইয়েট্‌সও বলেন : সব জিনিশ ভেঙে টুক্‌রো হয়ে গেছে, কেন্দ্র কিছুই ধরে রাখতে পারে না, প্রেমের মধ্যেও তিনি বিচ্ছেদ দেখেছেন, কিন্তু এলিঅটের মতো এমন ভাঙা টুক্‌রো বিশৃঙ্খলা দেখেন নি, তাই জেম্‌সের রীতি তাঁর পক্ষে সহজে গ্রহণীয় ছিলো।

ব্রাউনিঙের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, সেই দ্বন্দ্ব অনেকটা শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকীয় রীতির মতো, কিন্তু চিত্তের এই ভাঙা টুক্‌রো রূপ তিনি কখনো কল্পনা করতে পারেন নি। শত হলেও ভিক্টোরিয় আশ্বাস ও আশীর্বাদ, ভগবানে বিশ্বাস, তাঁর আত্মাকে সামঞ্জস্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছে; এবং তিনি তো বিংশশতাব্দীর মানুষের মতো এতো আত্মসচেতন সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ও জিজ্ঞাসায় এমন পীড়িত নন, নিজের মধ্যে নিজেকে এমন বিচ্ছেদে দেখতে পারেন না আবিষ্কার করবার জন্যে; নিজের বিশ্বাসে বাইরের জগতের ধ্বংস ও অসুখ থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন, যেমন বাঁচিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। গোধূলি আলোয় তিনি ও তাঁর সত্তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন এক করে। তিনি বলেছেন; 'সার্তো' কবিতায় আমাদের মনে হয় আমরা স্বাধীন, কিন্তু আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ আরো। এই দ্বন্দ্ব বাইরের, ভেতরের নয়, 'লিপ্পি' কবিতায় আছে : যা তুমি একান্তই চাইছো, তা তুমি চাইছো না; যা তুমি ঘৃণ্য মনে করো প্রচণ্ডভাবে সেটাই চাইছো, যদি তোমার কথায় তোমাকে দেওয়া হয়। এ দ্বন্দ্ব ভেতর ও বাইরের, কিন্তু অ্যাটমের বিশৃঙ্খলা নেই, যা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে অ্যাটম ভেঙে। এবং ব্রাউনিঙ তো শেষ পর্যন্ত এই আশ্বাসে সব দ্বিধা এড়াতে পেরেছেন 'লিপ্পো'র উচ্চারণে : একটা রূপের মধ্যে সমগ্র মিশছে যেন, আমি দেখেছিলাম, আমার কাজ ও সত্তা এক। এবং এই আদর্শেই তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা; মানুষের নাগাল ছাড়িয়ে যায় যা সে আঁকড়ে ধরে (Ah but a man's reach should exceed his grasp.)

এদিক থেকে বরং ডানের সঙ্গেই তাঁর যোগ বেশি, সেন্সিবিলিটিব বিশৃঙ্খলাব রূপ ডানের টেক্‌নিকের মধ্যে পেয়েছিলেন, যদিও ইমোশন ও বুদ্ধির সমন্বিত ঐক্যই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু বিরোধের মধ্য দিয়েই ঐক্য গড়ে উঠছে, যদিও তাঁকে পীড়া দেয়, একের মধ্যে বিরোধ মিশে যায়; অস্থিরতা অস্বাভাবিকভাবে স্থির স্বভাবের জন্ম দেয় : (Oh, to vex me contraryers meet in one; Inconstancy unnaturally hath begott A constant habit;) গভীর প্রেমের মধ্যেও জিজ্ঞাসা, সুখের কেন্দ্র কোথায়; ভালোবেসে পেয়ে সব কথা বলেও প্রশ্ন জাগে : বৃদ্ধ হলে কি আর ভালোবাসতে পারবে, পাবে, কথা বলতে পারবে; তাই প্রেমে কবি নিহিত রহস্য আর দেখতে পান না, সবই প্রতারণাময়; প্রেমে হতভাগ্যেরা শপথ করে, প্রেমে শরীর মিলিত হয় না, মন মিলিত হয়; কিন্তু কবি নির্দেশ দিচ্ছেন : নারীর মধ্যে মন প্রত্যাশা করো না; খুব বেশি

হলে মাধুর্য ও কৌতুক তারা পেয়েছে, আসলে মমি ছাড়া নারীরা কিছুই নয় :

Some that have deeper digg'd love *Myne* then I,
Say, where his centrique happinesse doth lie :
I have love'd, and got, and told,
But should I love, get, tell, till I were old.
I should not finde that hidden mysterie,
Oh, 'tis imposture all :
And as no chymique yet th' Elixar got,
But glorifies his pregnant pot,
If by the way to him befall
Some odoriferous thing, or medicinall,
So, lovers dreame a rich and long delight
But get a winter-seeming summers night.

Hope not for minde in women; at their best
Sweetnesse and wit, they'are but *Mummy*, possest,
Loves Alchymie

'এক্‌স্‌ট্যাসি' বা 'পরম উল্লাস' কবিতার শেষে বলেছেন : প্রেমের রহস্য আত্মায়ই গড়ে ওঠে, কিন্তু তবু দেহ হচ্ছে তার বই; যদি কোনো প্রেমিক কারো সংলাপ শুনে থাকে, যদি তাকে লক্ষ করতে বলা হয়, তাহলে সে সামান্য পরিবর্তন দেখবে, যখন আমরা দেহে যাই। দেহ ও আত্মার মতো বুদ্ধি ও ইমোশন, ইন্দ্রিয় ও বোধ, পরস্পর পাশাপাশি বিরোধে ক্রমান্বয়ে ঐক্যে গড়ে উঠেছে। এমনিভাবেই ডানের কবিতায় বিরোধময় ঐক্যের রূপ, যা এলিঅটে স্পষ্ট।

কিন্তু তবু আত্মার সেই বিচ্ছেদময় ক্ষত ও যন্ত্রণা এখানে নেই, আছে লাফর্গের কবিতায়; নাগরিকতার সমস্ত জ্বালা ও যন্ত্রণা এবং নৈরাশ্য এঁর কবিতায় ব্যঞ্জিত, এবং আধুনিক মানুষের, আত্মবিদ্রূপে ভুলে থাকবার সান্ত্বনা, জীবনের ব্যঙ্গ ও কশাঘাতময় সমালোচনা, ক্লান্তি ও তিক্ততা, নিরুত্তেজ সেন্সিবিলিটি, মুমূর্ষু পৃথিবীর রুগ্নতা অথচ আয়রনির তীক্ষ্নতা, গদ্যের ছন্দস্পন্দে প্রতীকী কবিতার স্তরকে পেরিয়ে এসেছে অনেকখানি, কথ্যভাষার ধ্বনি ও সংগীতও এই সঙ্গে যক্ত। পরবর্তীকালে অ্যাপোলিন্যারের মধ্যে এরই তীক্ষ্ন রূপ, মানসিক ঔদার্যের সঙ্গে চৈতন্যের বিশৃঙ্খলা, ঐতিহ্যের ক্ষীণ স্মৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির টুকরো ভাঙা কুৎসিত রূপ, ইন্দ্রিয়ময়তার সঙ্গে প্রেমের নিষ্পাপতা—তাই সব মিলে আত্মধিক্কার বিদ্রূপ ও গ্লানি এবং রসিকতা, এবং সবই চৈতন্যের বিচ্ছেদ। 'প্রুফ্রক' কবিতায় 'তুমি' ও 'আমি'র যে-আত্মবিচ্ছেদ, 'তুমি'র প্রেমিকার রূপে প্রকাশ মনে হয়, লাফর্গের 'দিমান্‌শে' 'রবিবার', কবিতায় এর স্পষ্ট রূপ আছে, সেই সঙ্গে অন্য বৈশিষ্ট্যও :

সংক্ষেপে নিজেকে আমি সমর্পণ করে দিতে যাচ্ছিলুম এই কথায় আমি
তোমাকে ভালোবাসি।
যখন আমি বুঝলুম ব্যথা ছাড়া কিছুই নয়

প্রথমত আমি আমাকেই প্রকৃতপক্ষে পাইনি
(আমার সত্তা গালাথে, যে পিগ্‌মিলিয়ন্‌কে অন্ধ করে দিচ্ছে
এই অবস্থা-পরিবেশকে পাল্টানো অসম্ভব।)

সুতরাং তাই দীন বিবর্ণ ও হতভাগ্য প্রাণী
যে-হারানো মুহূর্তে তার সত্তায় বিশ্বাস করে
আমি দেখলুম, আমার প্রেমিকা উধাও হয়ে গেলো
বহু বস্তুর মধ্য দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেলো
যেমন কাঁটাঝোপ তার সুন্দর গোলাপকে
সন্ধ্যার ভূমিকায় পাপড়ি ঝরতে দেখে
Bref, j'allais me donner d'un "Je vous aime"
Quand je m'avisai non sans peine
Que d'abord Je ne me possédais pas bien moi-meme.

(Mon Moi, c'est Galathée aveuglant Pygmalion!
Impossible de modifer cette situation.)

Ainsi donc, pauvre, pâle et piétre individu
Qui ne croit à son Moi qu'á ses moments perdus,
Je vis s'effacer ma fiancée
Emportée par le cours des choses,
Telle l'epine voit s'effeuiller,
Sous prétexte de soir sa meilleure rose.

পিগ্‌মিলিঅনের প্রেমিকা গালাথে তো কাল্পনিক, মিথ্যা স্বপ্ন, অথচ তার সঙ্গে তার প্রেম, তার অন্য সত্তা, এই মিথ্যা সত্তাই তাকে অন্ধ করে দিয়েছে, এই মিথ্যা স্বপ্নের কাছে সমর্পণ তো যন্ত্রণা নির্বেদ ব্যথা ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রুফ্রকও এই মিথ্যা 'তুমি'র অন্য সত্তায় নিজেকে ভুলিয়ে শেষে ডুবে যাচ্ছে।

এই সঙ্গে চিত্রকল্পবাদের প্রভাব তুলে নিয়েছিলেন এলিঅট তাঁর কবিতায়। যদিও হিউমের আদর্শ পুরোপুরি নেই, বরং পাউণ্ডের আদর্শই গৃহীত, যেখানে বুদ্ধি ও ইমোশন একসঙ্গে মিশে গেছে; আইডিয়া নয়; শব্দের মধ্যে বস্তুজগৎকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলাই এর মূল আদর্শ, সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্তি ও সংহতি শব্দের বিন্যাসে ও বাক্যগঠনে, এবং কবিতার অনুভবের প্যাটার্ন গড়ে উঠবে সমস্ত কবিতার ছন্দস্পন্দে, ছন্দস্পন্দেই সমগ্র কবিতার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠবে অনুভবের তরঙ্গে; টুক্‌রো-টুক্‌রো ছবির মধ্য দিয়েই গোটা কবিতার একটি পুরো ইমেজ বা চিত্রকল্প বা উপমা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে। চিত্রকল্পবাদে বাইরের জগৎ শব্দে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, অস্পষ্টতা নেই; কিন্তু ইম্‌প্রেশনধর্মী কবিতায় বাইরের জগতের ছবির স্রোত পারসেপ্‌শনে ঢুকে নতুন অনুভবের ছবি হয়ে ওঠে। ছবির মধ্যে মনের অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে বলেই বাইরের ছবির স্পষ্টতা মুছে যায়, গলে যায়; নূতন ছবির মধ্যে সংগীত আবহাওয়ায় ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। ধ্বনিময় সংগীত ও জগতের ছবি পাশাপাশি ভ্রান্তি সৃষ্টি করে পারসেপ্‌শনে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্যারডি 'প্রিল্যুডে' এলিঅট চিত্রকল্পবাদের

সঙ্গে ইম্‌প্রেশনধর্মী কবিতাকে একসঙ্গে মিলিয়েছেন, শেষের দিকে ইম্‌প্রেশনই বিশেষ করে প্রধান হয়ে ওঠে। 'প্রিল্যুডে'র প্রথম অংশে চিত্রকল্পবাদের ছবি সুস্পষ্ট, ছবিই কথা বলতে চাইছে অর্থের : The Winter evening settles down With smell of steaks in passageways. Six o' clock. The burnt-out ends of smoky days. And now a gusty shower wraps the grimy scraps Of withered leaves about your feet And newspapers from vacant lots; জমাট শীতে সন্ধ্যা, মাংসের কালির গন্ধ, সরু গলি, ধোঁয়াময় দিন, সিগারেটের পোড়া শেষ টুক্‌রো, ঝড়ো বৃষ্টি, ঝুল-কালি-মাখা; উচ্ছিষ্ট, বিবর্ণ পাতা, খবরের কাগজ, খালি জায়গা ;—এই সব ছবি মনে হয় ক্যামেরায় তোলা ; কিন্তু এই ছবিগুলি ছবি থাকে না, চেতনায় ঢুকে যায়, দ্বিতীয় অংশে কাঠের গুঁড়োর ধুলোয়-মাড়ানো রাস্তা থেকে বিয়ারের ক্ষীণ মরা গন্ধ-মেশানো সকাল চেতনায় ঢুকে গেছে, অর্থাৎ মানুষের চেতনাই বিয়ারের ক্ষীণ মরা গন্ধ, কাঠের গুঁড়োর ধুলোয়-মাড়ানো রাস্তা, কর্দমাক্ত পা। রবীন্দ্রনাথে এই সব বীভৎস বর্ণনা আছে এ-যুগের অনুকরণে : 'লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি মাঝে-মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ : জমে ওঠে পচে ওঠে আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি মাছের কান্‌কা, মরা বেড়ালের ছানা, ছাইপাঁশ আরো কতো কী যে, বাদলের কালো ছায়া স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে কলে-পড়া জন্তুর মতন মূর্ছায় অসাড়; দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপ।' এগুলি হরিপদ কেরানির মনের বাইবেই থেকে যায়; দেখে, কিন্তু এড়িয়ে যায়; তাই ভেতরে ঢোকে না, সেখানে রোম্যাণ্টিক আদর্শ ও উদ্‌ভাস উড়িয়ে দেয় সব কিছু প্লেটোর পরমের মতো : কিন্তু এলিঅটে এই সব ছবি ইম্‌প্রেশনের মধ্য দিয়েই তাঁর অভিজ্ঞতাকে গড়ে তুলছে, তাই বিছানায় শোয়া-লোকটা প্রতীক্ষায় ও ঝিমিয়ে রাত্রি দেখে, এবং হাজারো রকম নোংরা চিত্রকল্প তার সামনে তুলে ধরে, এবং হাজারো চিত্রকল্প থেকেই লোকটার আত্মা বা জ্ঞান গড়ে উঠছে : ...and watched the night revealing The thousand sordid images of which your soul was constituted, এবং শেষ স্তবকে এই আত্মাই আকাশে ছড়িয়ে আছে, কালো রাস্তা এবং এ-যুগের মানুষের বিবেক তখন এক, মানুষের বিবেকের মধ্যেই একালের জগৎ ঢুকে গেছে জ্ঞানের উপাদান অর্থাৎ ইম্‌প্রেশনের মতো। এবং নোংরা রাস্তার কালো বিবেক নিয়ে কী করে মানুষ বেঁচে থাকবে? তাই লাফর্গীয় আত্মবিদ্রূপ ধিক্কার ও ব্যঙ্গের হাসির মধ্যে এই নির্দেশ : 'তোমার মুখে হাত মুছে নাও। এবং হাসো, বুড়ি মাগির মতো জগৎ ঘুরছে খালি পেটে জ্বালানি জুগিয়ে।' বুড়ি মাগির নোংরা জগৎ আমাদের জ্ঞানের ইন্ধন জোগাচ্ছে একালে; এমনিভাবেই চিত্রকল্প ও ইম্‌প্রেশন চৈতন্যে স্রোতময়, সেই সঙ্গে ব্যঙ্গের আঘাত, হাসির নির্দেশ! দান্তের নরক শুধু নৈতিকতায় ও আদর্শেই কাজ করে নি এ কবিতায়, দান্তের নরকের ছবি ও দান্তের নরকের প্রথম স্তবকের সঙ্কেতকেই তুলে ধরছে : Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai per una selva oscura, / che la diritta via era smarritta.

৭.

এলিঅটের কাব্যে যেমন কাব্যিক উপন্যাসের ইম্‌প্রেশনধর্মী গদ্য ও চিত্রকল্প তাঁর কবিতার টেক্‌নিক্‌ ও ফর্ম তৈরি করেছে, ইয়েট্‌সের কবিতার ফর্ম গড়ে তুলেছে ফরাশি

প্রতীকী কবিতার রীতি, প্রি-র‍্যাফেলাইট ও ডেকাডেন্ট কবিতার আদর্শের সঙ্গে লোকসাহিত্য ও কিংবদন্তির সঙ্কেতধর্মী ব্যবহার। এবং এই রীতি জীবনানন্দেও; বাংলা কবিতায় এলিঅটের রীতির শব্দপ্রয়োগে নয় ; সার্থক প্রকাশ, আমার মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথের, বিষ্ণু দে'র মধ্যে নয়, যদিও তিনি মালার্মের কাব্যরীতির অনুসরণের কথা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু মালার্মের শব্দের প্রয়োগরীতি সুধীন্দ্রনাথে ক্ষীণ, এবং মালার্মের অন্বিষ্ট সেই শব্দের থেকে উন্নীত সংগীত কি কখনো ছুঁতে পেরেছেন তিনি জীবনে! কিন্তু তবু মালার্মের শব্দপ্রয়োগের রীতি পরবর্তী কবিদের প্রায় সকলকেই কিছু না কিছু প্রভাবিত করেছে, যদিও তাঁর সৌন্দর্যের আদর্শ একমাত্র তাঁরই; তাঁর শিষ্য ভালেরিরও রূপ নয় ; কেননা সেই আদর্শ বস্তুর মধ্যে থাকলেও, রূপের মধ্যে অরূপ থাকলেও, শেষে রূপ হারিয়ে গিয়ে প্লেটোর পরম বা অইডিয়াল একমাত্র হয়ে ওঠে, বস্তুজগতের রহস্যের পর্দা সহসা উঠে যায়।

এই প্রকৃতি-জগৎ অভিভাবক বিষ, ছায়া, এর মৃত্যু হলেই তাকে আমরা পাই, এই জগতের ছায়া উবে গেলেই বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতার আবির্ভাব। এই জগতের ঘৃণ্য কিন্তু শীতল স্বপ্নে আমাদের আদর্শ, রাজহাঁসে প্রতীকিত এবং প্রতীকী কবির সত্তা অচঞ্চল, গতিহীন, ঐ অপ্রয়োজনের নির্বাসনের মধ্যে কবির স্বপ্নস্বর্গ।

মাতাল ডানার আঘাতে পরিদৃশ্যমান জগৎ তুষার কণার তড়িত হ্রদ ছিঁড়ে দেয়, ডানার আঘাতে জেগে ওঠে শাদা উদ্বেগ, এই শাদা উদ্বেগ স্থানকে অস্বীকার করে, এই জগতের ভীষণতা থেকে পালিয়ে যেতে চায়, এই জগৎ থেকে সরে গেলেই বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা আসবে, এই বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অচঞ্চল গতিহীন, এ জগতেরর সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে ঠাণ্ডা স্বপ্নে নীত, এই ঠাণ্ডা স্বপ্ন বাস্তবের নির্বাসন, এবং বাস্তবের প্রয়োজনে লাগে না, এই ঠাণ্ডা স্বপ্নে শুধু জেগে থাকে কুমারী, সজীব সুন্দর দিন অর্থাৎ উজ্জ্বলতা। কুমারী, যার মধ্যে যৌনতার, বাস্তবের, কামনার কলুষ স্পর্শ করে নি :

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre
Ce lac dur oublié que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui!

Fantôme qu'a ce lieu son pur éclat assigne,
Ils' immobilise au songe froid de mépris
Que vét parmi l'exil inutile le Cygne.

এই বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতার সাধনা রোম্যান্টিকদেরও, তবে রোম্যান্টিকেরা এই জগৎকে অস্বীকার করে না, নির্বাসনে দেয় না; এই জগতের ছায়ার মধ্যেই পরমের আলো একসঙ্গে আছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি'; রূপ ও অরূপ এখানে মিশে আছে, শেলি'র 'ইনটেলেক্চুয়াল বিউটি' কবিতার প্রথমেই এই মেশানো অনুভূতির কথা আছে ঃ The awful shadow of some unseen Power Floats though unseen among us,—মালার্মে অদেখা শক্তিকেই শুধু দেখতে চেয়েছেন। এবং ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা শব্দে এ জগতের অর্থ থেকেই যায়।

কিন্তু যে-উপায়ে করেছেন শব্দপ্রয়োগে, সেই রীতি ভয়াবহ ও অতুলনীয়, তিনি যেমন ধ্যান করেছেন বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতার তেমনি জাতির শব্দকে অর্থে আরো বিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন (Donner un sens plus pure aux mots de tribu) এই কারণেই বাক্যের মধ্যে শব্দের সংহতি, সংক্ষিপ্ততা, অনুষঙ্গময় জটিলতা, দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা; বাক্যগঠনের যৌক্তিক পারম্পর্য ভেঙে ধ্বনির মধ্য দিয়ে, সংগীতের ইঙ্গিতময় পরমকে জাগাতে চান; অর্থকে নয়, তাঁর অভিপ্রেত ছিলো সংগীতের এই ইঙ্গিতময়তা জেগে উঠবে শব্দের সংগতিপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। তাই প্রত্যক্ষ উচ্চারণের চেয়ে তির্যক উচ্চারণের ইঙ্গিতই তাঁর রীতি। যেহেতু শব্দের মধ্যে ধ্বনি আছে, রূপ আছে, রূপের মধ্যে সঙ্কেত আছে, রূপের সঙ্কেতে অব্যবহিত জগৎ গড়ে ওঠে, তাই অব্যবহিত জগতের প্রত্যক্ষতা মুছে দিয়ে অসাধারণতাকে ফুটিয়ে তুলতে ছন্দস্পন্দ ধ্বনি ও ইম্‌প্রেশন মিলে শব্দের সংগীতময় রিয়্যালিটি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এই সংগীতময় পরমকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে বাক্যে শব্দগুচ্ছের মধ্যে বিশেষ-সামান্যের ছায়ার ও আলোর বিরোধময় চাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেন, এই বিরোধ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়েই তাঁর কবিতা এগোয়; তাঁর ভাষা, তাঁর শব্দ সঙ্কেতময় বলে মিথ্ ও অনুষঙ্গে মিশে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে, তাই দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা অনিবার্য। তাঁর নীলিমা শাশ্বত প্রশান্ত হলেও বিদ্রূপময় (La sereine ironie), তাঁর স্বপ্ন ঠাণ্ডা এবং ঘৃণার সঙ্গে জড়িত (Songe froid de mépris) রাজহাঁস কবিচিত্তের প্রতীক এবং এ জগতের চিহ্ন, তাই শাদা উদ্বেগ (blanche agonie); তাঁর শীত বন্ধ্যা, তার মধ্য থেকেই নির্বেদ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং ব্যাকরণগত বাক্যগঠন অস্বীকৃত ঃ du stérile hiver a resplendi l'ennui. তাঁর অরণ্য ঠিক অরণ্যের ছবি নয়, অরণ্যের ভয়, পাতায় নীরব বজ্র ভেসে যায়। Ses purongles tres haut dediant leur onyx—L' Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore. বিশুদ্ধনখ বোঝা গেল এবং মণিকে খুব উন্নতভাবে সমর্পণ করছে কেন, বোঝা যাচ্ছে না; শুধু এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, পরমই এখানে মণি, বাস্তব জগৎ পেতে চায় নখের আঁচড়ে, পায় না বলেই উদ্বেগ, মধ্য রাত্রির মতো অন্ধকার, উপমা ও উপমেয় মিশে গেলো। এই অন্ধকারই হয়তো সহায়, তাই 'আলোর দিশারী। এমনি ক্রমান্বয়ে অর্থ করা যায়, কিন্তু কতোখানি মালার্মের অভিপ্রেত অর্থে পৌছনো যাবে সেটাই সংশয় : উদ্বেগ এই মধ্যরাত্রির সহায়, আলোর দিশারী, পরস্পর এই শব্দপ্রয়োগ এক্স্‌প্রেশনিস্ট কবিতার কাছে এগিয়ে নিয়ে গেছে বিরোধসংস্থানে।

ইয়েট্‌স্ এই সঙ্কেতই শব্দে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। শেষের যুগে তাঁর কবিতার ব্যক্তিগত ধাঁধা মালার্মের চেয়ে কিছু কম নয়। 'গাছ' 'পাখি' 'গোলাপ' 'তারা' 'কুয়ো' ও 'জাদুর রহস্যে' গুহ্য প্রতীক মালার্মের কবিতার মতোই। ইয়েট্‌সের কবিতায় শেষের যুগে এই সঙ্কেত আরো জটিল হয়েছে 'এ ভিজন' লেখবার পর। বীরের ক্রন্দনের সঙ্গে ট্র্যাজিক বোধ; ট্র্যাজিক বোধেই আনন্দ; তারই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ বিচিত্রতা ও এই জটিলতা সৃষ্টি করেছে; প্রথম যুগ থেকেই ছিলো, শেষের যুগে যেন আরো তীব্র হয়েছে দেহ ও আত্মার বিরোধ, কালের প্রবাহ, প্রবাহের সঙ্গে তৎকালীন ঘটনা ও সমাজের যোগ, ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্ব। গুহ্য ধর্মের সঙ্কেতময় শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিতপূর্ণ : ঘূর্ণি (gyre), মোচার মতো বস্তু (cone), জলের ঘূর্ণি (vortex), ঘনক্ষেত্র (cube), আইরিশ চাষিদের ব্যবহৃত শব্দ টাকু (pern),

লাট্টু বা ডগা (top), প্লেটোর নেমি (spindle), ববিন (bobbin), যাতে সময় সুতোর মতো গুটোয় ও ছেড়ে দেওয়া যায়। এগুলির মধ্যে দুই বিরোধকে মেলাতে চেয়েছেন—চন্দ্র, সূর্য, অন্ধকার-আলো, নারী-পুরুষ, বস্তু-মন, প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক, ভগবান ও ঈশ্বর, কাদা ও রক্ত। চক্রের আবর্তের মধ্যে নারীর দেহের যৌনতা-চক্র-আবর্তনের গতিময়তাও প্রকাশিত। আগের যুগে ছিলো বাতাস পৃথিবী জল ও আগুন গোলাপ, পরে 'মুখোশ' 'বাড়ি' 'গম্বুজ' যুক্ত হয়েছে 'ঘূর্ণি' 'টাকু' 'ববিনের' সঙ্গে। এই শব্দ চিত্রকল্প প্রতীকের মধ্যেই শুধু মালার্মের রীতি অনুসৃত নয়, মালার্মের মতোই বুঝেছিলেন যে ঐশী কল্পনায় অনুভূতি গোটা কবিতায় একটি মাত্র সঙ্কেতে রূপিত হয়। একটি পুরো কবিতা একটি গোটা শব্দ, চিত্রকল্প, ছন্দ-স্পন্দ ও ধ্বনির জটিল সংগঠনে একটি সঙ্কেত হয়ে ওঠে; অনভূতির মতো কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত; এই ঐক্যই পুরো কবিতার একটি সঙ্কেত গড়ে তোলে। এরি কথা বলেছেন বার্নসের দুটি পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে : কিন্তু যখন চাঁদ, ঢেউ, শাদা, অস্তায়মান সময় শেষ বিষাদময় কান্না একসঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে; এই অনুভূতি অন্য রকম রূপ ধ্বনি রঙের সন্নিবেশে জাগতে পারে না। একে আমরা বলতে পারি উপমাময় লেখা, তার চেয়ে বরং বলা যেতে পারে প্রতীকী লেখা।

জীবনানন্দ যখন 'উপমাই কবিতা' বলেন, সেই উচ্চারণ ইয়েট্‌সের অনুসরণেই। পুরো করিতাটিই একটি উপমা, উপমার অনুভূতি, যে অনুভূতি একক, অথচ ভেতরে বহু জটিলতা, কিন্তু এই জটিলতা ও বিচিত্রতার ঐক্যসাধনই জীবনানন্দ সঙ্কেতের মধ্যে দুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের অনেক শব্দ চিত্রকল্প ও প্রতীকের মতো ব্যবহার করেছেন : সাঁঝ, অঘ্রান, হেমন্ত, দিবসের মৃত্যুঘণ্টা, পান্থ, শতাব্দীর শবদেহ, মণিময়, পিরামিড, ঝরা পালক, বোধ, চাষা, শরীরের স্বাদ, আকাশ, উদধি, মেঘ রক্ত, ময়ূখ, পাতাঝরা, বীজ, জলের গন্ধ, পেঁচা, ঘাস, মেঠো চাঁদ, শকুন, ঘাই হরিণী, চিল, নক্ষত্র, অন্ধকার, ধানসিড়ি নদী, ইঁদুর। এই সব শব্দ, চিত্রকল্প ও প্রতীক থেকেই জীবনানন্দের ছন্দ-ধ্বনি-সুরে পুরো কবিতার একটি উপমা উঠে এসেছে, সেই উপমায় অনুভূতি ইয়েট্‌সের মতো এতো ঘন নিবিড় সংহত উজ্জ্বল নয়।

৮

হেমন্তের পাতাঝরার গান ও তার সুরে বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা জীবনানন্দের মতো রিল্‌কেও দেখেছিলেন, যে ঝরায় পৃথিবী ও নক্ষত্র পর্যন্ত তার গতিপথ হারায়। কিন্তু রিল্‌কের ঈশ্বর এই গতিপথকে স্থির রেখেছে, তবে জীবনানন্দে এমন কোনো ধারক শক্তি নেই। যে-আতঙ্কময় স্বজ্ঞায় পৃথিবীর সংবেদনশীল মানষের মধ্যে বিচ্ছেদ, রিল্‌কের কবিতার তার সুস্পষ্ট প্রভাব, জীবনানন্দও এই বিপন্নতা ও আতঙ্কের ভূত দেখেছিলেন, কিন্তু রিল্‌কে এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন স্মৃতির মৌলিক দুঃখে, মৃত্যুর মধ্যে হয়ে ওঠায়, এবং নিজের মধ্যে সমগ্র জগৎকে জয় করে নেবার ও রূপান্তরিত করে নেবার অনিবার্য শক্তিতে। সে বাইরে দেখবে নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখাকে রূপান্তরিত করবে, এবং ভেতরের মানুষ তার নরবধূ, তাই সে প্রকৃতির হাজারো সত্তা জয় করে নেয় (Sie, innerer Mann, Dein inneres Madchen,) এবং রোমান্টিক ও প্রতীকী কবিদের মতো হেজেলের ডালে ও প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যে

প্রতীক চিহ্ন দেখেন, বৃষ্টির মধ্যে নিহিত অর্থ খোঁজেন রিল্‌কে, কেননা এ সকলের মধ্যে ঐশী উদ্‌ভাস, এবং তাই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ও তার উপস্থিত অর্থময়। এই অর্থময় উপস্থিতিকে অনুভবে আনন্দময় ও স্পন্দিত করতে হবে। এই আনন্দময় স্পন্দনের জন্যে চাই বিশুদ্ধভাবে রূপান্তর, তাহলেই দৃশ্য থেকে দৃশ্যাতীতে মিলতে পারা যায়; মৃত্যুও এই জীবনের ও জগতের রূপান্তর; ইউরিদিকে মৃত্যুর পর পূর্ণতায় ভবে উঠেছিলো ফলের মতো মাধুর্যে ও অন্ধকারে; মৃত্যুতে সে এতো নতুন হয়ে উঠেছিলো যে সে কিছুই বুঝতে পারে নি (Wie eine Frucht von Süshigkeit und Dunkel, so war sie voll von iherm groshen Tode, der also new war, dash sie nichts begriff.)

কবির কাজই বস্তুকে যথার্থরূপে দেখা, তাকে ভালোবাসা, এবং রূপান্তরিত করা, তাই প্রশংসা করা ছাড়া তো কবির আর কোনো কাজ নেই। সে প্রশংসা করতে পারে বলেই, সে ভয়ংকর আসুরিক ও মারাত্মক বস্তুকে সইতে পারে, তাদের গ্রহণ করে সে, এবং বস্তুর মধ্যেই অজানা ও নামহীন বস্তুকে আহ্বান জানায় প্রশংসায়। কবি জানে, এই পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু ছদ্মবেশ, এর অন্তরালে সত্য নিহিত : তাই রূপান্তরে নীরব ও প্রচণ্ড বস্তু নক্ষত্রেব ও ঝড়ের মতো হয়ে ওঠে। এই প্রশংসাতেই সব বিরোধ ঐক্যে মিলে যায়। এই প্রশংসার মধ্যেই কবির হৃদয়ের ভালোবাসা জড়িত।

এই মৃত্যুও রূপান্তর : মৃত্যু ও প্রেম রিল্‌কের কাছে সমার্থক; তাই মৃত্যু ও প্রেমই আমাদের গভীর আনন্দ থেকে জাত বলে পথ ও সময়কে স্বাধীন করে দেয়। রিল্‌কের মনে হয়েছে, মৃত্যু ও প্রেম আমাদের হৃদয়ের ওপর লম্বভাবে স্থাপিত। তাই মৃত্যু শেষ নয়, জীবনের সমস্ত কার্যের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে মৃত্যুই এনে দেয়, মৃত্যু হচ্ছে মূল কারণ। যেমন প্লেটোব পরম সমস্ত সৃষ্টির কারণ, তেমনি মৃত্যুই রিল্‌কের কাছে জীবনের উৎস। প্রেম ও মৃত্যু, এই দুয়ের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা, প্রেমে জগৎ ও জগদতীত দুই-ই মিলে যায়, এই মিলনে মৃত্যু এসে রূপান্তর আনে নতুনের, যেখানে অন্ধকার ও মাধুর্য পক্ক ফলের মধ্যে এক হয়ে আছে, তাই এমনিভাবে দেখা ও অদেখা, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত, সময় ও সময়হীন মিশে যায়, শব্দের উচ্চারণে বস্তুজগৎ ধ্বনির সুরে মুহূর্তে মুক্তি পায়।

এই সংগীতই আমাদের মুক্তি দেয়; সংগীতের নিশ্বাসের আলোড়নেই ঈশ্বর ও বাতাস একসঙ্গে মিশে আছে; মৃত্যু ও জীবন এক হয়ে গেছে গানে। পৃথিবীর প্রতিবিম্ব মুছে গেলেও মনের ভেতরে এর চিত্রকল্প জানা যায়। বাইরে-ভেতরে এর চিত্রকল্প আমরা জানি। বাইরে-ভেতরে এই সুরে শাশ্বত ও শান্ত বিরাজমান। তাই অস্তিত্বই গান (Gesang ist Dasein)। বাইরের জগৎ মনের জগতে রূপান্তরিত হয়েই এই সুরময় অস্তিত্ব। এবং বাইরের জগতের স্তব্ধতার পশু, ভূ-স্তরের অজটিল অরণ্য, ধূর্ততা, ভয়, গর্জন, কান্না, অন্ধকারময় নিরাশ্রয় বাসনা—অর্থাৎ সমস্ত বিশৃঙ্খলা সুরে অস্তিত্বময় হয়ে ওঠে, অস্তিত্বময় হয়ে উঠলেই আনন্দ। তাই রিল্‌কের মতে শিল্পের ও জীবনের উৎস ও পরিণাম হলো আনন্দ, বিলাপ ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে আনন্দের উৎসে নিয়ে যায়। এই অস্তিত্বে পৌঁছুলে শৈশব ও ভবিষ্যৎ কোনোটার ক্ষয় নেই, সব মিশে থাকে। বিল্‌কের ইতিহাসবোধও হৃদয়ের উৎসারিত অস্তিত্বের মিলনে।

ইয়েট্‌স্ রিল্‌কের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। ম্যাক্‌নিসের মতো আমিও স্বীকার করি, রিল্‌কের কবিতার সজীব বাস্তবতার জন্যে তার প্রসার ও মহত্ত্ব অনেক বেশি, সূক্ষ্ম জটিল ও আধ্যাত্মিক; গভীরভাবে অতীন্দ্রিয়ময়। মানুষের ও জীবনের দুঃখের হতাশার ও নিরাশ্রয়তার অভিজ্ঞতা রিল্‌কের কবিতাতে আরো বেশি প্রতিফলিত ও পরিণত। এবং এগুলি জানতেন বলেই অন্তরে আধ্যাত্মিক রূপান্তরণ গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। ইয়েট্‌সের অতীন্দ্রিয়তা কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু প্রাপ্ত নয়; রিল্‌কে তাকে পেয়েছেন গভীর অনুভবে, ইয়েট্‌স্ প্রতীকে শুধু ধরতে চাইছেন। এবং রিল্‌কের ব্যক্তিগত দৃষ্টি সুদূর-প্রসারী; তিনি দেখতে-দেখতে ভেতরের লোক হয়ে যান (Innerer Mann), দৃষ্টির ভেতরে তিনি প্রার্থনা করেন (flehend im Grunde des Blicks?) কিন্তু এগুলিই দুজনের মধ্যে মিল এনে দিয়েছে। জীবনানন্দের মধ্যেও এই ব্যক্তিগত দৃষ্টি ও রূপান্তর এই সূত্রেই স্মরণীয়। এঁরা তিনজনেই নিজের সম্পর্কের মধ্যেই জগৎকে দেখেছেন; বাইরের জগৎ মনে হয় অন্য ও অপরিচিত যতোক্ষণ-না ভেতরে এসে রূপান্তরিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, প্রেম ও মৃত্যুর ধারণা ও বোধ তিনজনেরই একরকম। ইয়েট্‌স্ রিল্‌কের মৃত্যুসম্বন্ধে বলেছেন যে, রিল্‌কের কাছে মানুষের মৃত্যু তার সঙ্গেই জন্ম নেয়, মানুষের সত্তা মৃত্যুর সঙ্গে শেষ মিলনে পূর্ণ হয়, যেমন হ্যামলেটের মৃত্যু। ইয়েট্‌স্‌ও বলেন, যখন আমরা প্রকৃত মৃত্যুকে দেখি তখন সকল ইন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্প গলে যায়। এই সঙ্গে মৃত্যুচেতনায় ব্লেকের প্রভাব ইয়েট্‌স্ স্বীকার করেছেন; ব্লেকের মৃত্যুতে দেহ ও আত্মা আলিঙ্গনবদ্ধ। রিল্‌কে মৃত্যুকে শেষ ফলরূপে বর্ণনা করেছেন, এই ফলের মধ্যেই মানুষ ও জগতের বাসা, এই ফলের বৃন্তের মধ্যেই সমস্ত জগৎ ঘোরে, এইখানে অনিত্য ও শাশ্বত মিলে যায়, মিলে গেলেও পূর্ণ ও অনাহত থাকে, এবং জগতের সমস্ত শিল্পীরা এই ফলকে ঘিরে-ঘিরেই পৃথিবীর শিশির নীহারবিন্দু বাতাস, উজ্জ্বলতা দিয়ে তাদের জগৎ সৃষ্টি করে। তাই মৃত্যুর মধ্যেই মানুষের বেঁচে-থাকা, ভালোবাসা, বুদ্ধি ও হৃদয়। এ আমাদের হিন্দুর ব্রহ্মশক্তি। এবং তিনজনেই সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে, আনন্দকেই শেষ কথা বলেছেন, হ্যামলেট ও লিয়রের ট্র্যাজিডির মধ্যেও আনন্দ : বীরের কান্নায় ট্র্যাজিক আনন্দ : Gaiety transfiguring all that dread. তাই কুচুলেইনের কাছ থেকে ভাঁড় ও অন্ধ ব্যক্তি রুটি চুরি করে নিলেও, জীবনের শক্তি হরণ করলেও, কুচুলেইন অদম্য সমুদ্রের সঙ্গে, অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে, যুদ্ধ করে। এই সংগ্রামের শক্তি ট্র্যাজিক বীরের। জীবনানন্দ এই আনন্দ ও মহান আশ্বাস উপলব্ধি করলেও বাঙালি প্রাণের জন্যেই হয়তো ইয়েট্‌সের সংগ্রামময় বীরত্ব গ্রহণ করতে পারেন নি; জীবনানন্দের ক্ষেত্রে অনেকটা রোম্যান্টিক গীতকবির উদ্‌ভাসের মতো; সেখানে রিল্‌কের রূপান্তরই জীবনানন্দে লক্ষণীয় : 'উজ্জ্বল সময়স্রোতে চলে যেতে হয় : বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস এ-ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়, এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।' 'মানুসের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।'

ইয়েট্‌স্ ব্যক্তিহৃদয়ে সব কিছু নিয়ে সব কিছুর ওপর ব্যক্তির অনুভূতির কথাই প্রকাশ করেছেন রোম্যান্টিক ধারায়; এলিঅট ব্যক্তিহৃদয়ে বাইরের জগৎ-ইম্‌প্রেশন নিয়ে

জগতের ছবির মতো তাঁর হৃদয়কে গড়ে তুলেছেন। ব্যক্তিহৃদয় বস্তুতে চাপানো হয় নি, বস্তুজগৎই হৃদয়ে চাপানো বস্তুর রূপে বিবেক-চিত্রিত, কালো রাস্তার বিবেক।

ইয়েট্‌সের কবিকল্পনার সঙ্গে যেমন সাদৃশ্য, তেমনি এলিঅটের অতীন্দ্রিয়বোধও জীবনানন্দে শব্দের প্রতীকে ধ্বনিত: 'দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ/ মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো / যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোনো হরিতের—নব হরিতের / সংগীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা এ জন্মের—' এলিঅটের স্তব্ধতা জীবনানন্দের ক্ষণিকের আলো হয়েছে : in the stillness between two waves of the sea. এবং 'গোলাপ' জীবনানন্দে বৃক্ষ হয়েছে বাঙালির মানসপ্রবণতায়: A condition of complete simplicity (costing no less than everything) And all shall be well and All manner of thing shall be well When the tongues of flame are in-folded Into the crowned knot of fire And the fire and rose are one.

রোম্যাণ্টিকতা থেকে যেমন প্রতীকী কবিতার বিস্তার, তেমনি প্রতীকী কবিতার আরেক রূপ সুররেয়ালিস্ত্ কবিতায়, অর্থাৎ অচেতন বা অবচেতনের নির্বাধ প্রকাশ; কোনো তত্ত্ব, কোনো নিয়ম, কোনো আইন যেন এর প্রকাশে বাধা না হয়। এখন প্রশ্ন, এই অচেতন বা অবচেতনে বস্তুজগতের রূপ কি সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই সৃষ্টি কি যথাযথ রূপে প্যাটার্নের ঐক্যে কবিতায় বা শিল্পে প্রকাশ পায়, না অবচেতনের ছবির নির্বাধ প্রকাশকেই পরাবাস্তব বা সুররেয়ালিস্ত্ হিশেবে গণ্য করে নিতে হবে! ফর্মের দিক থেকে সুররেয়ালিস্ত্ শিল্পকে সমালোচনা করা হয়েছে যথার্থভাবে, কেননা যখনই রূপের বা ফর্মের দিক থেকে এর নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়ে পড়ে, তখনই শব্দের বিন্যাসে বা রেখা ও রঙের বিন্যাসে বুদ্ধির প্রয়োজন, অথচ সুররেয়ালিস্তেরা বুদ্ধিকে একেবারে বাদ দিতে চেয়েছেন। বুদ্ধিকে একেবারে বাদ দেওয়া যে-কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু এই ফর্মের মধ্য দিয়ে অচেতন বা অবচেতন কতোখানি বাধাহীন হয়ে প্রকাশ পেয়েছে কবিতায় বা শিল্পে, সেই বিচারেই বাস্তবতার ঊর্ধ্বে এর পরিচয়।

হোফ্‌মান্‌স্থাল্ রোম্যান্টিকতাপ্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছিলেন; একদা ঝড় হয়ে যাবার পর এমন একটা সময় আসে আমাদের যে-সময়ে তিক্ত, মরা স্বাদের সঙ্গে মিশে যায়; কিন্তু তারা এমন এক ভেতরের স্বাধীনতা লাভ করে, আজকে আমাদের কাছে মনে হয় যেন একপ্রকার মাতাল হওয়া। ভেতরের স্বাধীনতা ও মাতাল হওয়া, এই দুই উপাদান যেমন রোম্যান্টিকদের তেমনি সুররেয়ালিস্ত্দেরও।

এই ভেতরের স্বাধীনতাকে পাওয়াই এদের কাছে কল্পনার উৎসমূলে ফিরে যাওয়া। এটাই এদের নিহিত প্রাণশক্তি, এই প্রাণশক্তির সম্মুখীন হলেই বিস্ময়ের সৌন্দর্য ও জীবনের পুনর্জাগরণ ঘটে সমগ্রভাবে।

যতোদূর সম্ভব এই ভেতরের জগৎকে প্রকাশ করবার আকুলতাতেই শব্দের মুক্ত অনুষঙ্গ আনতে স্বয়ংক্রিয় লেখার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এঁরা। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় লেখায় শিল্পের দাবি—ফর্ম গঠিত হয় না। কিন্তু তবু, অবচেতনের মুক্তিতে স্বপ্নের

জগৎ গীতিকবিতার সুরে চলমান পারসেপ্‌শনের মধ্য দিয়ে রূপময় হয়ে ওঠে। এলুয়ার তাই নারীর স্তনযুগলে বিশুদ্ধ নগ্নতা ও অলংকারের অলংকৃতি দেখেছেন, এবং বিশুদ্ধ নগ্নতায় নিজের হৃদয়কে এক করে দিয়েছেন তিনি। স্তনযুগলে নিজের হৃদয় একাত্ম করে দেওয়ায় ফ্রয়েডীয় 'ইদ্‌' কাজ করছে, এই স্বপ্ন ও ক্রিয়া একসঙ্গে এখানে।

দেজ্‌নো'র একটি কবিতায় আছে : 'আমি তোমাকে স্বপ্নে নিবিড়ভাবে দেখেছি, অনেক হেঁটেছি, অনেক কথা বলেছি দুজনে, আমি তোমাকে এতো ভালোবেসেছি যে তোমার আর কিছুই নেই, ছায়ার মধ্যেও ছায়া হয়ে রয়েছে আমার জন্যে, ছায়ার চেয়েও আরো শতগুণ ছায়া, আরো ছায়া হয়ে থাকবো, ছায়া হয়ে ফিরে আসবো। আবার ফিরে আসবো তোমার সৌর জীবনে।' এ নির্বাধ স্বাধীনতা ছায়া, তাকে পাবার জন্যে ভাষা বাক্যগঠনে নির্বাধরূপ, যতি বা ছেদচিহ্ন কোথাও নেই : Il me rest d'être l'ombre parmi le ombres D'être cent fois plus ombre que l'ombre D'être l'ombre qui Viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée.

জীবনানন্দের কবিতায় পুরোপুরি অবচেতনা ধরা পড়েছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ সময়চেতনার বুদ্ধির আলো তাঁকে গভীরে ডুবে মিশে যেতে বাধা দেয়, খুব গভীর গভীর নদীর জলে শাদা মেঘ—লঘু মেঘ নীচে ডুবে গিয়ে সময়ের শেষে মিশে যেতে পারে না। তবু স্বপ্ন স্মৃতি কামনা-বাসনা আকাঙ্ক্ষা চিত্রকল্পের নির্বাধ যুক্তিহীন পরম্পরা সুররেয়ালিস্ত্‌ অনুষঙ্গ জাগায়, কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় :

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্ত্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।

কার্ত্তিকের জ্যোৎস্নার স্বপ্ন, প্রস্তর যুগের সব স্মৃতি, কিমাকার ডাইনামোয় পৃথিবীর বর্তমান।

১০

ফভ্‌ গোষ্ঠীর গাণিতিক নিয়মের প্রতিবাদে যেমন সুররেয়ালিস্ত্‌দের আবির্ভাব হয়েছিলো ফরাশি দেশে, তেমনি জার্মানিতে ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবির প্রতিক্রিয়ায় একস্‌প্রেশনিস্ট শিল্পের জন্ম। চিত্রকল্প বা বস্তু কোলাজের রীতিতে পরস্পরের সঙ্গে অযৌক্তিকভাবে জড়িত, নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে এই সব বস্তু ও চিত্রকল্পের কোনো যোগ থাকে না। তাই খেয়াল-খুশির বলে মনে হয়, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা আসে, পচা বাঁধাকপি বিবর্ণ সাটিনের সোফায় পড়ে থাকে পাউণ্ডের ভাষায়। চিত্রকল্পগুলি অযৌক্তিক ও বিসদৃশ হলেও পরপর বসাবার ফলে সব মিলে একটা গতিময়তা নিয়ে আসে, যে-গতিময়তা ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবির মধ্যে ছিলো না, হয়তো পাউণ্ডের ভর্টিসিজ্‌ম্‌ থেকেই এর উৎস। এই চিত্রকল্পের সঙ্গে কোনো বক্তব্য বা বর্ণনা থাকা অবাঞ্ছনীয়।

সুররেয়ালিস্ত্‌দের সঙ্গে একস্‌প্রেশনিস্টদের মিল আছে, অনুচ্চার্য বিশুদ্ধতা যা অবচেতনের গভীরে লুকিয়ে আছে, তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা দুজনেরই, সুররেয়ালিস্ত্‌রা হয়তো এখান থেকেই উৎস পেয়েছিলেন।

ভ্যান্‌গখের চিঠিতে একস্‌প্রেশনিস্ট ছবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, এবং এই বৈশিষ্ট্য

কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : 'যা আছে আমার চোখের সামনে তাকে যথাযথ ফটিয়ে তোলবার পরিবর্তে আমি নিজেকে প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ করবার জন্যে অধিক খেয়ালখুশি মতো রঙের ব্যবহার করি। ... চুলের সৌন্দর্য আমি অতিরঞ্জিত করি, এই চুল আঁকতে আমি এমন কি কমলালেবুর রঙের টোন বর্ণালী এবং বিবর্ণ লেবুর হলুদ ব্যবহার করি।'

রঙের এই অযৌক্তিকতায় মনের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কবিতাতেও তাই বাক্যগঠন ভেঙে যায়, চিত্রকল্প খেয়ালখুশিমতো ব্যবহৃত এবং চিন্তা ও ক্রিয়ার সমন্বয় থাকে না, যতি ও ছেদ যথাযথ নয়, কখনো বসেই না। বিশেষণ বা বিশেষ্য থেকে ক্রিয়ার রূপ, পঙ্‌ক্তি যে-কোনো জায়গায় ভাঙে। বাক্যে শব্দে চিত্রকল্পে যতি-ছেদেভাঙার মধ্য দিয়েই রূপের প্রকাশ ঘটে, রূপের এই প্রকাশে মনের গহনতম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত। এই ভাঙার রূপে নিয়মিত ছন্দ ও মিল থাকে না; তাই গদ্যের ছন্দস্পন্দ এর মধ্যে ধ্বনির স্বনন জাগিয়ে তোলে গোপনে।

সররেয়ালিস্ত্‌দের সঙ্গে একস্‌প্রেশনিস্টদের প্রভেদ হলো অনভূতির প্রকাশে কির্কেগার্দ মানুষের মনের মধ্যে যে ভীষণতা বা 'ড্রেড' দেখেছিলেন, যে-ভীষণতা থেকে আত্মবিচ্ছেদ ও নৈরাশ্য ও হাতাশা জাগে, সেই নৈরাশ্যের রূপই বিশেষ করে একস্‌প্রেশনিস্ট ছবি ও কবিতায় প্রকাশিত। সুররেয়ালিস্ত্‌দের মধ্যে এই অভাবাত্মক ও নৈরাশ্যের অনভবের বদলে স্বপ্নে ও স্মৃতিতে পূর্ণভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষার রঙ নানাভাবে ছড়িয়ে আছে, তাতে আনন্দ জাগে : আর একস্‌প্রেশনিস্ট ছবির ও কবিতার মধ্যে আনন্দের বদলে জাগে ভয় ও নৈরাশ্যের বিস্ময়ের গহ্বর :

'পাথরও বিমুখ, জানালা বিশ্বাসঘাতকতাকে মুখ ভ্যাঙ্‌চায়, বৃক্ষশাখা কণ্ঠরুদ্ধ করছে, পাহাড়ের ঝোপ হিসিয়ে ধ্বনি তলছে, নকল চিৎকারী মৃতকে জাগাচ্ছে। পৃথিবীর মৃত্যুর সামনে স্বপ্ন জাগছে।' 'পঙ্গু গাছেরা হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে, রুপোলি মুখোশ থেকে পাপের আত্মা উঁকি মারে।' 'বরফের মতো আক্ষেপে সদ্যোজাত মৃত শিশু বেশ্যা জন্ম দেয়। ভগবানের ক্রোধ মানুষের ভ্রূ'কে আঘাত করে, সবুজ চোখ ভেঙে দিচ্ছে ক্ষুধা, স্বপ্নের ভীষণ রাত্রি থেকে সোনার বীভৎস হাসি।'

যুদ্ধ-দীর্ণ জার্মানির সমাজবাস্তবতাই এই সব কবিতার চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্পের এই কোলাজরীতি অনেক জায়গায়ই দেখা যায়, নৈরাশ্যের ভীষণতা ও ভয় 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় ব্যক্ত : 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।' 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে ; আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;' 'তাহলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময় জন্ম নিতো; সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে আমারও নিবিড় সন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।' এই বিদীর্ণ বিস্ময় ও স্নায়ুর আঁধার একদিকে যেমন অযৌক্তিক চেতনার প্রকাশ, অন্য দিকে নৈরাশ্যের ও ভীষণতার। 'একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—তাহলে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।'—বলে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।'

১১

ইয়েট্‌স্‌ও কির্কেগার্দের 'ড্রেড' বা ভীষণকে অনুভব করেছিলেন শেষের যুগের

কবিতায়; তবে সেই ভীষণতাকে তিনি আনন্দে ঢেকে বা রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন : Gaiety transfiguring all that dread. 'সার্কাসের জন্তুর নির্বাসনে' কবিতার শেষে তিনি যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তা একদিকে তাঁর শিল্পকর্মের প্রক্রিয়াকে যেমন প্রকাশ করছে, নোংরা আবর্জনার স্তূপ, রাস্তার ঝাঁট, পুরনো কেতলি, বোতল, ভাঙা ক্যান, পুরনো লোহা, হাড়, কাপড়ের টুকরো, ক্ষিপ্ত বেশ্যা, সিঁড়ির এক প্রান্তে এই সব ছবি; এই সব ছবি থেকেই সিঁড়ির অন্য প্রান্তে সংহত ঐক্যে দক্ষ চিত্রকল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু তারপরেই কবি বলেছেন সেই সিঁড়ি আর নেই, সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে না আর, তাই তিনি সিঁড়ির নীচে শুয়ে আছেন। হৃদয়ের নোংরা ন্যাতা ও হাড়ের দোকানে পড়ে আছেন। (In the foul rag-and-bone shop of the heart) এই বর্ণনা অস্তিত্ববাদী শিল্পীদের নোংরা পরিবেশের, যা থেকে চেতনার বিবমিষা জাগে। 'মানুষ ও প্রতিধ্বনি' কবিতার অন্তিমেও এই বোধ : বিরাট রাত্রিতে—মৃত্যুতে আনন্দ, উদ্‌ভাসময় কণ্ঠস্বরে যেন তার এই আনন্দ বা রাত্রি স্বপ্ন ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। আর সেই সময়েই বাজপাখি বা প্যাঁচা আঘাত করছে, পাহাড় বা আকাশ থেকে নীচে নামছে, এবং আঘাত-খাওয়া খরগোশ চিৎকার করছে, তার চিৎকারে কবির চিন্তা বিভ্রান্ত। এই খরগোশ যেন সৃষ্টির বিন্দুর বিষে নিষ্পেষিত মনুষ্যতা, নিষ্ঠুরতা ও ক্রূরতায় পীড়িত, এই পীড়নে মৃত্যুর শান্ত চেতনায় চিড় ধরে গেছে। এই কবিতায় ছবি যেন জীবনানন্দের এই মর্মান্তিক ছবিকে মনে পড়িয়ে দেয় : 'থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে / চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে? / চমৎকার! / ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—' এই বিচ্ছিন্নতাই মানুষের মনে ভীষণতা জাগায় যখন সে এ-জগতে ইয়েট্‌সের মতো পরস্পরের সম্মুখীন হয়।

এই উদ্বেগ ভীষণতা কির্কেগার্দ অনুভব করেছিলেন। সত্তা সত্তাহীনতার ভয়ে উদ্বিগ্নতায় পীড়িত হয়ে নিজের প্রকৃত সত্তা-সম্বন্ধে সচেতন হয়। বিশ্লেষণ করে কির্কেগার্দ এর স্বরূপ দেখিয়েছেন সুন্দরভাবে : এ মারাত্মক উদ্বেগ ভীষণতা, উদ্বেগময় বিবেক, এতে এই অনুভব আসে, কেউ যেন প্রতিহিংসা নিচ্ছে; এবং তা থেকে শূন্যতার বোধ জাগে। ভয় বাইরের, কিন্তু 'ভীষণতা' বা 'ড্রেড' অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেয়। মানুষ যখন নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তখন তার নিবিড় অনুভব ভীষণতার সৃষ্টি করে, এই অনুভবে বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ অতিপ্রাকৃত ও হতবাক বিভ্রান্তি আনে, মানুষ ও তার চারদিকের জগৎ উদাসীনতায় ডুবে যাচ্ছে।

এই ভীষণতার সঙ্গে আত্মবিচ্ছেদ গড়ে ওঠে, ভালেরি তাঁর 'সমুদ্রতীরের কবর' কবিতায় এর রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সমুদ্রে অদৃশ্য ফেনায় তিনি দেখেছিলেন হীরা, এই হীরাকে গ্রাস করে দ্রুত বিদ্যুতের বিশুদ্ধ শ্রম। বিশুদ্ধ উজ্জ্বল এই জগতের মধ্যেই যখন সূর্য ধরণীগর্ভে শান্ত হয়—শাশ্বত কারণের বিশুদ্ধ সৃষ্টি মনে হয়, সময় স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠে এবং স্বপ্নই জ্ঞান। মালার্মের থেকে পৃথক্ তিনি এখানেই। তাঁর সময়চেতনার তিনটি কাল একটি মাত্র দীর্ঘনিশ্বাসে সুসংহত। তাই শাশ্বতের মধ্যে শান্ত উজ্জ্বলতায় সকলের উর্ধ্বে সার্বভৌম ঘৃণা রোপিত হয়। এই সার্বভৌম ঘৃণা কালের। আস্বাদনে ফল যেমন গলে যায়, মুখের মধ্যে তার রূপ হারায়, অনুপস্থিতির পরিবর্তন আনন্দে মিশে যায়, কালও ঠিক এমনি। বিশুদ্ধকেই তিনি ফিরিয়ে দিতে চাইছেন আদি

আশ্রয়ে। ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ছায়ার বিষণ্ণ আচ্ছেককে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে তাঁর চৈতন্যের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য। বিশুদ্ধ ও শূন্যতার মাঝখানে এই আত্মা, সে প্রতীক্ষা করে তার ভেতরের বিরাট প্রতিধ্বনি, অন্ধকার তিক্ত ধ্বনিময় কুয়ো : আত্মার মধ্যে শূন্যতা ধ্বনিত হয়ে ওঠে; এই শূন্যতা নিহিত আছে সর্বদা ভবিষ্যতে। (Sonnant dans I'âme un creux toujours futur!') মানষের আত্মার মধ্যে বিশুদ্ধ ও পার্থিব এই জগৎই আছে, তাই এই আত্মা বা অস্তিত্ব ছিদ্রময়। পবিত্র অধৈর্যও মরে যায় (Ma présencc est poreuse, La saint impatience meurt aussi!') এই বিরোধকে জেনোর তীরের রূপকল্পে ও অনষঙ্গে চিত্রিত করেছেন তীব্র আবেগে : ‘জেনো! নিষ্ঠুর জেনো! এলিয়ার জেনো! তুমি সপক্ষ তীরে আমাকে বিদ্ধ করেছো।’ এই তীর নড়ছে, উড়ে যাচ্ছে এবং নড়ছে না। কালের দুটো অংশ টুক্‌রো মুহূর্ত, টুক্‌রো না করলে সমগ্র বর্তমান, এই সমগ্র-বর্তমান ভাঙে না, চলে না, খণ্ডিত বর্তমান অসংখ্য মুহূর্তে ভাঙে, এই অসংখ্য মুহূর্তের মধ্য দিয়েই তীর চলে, কিন্তু তীরের মধ্যে যে-সমগ্র হয়ে আছে, সে চলে না। এই বিরোধ ও বিচ্ছেদই আত্মার ভেতরে ভালেরি লক্ষ করেছিলেন মালার্মের থেকে সরে এসে।

কাফ্‌কা ফ্যান্টাসির ঘুমের স্বপ্নের অতলে এক্সপ্রেশনিস্টদের মতো আত্মার বিপন্ন অবস্থা বারবার দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে উপন্যাসে ডায়েরিতে চিঠিতে। চারদিকে মানুষের অবিচার, অদৃশ্য ভয়, আতঙ্ক, নিষ্ঠুরতা ; মানুষকে অসহায়তায় বন্দী করে তুলেছে সে, শাস্তি পাচ্ছে অন্যায়ভাবে, শাস্তির কারণ সে জানে না, এই শাস্তি মানুষকে অবমানব করে তুলছে নিয়ত, নতুবা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সে সর্বদা নিষ্ঠুরতার, হিংসার ক্রূরতার সম্মুখীন হয়ে আতঙ্কিত হচ্ছে অসহায়ভাবে। ডায়েরিতে এক জায়গায় আছে: *স্বপ্নে কাফ্‌কা দেখছেন দুটো দল পরস্পরে মারামারি করছে। তিনি যে-দলে সেই দলের* লোকেরা একটা বিরাট নগ্ন মানুষকে চেপে ধরেছে, কেউ তার মাথা, কেউ তার পা, কেউ তার বাহু। তাদের কারো কাছে ছুরি ছিলো না বলে বিদ্ধ করতে পারে না, তাই জ্বলন্ত উনোনের কাছে নিয়ে গেলো, একটা পা উনোনে ধরলো ধোঁয়া ওঠা পর্যন্ত, ধোঁয়া না-থামা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলো, তারপর দরজার কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। জেগে-ওঠা পর্যন্ত এই কাজই একঘেয়েমির মতো করছিলো। এ যেমন স্বপ্নে, তেমনি বাস্তবেও ; এক আগন্তুক দেখে গুদামবাড়ির সামনে দুটি বালকবালিকা, হ্যান্‌স্‌ ও আমালিয়া; দীর্ঘদিন গুদামবাড়িতে বাস করে, অথচ তাদের দেখা যায় নি। আমালিয়াকে ভেতরে যেতে বলে আগন্তুক, কিন্তু হ্যান্‌স্‌কে নয়। আমালিয়ার অনুরোধে হ্যান্‌স্‌কে ভেতরে টেনে নেয় হিঁচড়ে, হ্যান্‌সের গা ছড়ে গিয়ে রক্তাক্ত, যে-পিতার কাছ থেকে মুক্ত হবার জন্যে উল্লসিত, সেই পিতাকেই উদ্ধারের জন্যে চিৎকার করে ডাকে। আগন্তুকের আক্রমণে আমালিয়া পরো অপ্রতিভ, তা ছাড়া ভেতরে একটা তার অপরাধের বোধ; কেননা, কিছুটা সেই-ই অন্যায়কে প্ররোচিত করেছে, কিন্তু ভেবে দেখলে এটা খুব কৌতূহলী মনে হলো, আমালিয়া প্রথম থেকেই পালিয়ে যায় নি। হ্যান্‌সের পায়ের সঙ্গে লেগেছিলো, দেখছিলো। আগন্তুকের হঠাৎ আক্রমণ, আক্রমণে অপ্রতিভ হয়ে-থাকা, অপরাধবোধ, নিজের মধ্যে অন্যায় অনভব করা, এবং অসহায়ভাবে এই অন্যায় অবিচারকে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখা কাফ্‌কার সাহিত্যের নির্যাস।

'গাঁয়ের ডাক্তার' গল্পের এই অসুস্থ ছেলেটিকে ভোলা যায় না, যে-ডাক্তারের গলা জড়িয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে : ডাক্তার আমাকে মরতে দাও। কিন্তু ডাক্তার ছেলেটির পাছার কাছে একটা খোলা বড়ো ক্ষতমুখ দেখতে পেলো; ক্ষতটা গোলাপি লাল, বহু তার স্তর, ভেতরে অন্ধকার, ধারে হাল্‌কা, নরম শস্যের মতো, কোথাও রক্তের চাপ বাঁধা। আরো একটু খুঁতিয়ে দেখতে গিয়ে সে দেখতে পায়, ছোট আঙুলের মতো পোকাগুলো লম্বা ও ঘন, এবং গোলাপি লাল রক্তের দাগ তাদের গায়ে, ক্ষতের গভীরে আলোর দিকে মুচড়ে-মুচড়ে চলছে, তাদের ছোট শাদা মাথা ও অনেক ছোট পা। এই ক্ষত যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপের যুগের ও সমাজের। এখানেও চিকিৎসা করতে এসে ডাক্তার হিংসার সম্মুখীন হয়ে জামাকাপড় খুলে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। এবং আগন্তুক সহিসের কাছ থেকে শীতের ঝড়ো রাত্রে ঘোড়া নিয়ে গেছে; তার দাসী বাধ্য হয়েছে তার কাছে ছেড়ে আসতে। ফেলিস্‌কে লেখা চিঠিতে উনিশ'শ তেরোতে কাফ্‌কা বলেছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণ মানব ও প্রাণিজগৎকে জানতে চান, চিনতে চান তাদের মৌল বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক আদর্শ, এমন একটি সর্বজনীন সত্য নিয়ে আসবে, যা সকলের কাছে আনন্দ বলে মনে হবে, এবং কাফ্‌কার নীচতা থেকে মুক্তি দেবে, মানবের ভালোবাসা বর্জিত হবে না, এবং মানবিক ন্যায়ই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। এগুলি দেখতে পাননি বলেই তাঁর উল্টো দিক লেখায় প্রকাশিত। এ সত্য অনস্বীকার্য : প্রেমই তাঁর ন্যায়পীঠ।

সার্ত্রের নায়ক আঁতোয়ানের ভাষায় দেখি মুখের সঙ্গে স্বরের কোনো যোগ নেই। এ জীবন ট্যাজিক নয়, এ ভয়ংকর, ভীষণ। শুষ্ক হতাশা প্রকাশ করে, অশ্রুহীন করুণাহীন। প্রেমের মধ্যে, নারীর মধ্যে এ-নায়ক দেখতে পেয়েছিলো অচিকিৎস্যরূপে কিছু শুকনো। ভীষণতার উপলব্ধি সত্তার মধ্যে শূন্যতা নিয়ে আসে, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিচ্ছেদ ঘটায়, এই বিচ্ছেদ সত্তার মধ্যেও। তাই মূল্যবোধের কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এই শূন্যতাই মানুষকে নির্বাচন করতে বাধ্য করে, এই নির্বাচনের মধ্যেই তার স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতাই তার বেঁচে থাকবার সার্থকতা।

এই অ্যাবসার্ড জগতে বাস করে সচেতন মানষ আবিষ্কার করে যে, তার সচেতনতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য; পরিবেশ তার অন্তরায়, ছড়িয়ে-পড়া বিশৃঙ্খলাই যেখানে নিয়ম, সেই স্বচ্ছ বুদ্ধি নিয়ে কীভাবে বাস করা যায়! আধুনিক মন, তাই কামুর কাছে মনে হয়েছে, সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। জ্ঞান এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে সেখানে জগৎ অথবা বুদ্ধির কোনো ভিত্তিভূমি নেই। নৈরাজ্যবাদ বা শূন্যতা থেকে একালের মানুষ ভুগছে। তাই নির্বাসনের জ্ঞানসম্বন্ধে মানুষকে অবহিত হতে হবে; যে-জ্ঞান জগৎকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, সেই জ্ঞানের সচেতনতায় আইডিয়াকে ফিরে পেলে বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে যাবে, সমগ্র সভ্যতাকে নতুন করে সৃষ্টি করা যাবে। তাই তাঁর বিশ্বের গোপন সত্য হলো: মানবিক অনশ্বরতাহীন হয়ে ঈশ্বরের কল্পনা করা। অর্থাৎ এ-জগতের ঈশ্বর।

১২

কির্কেগার্দ বলেছিলেন যে-সত্তা প্রকৃত আছে, সেই সত্তায় হওয়াই মানুষের সাধনা।

কারণ আমরা সেই সত্তাকে হারিয়েছি টুক্‌রো টুক্‌রো করে। মার্কস্‌ও প্রায় একই সুরে কথা বলেন; মানুষের সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন তার নিজের কাছে, এটাই হলো মানবিক সারাৎসার। এই মানুষ সামাজিক সত্তা; এবং এই প্রত্যাবর্তন সচেতন ও পূর্ণ হবে পূর্বের বিকাশের সমগ্র ঐশ্বর্যের সঙ্গে। মার্কস্‌ও দেখেছিলেন, উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণ করে বুর্জোয়ারা মানুষের সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এই সমাজে, তাই শ্রমের মানুষের ও তার সারাৎসারের কোনো যোগ নেই। তার কর্মে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, এতে সে নিজেকে আলাদা করে। সে অনুভব করে সে অসন্তুষ্ট ও অসুখী। ইচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে সে কাজ করে না, তাকে জোর করে কাজ করানো হয়। এ তার পক্ষে জবরদস্তি শ্রম, প্রয়োজন মেটায় এ-শ্রম, বাইরের চাহিদা মেটাবার উপায় এটা। তাই এই বাইরের শ্রম তার ওপর চাপানো হয়েছে। এর ফলে শ্রম তার কাছে জান্তব ক্রিয়ার মতো মনে হয়; যেমন খাবার খাওয়া, পানীয় নেওয়া, মৈথুন। মানবিক জীবনে সে মনে করে জন্তু। জন্তুই মানুষ হয়েছে। মানুষই জন্তু হয়েছে, বিচ্ছিন্ন শ্রম মানষের মানবিক সত্তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতি ও মানুষের বুদ্ধির ঐশ্বর্য মনে হয় বিদেশি। এই শ্রম মানুষের কাছ থেকে তার শরীরকে আলাদা করেছে, মানবিক স্বভাব থেকে তাকে আলাদা করেছে। অর্থাৎ মানুষ যখন তার শ্রমের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সে জীবনের ক্রিয়া-কর্ম থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়, মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, মানষে মানষে বিচ্ছিন্নতা জমে। এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করবার জন্যেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঊর্ধ্বায়ন চেয়েছিলেন মার্কস্‌, এই ঊর্ধ্বায়নই মানবিক সারাৎসারের তাৎপর্য। মানুষের শ্রম মানুষের সৃষ্টিরই বিশ্বইতিহাস সমাজতন্ত্রী মানুষের কাছে, তাহলেই মানষের প্রকৃতি বেরিয়ে আসবে নিজের স্বভাবে। এই আত্মসৃষ্টি ও নিজের আদি-উৎসে ফিরে-যাওয়া শ্রমের সাহায্যে—এ-দুটোর দিকেই মার্কস্‌ জোর দিয়ে বলেছিলেন . দার্শনিকেরা আগে জগতের অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমাদের কাজ হলো জগৎকে পাল্টে দেওয়া। অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা মানুষের বিচ্ছিন্ন সত্তাকে ও জান্তব অবস্থাকে মানুষের সত্তার সমগ্রতায় ফিরিয়ে আনবার জন্যেই তাঁর সমগ্র জীবনে সংগ্রাম—এই মানবিকতা অতলনীয়। কিন্তু মার্কসের আপ্তবাক্যকে মেনে নিয়েছে মার্কসীয় সাহিত্য; তাই সমাজের যুগের ইতিহাসের এই জটিল উৎপাদন ও শাসনব্যবস্থায় মানুষের পরিবেশের ও সত্তার দ্বন্দ্ব ও ক্ষতময় সংগ্রামের চিত্র দেখাতে পারে না বলেই এই সাহিত্য অতি-সহজ তরল আশাবাদের হাস্যকর রূপ হয়ে ওঠে। ভাষায় রূপকল্পে ছন্দে মিথে অনুষঙ্গে সুরে বিষ্ণু দে অনেক ক্রিয়াকৌশল দেখালেও এই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাবে অতি সরলীকৃত সেন্টিমেন্টাল আশাবাদের ভাবোচ্ছ্বাসময় কবিতার জন্ম দিয়েছেন বলে মনে হয়। শঙ্খ ঘোষের কবিতাসম্বন্ধেও সেই একই অনভব আমাকে পীড়িত করে। সভাষ মখোপাধ্যায়ের বিশ্বাসটা পুরো কৃত্রিম ও নকল। সুতরাং কবিতাতেও সেই কৃত্রিমতা ধরা পড়ে কথ্যশব্দের দড়িতে-লাফানো কেরামতিতে। বিশ্বাসের বিচারের মধ্যে চিত্তের যে-সংগ্রাম, দুঃখভোগ, কষ্ট ও ট্র্যাজিডি, সেই সংগ্রামের কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না, কি এ-দেশে, কি বিদেশে। এবং তৃতীয় বিশ্বের মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে ছলনা ও চাতুরি এই সাহিত্যকে আরো কলঙ্কিত করেছে। স্পেনীয় জাতীয় বোধের সঙ্গে বাঙালির গীতিকবিসুলভ উচ্ছ্বাসের ও

আবেগের একটা সাদৃশ্য আছে। 'ইগ্‌নাসিও'র জন্যে বিলাপ' কবিতায় লোর্‌কা শব্দের সৌন্দর্যে সেই গানই গেয়েছেন, যে-শব্দ বিলাপ করে; তিনি স্মরণ করেছেন অলিভগাছের মধ্য দিয়ে বিষণ্ণ বাতাসকে। ব্যালাড-জাতীয় কাহিনীকবিতায় এই বোধ অনেক উর্ধ্বে নিয়ে যায়; কিন্তু এই সকল কবিতাতেও তিনি যখন পাথরকে প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করেন, তখন জীবনের সমগ্র জটিলতা দানা বাঁধে : পাথরই হলো কপাল, যেখানে স্বপ্ন বিলাপ করে, যেখানে কোনো জলধারা খোদিত হয় নি, তুষারীভূত সাইপ্রাস নেই, গ্রহ এবং রিবন ও চোখের জলের এই গাছ নিয়ে সময় বয়ে নেবার জন্যে পাথরই হলো কাঁধ। এই পাথর মৃত্যুর প্রতীক, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে সমগ্র জীবন প্রকৃতি সময় ও বিশ্ববিধৃত। অনুভবের রঙিন বিচিত্রতা ও কল্পনায় নেরুদা ভাসিয়ে না নিলেও জীবনের কষ্টের নোংরা অভিজ্ঞতার জটিলতা তাঁকে সংগ্রামে সাহস জুগিয়েছে : 'আমাদের বুকের খাদে আমরা সকলে এক হয়ে আছি। বাঘের গ্রীষ্ম আমরা পেরিয়ে যাই আমাদের হৃদয়ের জমিতে। ঠাণ্ডা চামড়ার দৈর্ঘ্যের জন্যে আমরা অপেক্ষায় শুয়ে আছি, অস্পর্শনীয় রঙের রুপো, মুখে ঘামের নিশ্বাস নিয়ে, সবুজ শিরায় আমরা আর্দ্র ছায়ার চুম্বনের বৃষ্টিতে মিলিত হই।' তাঁর কাব্যাদর্শের মধ্যেও এই জটিলতা, যেখানে ছায়া ও স্নানের মধ্যে তরুণী ও নগররক্ষায় সৈন্য, অদ্ভুত হৃদয় নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বপ্নে ভারি বোঝা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যায়, হারানো জীবনের প্রতিটি দিনের জন্যে বিধবার শোকের রাগে কবির কপাল বিবর্ণ, হতবুদ্ধি অবস্থায় প্রতিটি অদৃশ্য ফোঁটা তিনি পান করেন এবং প্রতিটি ধ্বনির জন্যে তিনি আশ্রয় নেন, কাঁপেন, একই রকম সেই তীব্র তৃষ্ণা লালন করেন, সেই ঠাণ্ডা জ্বর, শ্রমে শব্দ, ঘোরানো উদ্বেগ, যেন চোরেরা বা প্রবাহ আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, নেরুদাও এই ঘোরানো বা বাঁকা উদ্বেগের অনুভবে অশান্ত হয়েছিলেন (una angustia indirecta)। এই বিচিত্র জটিল অনুভূতির বাংলাকবিতায় প্রকাশ নেই। আমার নিজের মনে হয়, মার্কসীয় বিশ্বাসের সেই নিবিড়তা তথাকথিত কম্যুনিস্ট কবিদের মধ্যে অনুপস্থিত। নেরুদা ভাবতে পারতেন, অপমানিত চাকর, একটা ভাঙা ঘন্টা, নোংরা ঝাপসা আয়না, পরিত্যক্ত বাড়ির ভ্যাপসা গন্ধ, যে-বাড়িতে অতিথিরা রাত্রে আসে, যে-রাত্রি কাদা-মাখানো নরকবাসে পরিণত হয়; মেঝেয় ছড়ানো কাপড়ের দুর্গন্ধ, এরি মধ্যে ফুলের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগে, অন্য উপায়ে ও ভাষায় বলা যেতে পারে : একটি স্পর্শ, বিষণ্ণতায় একটু কম। এমনিভাবে কঠোর সত্যকে তিনি অনুভব করেছেন, যেখানে বাতাস কবির বুকে আঘাত করে, কবির শয্যাগৃহে রাত্রির অসীম বিস্তার মূর্ছা যায়, এর মধ্য দিয়েই ত্যাগের মহিমায় সকালের গুজব অগ্নিময় হয়ে ওঠে: শোক ও বস্তুর বিরাট পরাজয়ের মধ্য দিয়েই উত্তরবিহীন আহ্লাদ আসে; যুদ্ধ বিরতিহীন, যাত্রা, কিন্তু এই যাত্রা বা গতির নাম কী তিনি উচ্চারণ করতে পারছেন না। সমস্ত কবিতাটি একটি বাক্যে রচিত, মালার্মের 'আত্মায় সমস্ত সংহত' (Toute l'âme résumée) কবিতার মতো। আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট ছুঁৎমার্গীরা মালার্মের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে।

১৩

আধুনিক কবিতা ভয় ক্লান্তি গৌরবের অনুভবে জটিল ও বিচিত্র, এই জটিল

বিচিত্রতার মধ্যে মোটামুটি একটি সর্বজনীন ধারণা লক্ষ করা যায়, পিকাসোর ছবির মধ্যে যা সুস্পষ্ট : 'আত্মচৈতন্যে ভীতিপ্রদ প্রগতি'। জগতের অ্যাব্‌সার্ড পরিবেশের ভয়ংকরতা চৈতন্যের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে, এই অ্যাব্‌সার্ড পরিবেশ উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণজাত শ্রম থেকেও আসতে পারে এবং চৈতন্যের মধ্যে ভয়ের আতঙ্ক উদ্বেগ একটা শূন্যতা নিয়ে আসে, এই শূন্যতাই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে চৈতন্যের গভীরে, এই বিচ্ছিন্নতায় তিনটি কালই বিচ্ছিন্ন। তাই উদ্বেগ-জনিত ভয় ও বিচ্ছিন্নতা যে-কোনো সৎ আধুনিক কবির লেখায় প্রতিফলিত। অনুভূত বিশ্বাসানুযায়ী কেউ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাসের পথে, কালের চেতনায় নিরন্তর গতি ও মক্তির দিকে এগোয়, কেউ সর্বজনীন প্রেমের আনন্দ স্বীকার করেও অন্তরে নৃশংস নীচতায় পীড়িত হয়, এবং সুখের মধ্যে অসুখ বা অসুখের মধ্যে সুখ দেখে, যেমন কাফ্‌কা। তবে সকলেই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ জানায় নিজস্ব ভঙ্গিতে, যেমন বোদ্‌লোয়ার জানিয়েছেন তীব্রভাবে। বোদ্‌লেয়ারের মধ্যেই চৈতন্যে উদ্বেগের আতঙ্ক ভয় প্রথম দেখা দিয়েছিলো, (une oasis d'horreur dans un desert d'ennui!); তাই তিনি আধুনিকতার পথিকৃৎ। উদ্বেগের আতঙ্কের সঙ্গে অভূতপূর্ব আধনিক বাস্তব পরিবেশসম্বন্ধে সচেতনতাকে আধুনিক কালের কথ্যভাষায় ছন্দস্পন্দের সংগীতে প্রকাশ করবার মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্টতা। অনভবের সচেতনতায় আধনিকতা: সেই সঙ্গে প্রকাশের আধুনিকতা যখন মেলে, তখনই কবির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়; জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দুজনেই আধুনিকতার সচেতনতা দেখিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশের আধুনিকতার সচেতনতা জীবনানন্দেই সুস্পষ্ট।

জীবনানন্দের কবিতার ক্রমপরিণাম

যে-কোনো সৎ কবিই কম বেশি পরিণামের দিকে এগোন সময় ও যগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে, অভিজ্ঞতার প্রসারে। এক নির্বোধই পারে নস্টাল্‌জিয়া ও সেন্টিমেন্টাল সোনালি স্বপ্নে মজে থাকতে, বয়েস পঞ্চাশের পরেও; জগৎ ও জীবনসম্বন্ধে চোখ বুজে থেকে আকাশের স্বপ্নে মগ্ন থাকা অন্ধেরই সমান, যেমন মরিস্। তবে অন্ধের জগৎ সাহিত্যের নয়। কিন্তু জন্মান্ধ কবিরা দাপিয়ে বেড়ায় হয়তো অন্ধ বলেই।

দ্বিতীয়ত, প্রথম যুগের কবিতা বা রচনার মধ্যেই বিশেষ কবির কাব্যের বীজ নিহিত থাকে, পরে তারই বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এই বীজের মধ্যেই অঙ্কুরের সম্ভাবনা, ফুলের ও ফলের প্রত্যাশা, সুতরাং কবির ব্যক্তিত্ব প্রথম যুগের কবিতাতেই লুকোনো থাকে ইঙ্গিতে। শুধ তাই নয়, এই গড়ে-ওঠার মুহূর্তে পরিবেশ ও পরিপার্শ্বের চাপ ও উপাদান কীভাবে মিলিয়ে নেয় একজন কবি, সেই অদৃশ্য ইতিহাস প্রথম যুগে কবির ব্যবহৃত ভাষায় ধরা পড়ে, তারপর সে সংগ্রাম করে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে হয়ে-ওঠার জন্যে, সম্প্রসারিত ও বিস্তারের জন্যে, যদিও প্রথম যুগের কবিতায় পরিপূর্ণ শিল্পমূর্তির সৌন্দর্য ধরা পড়ে না কখনোই, কিন্তু সৌন্দর্যের উপাদানগুলির, উপমা-চিত্রকল্প-ধ্বনি-ছন্দ-প্রতীক-সংগীতের সঙ্গে ভাষার ব্যবহারের বিশিষ্টতা—কোনো-না-কোনো প্রকারে ছায়া ফেলে।

জীবনানন্দের 'পিরামিড' কবিতায় পিরামিড নামটির মধ্যেই, কবির বিশিষ্ট জীবনবোধ, যা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক্— প্রতীকিত হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে নীল নদীর পশ্চিমে পিরামিড, পিরামিডের ভেতরে রাজা ও রানীর মমি, পাশাপাশি শোয়ানো, এখানেই তাদের সংসার, স্বর্গ হয়তো নেমে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়, এই মৃতের জীবনকাহিনীই পিরামিডের মধ্যে রাজকীয় ঐশ্বর্যে প্রকাশিত। পিরামিড ভারতীয় নয়, ইজিপ্টীয়। সতরাং বিদেশি মিথ্ এসে যুক্ত হচ্ছে আধুনিক যুগে। পিরামিডের মধ্যেই গোপনে আর একটি জিনিশ লক্ষণীয়, মৃতের দেবতা ওসিরিস বিশ্বশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মৃতকে আবার নতুন জন্মে ফিরিয়ে আনছে, তাই সে বিচার করে মৃতের হৃদয় তুলাদণ্ডে মেপে। এলিঅটের কাব্যের মিথ্‌ও এখান থেকে চয়িত, নতন তাৎপর্যে ইঙ্গিতবহ। জীবনানন্দের কাব্যে এখান থেকেই মৃতের জীবন শুরু হয়েছে আধুনিক মানুষের জীবনে : 'এ নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে সেই মৃত্যুপ্রেতপর, ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি।' এবং এই কাব্যের নামও 'ঝরা পালক'। এই চিত্রকল্পে শুধু ইমোশন জাগছে না ছবিতে, আধুনিক কালের সমগ্র মানুষসম্পর্কে আইডিয়া জাগছে, এই আইডিয়াতেই প্রতীক দুলে উঠছে হৃদয়কে উত্তাল করে ; যে-পাখির পালক ঝরে গেছে, সে তো বেঁচে থাকলেও মৃত। ওড়ার ও গতির মধ্যেই তো তার জীবন। তাই নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলছেন উচ্চারণে ও ঘোষণায় : 'আমি কবি,—সেই কবি,—; আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি!' জগৎ ও জীবনে ঝরা পালকের ছবি দেখেই করির চোখে কাতরতা। এই কাতরতাই জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যের মূল সুর। সেই সঙ্গে বর্ণ গন্ধ ধ্বনি ও শ্রুতিময় ইন্দ্রিয়ঘন ছবি গড়ে তোলবার চেষ্টা : 'আনমনা আমি চেয়ে থাকি হিঙুল মেঘের পানে।' 'হিঙুল' শব্দে

লোহিত বর্ণ আমাদের পরিচিত বাস্তব জগৎকে আরো মোহময় করে তোলে। মেঘের আর একটি ছবি ফুটে উঠেছে অন্য কবিতায় : 'যেন সন্ধ্যা ভোরের নক্‌টার্ন্‌-রাঙা মেঘে।' এলিঅটের কাছ থেকেই; 'নক্‌টার্ন্‌' শব্দব্যবহার কিন্তু দেশি শব্দের থেকে তাৎপর্য যেন নিঙ্‌ড়ে নেওয়া হয়েছে, অথচ যতীন্দ্রনাথের মতো শব্দের গদ্যিকতা নেই, স্বপ্নে রঙিন হয়ে উঠেছে এখানে। এই বইয়ের ছিন্ন নীবার, পাখির নষ্ট নীড়, মা-হারা শিশুর আর বিধবার ভিড় কবিকে ব্যাকুল করেছে, এবং এই সব ছবি ও ছবি থেকে উঠে-আসা ভাবনা কবিকে ব্যাকুল করেছে সারা জীবন। এবং 'নাবিক' কবিতায় রোম্যান্টিক জীবনানন্দের সুদূর ব্যাকুলতাই ব্যঞ্জিত, 'বনলতা সেন' কবিতার চিত্রকল্পে তারই রূপ, অগাধের সাধই রোম্যান্টিকতার ভঙ্গি এখানে : 'কোনো দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে।' ঠিক প্রি-র‍্যাফেলাইট ও ভিক্টোরিয় কবিদেরই মতো তাঁর মনের গড়ন 'কবি' কবিতায় : 'আমি নিদালির আঁখি, নেশাখোর চোখের স্বপন। নিরালায় সুর সাধি—বাঁধি মোর মানসীর বেণী, মানুষ দেখেনি মোরে কোনদিন,—আমারে চেনে নি।' অর্থাৎ একদিকে ঝরা পালক, নষ্ট ক্ষয়, মমির জীবন, ধূসর মরুভূমির প্রান্তর; অন্যদিকে এই জগৎ থেকে স্বপ্নে অন্য জগতে পালিয়ে যাবার ব্যাকুলতা। হয়তো একই মনের দুই রূপ, কিট্‌স যেমন এ-জগতে যৌবনের সৌন্দর্যের মূল্য দেখতে না পেয়েই কল্পনায় উধাও হতে চেয়েছিলেন, তেমনি জীবনানন্দও। এবং ইয়েট্‌স্‌ও।

যদিও জীবনানন্দের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কোনো যোগ নেই মনের গঠনে, তবু যে-বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ, যতীন্দ্রনাথও সেগুলি লিখেছেন : 'বেদিয়া', 'মিশর', 'শ্মশান', 'মরুবালু', 'তোদের বুকে জাগছে মৃগতৃষ্ণা,—জাগে ঝড়'! 'আলেয়া'; 'বহ্নিফেনা নিঙাড়িয়া পাত্র ভরি' 'ভরি অনন্ত অঙ্গার দিয়া হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি গড়ি', 'মরীচিকার পিছে'। যদিও এই মরীচিকায় জ্বালা নিয়ে আসে না যতীন্দ্রনাথের, মরীচিকাছলনায় কবির কল্পনার সুদূরতাই কাম্য, মরীচিকার মধ্যে 'আকুল অলস উদাস বাঁশির সুর' শুনেছেন জীবনানন্দ। সেই সঙ্গে কিছু কবিতায় দেশপ্রেমের, দেশ ও জাতির প্রতি নবীন উন্মাদনার এবং সমাজসংস্কারের বোধও আছে; এই সাম্প্রতিক ও বাস্তবচেতনা তাঁকে ইতিহাসের বোধে জাগ্রত করে তুলেছে পরবর্তীকালে। তব সব ছাপিয়ে 'ঝরা ফসলের গান' বুকে নিয়েই যাত্রা শুরু করেছেন : 'চোখ দুটো ঘুমে মরে;/ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে!/ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন,—স্বপন ক'দিন রয়।'

'পিরামিড' কবিতার প্রথমেই বেলা শেষ হবার ও দিবসের মৃত্যুর ও ক্ষয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। দিবসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর মৃত্যু ও তার শবদেহ বিস্তারিত হয়ে উঠলো, এই শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে। দিবসের মৃত্যু, শতাব্দীর শবদেহ, শ্মশান ও তার ভস্মবহ্নি, সবই জীবনের বিরোধী, মৃত্যুতে দ্যোতিত। চিতার কবলে দেশ জাতি সমাজ সংসার একে একে ডুবে যায়, এই সামগ্রিক ধ্বংসেই কবিতার শুরু। এই মৃত্যুর মধ্যেই সমাধি জেগে উঠছে, জীবনের সঙ্গে সমাধির তুলনা ও বিরোধ। এই সমাধি থেকে মানুষ, প্রেমিক ও প্রিয়া অন্তর্হিত। ভাষায় ও চিত্রকল্পে 'বলাকা'র শাজাহান' কবিতা স্মরণ করায়; 'চলে গেছে প্রিয়তম, চলে গেছে প্রিয়া।'

একদিকে জীবন অন্যদিকে মৃত্যু, কবর, এই দুয়ের বিরোধ। পিরামিড বা কবরকে কবি কল্পনা করেছেন প্রেমিক রূপে, প্রিয়ার বুকের ওপর বসে নীরবে শবসাধনা করছে, এ প্রেমিক 'স্বতন্ত্র স্বরাট'। পিরামিডরূপী প্রেমিকের বাসনা, তার প্রিয়া সস্মিত নয়ন তুলে ব্যথিত কপালে চুম্বন এঁকে দেবে। তাই প্রেমের প্রহরার মতো প্রেত আঁখি নিয়ে কবর জেগে আছে।

কবিতার উপান্তে আধুনিক জীবনের সঙ্গে প্রতীকী পিরামিডের একাত্মতা অনুভব করেছেন কবি। হেমন্তের পাতা-ঝরা রিক্ত শূন্যতায় আধুনিক মানুষের জীবন। দুদিনের জন্যে পুষ্পিত বসন্তের গান বিচিত্র আকাশের উদার মানুষের মন ভুলিয়ে নিলেও এই শ্মশানই জেগে থাকে জীবনে। কিন্তু মানুষের জীবনের বিরোধ এখানেই, সে তার জীবন শ্মশান জেনেও হিমগর্ভ কবরের পাশে দু ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে ভুলে যায়।

এ রিল্‌কেরই মতোন মৃত্যু-আচ্ছন্ন জীবনের ক্ষণিক আনন্দ উদ্‌ভাস। এবং ইয়েট্‌সের মতোই এ-জীবনে মৃত্যুর অভিভব, বাস্তব জীবনের শক্তি ও মৃত্যুর জীবনের প্রজ্ঞায় সমগ্র জীবন। মৃত্যুর মধ্যে যে-প্রেমের নিবিড়তা, তা মানুষের জীবনে নেই।

জীবনানন্দের কবিতার মূল সুর 'পিরমিড' কবিতায় ব্যঞ্জিত; পাতা-ঝরা হেমন্তের বর্ণনায় রিক্ততার প্রতীক, বিদায়ের ব্যথা তাঁর সমগ্র কাব্যে, কী প্রেমে কী জীবনে জেগে আছে স্মৃতির শ্মশান; রিক্ততা, বিষণ্ণতা, ব্যথায় কাতর, বেদনায় গুঞ্জনময় গানের একলা সুর তাঁর কবিতাকে মোহময় করে তোলে। এখানে রবীন্দ্রনাথের আভাস আছে, আবার তাকে ছাড়িয়ে যাবার রূপও সুস্পষ্ট। শব্দব্যবহারে নজরুল-মোহিতলালের কিছু চিহ্ন আছে: 'গৌরবের লক্ষ মুসাফের।' ছন্দে 'বলাকা'র আবেগময় উচ্ছ্বাসিত প্রবহমানতা নেই, তবু 'বলাকা'র অসম পঙ্‌ক্তির মিলযুক্ত অক্ষরবৃত্তই অনসৃত, এবং এই ছন্দেই জীবনানন্দের কান ও মন মজেছে। চিত্রকল্পে বর্ণময়তা যেমন আছে : 'রক্তপীত সাগরের পর', তেমনি বিদেশি মিথ্‌ ও অনুষঙ্গ বাংলা কবিতায় অনুপ্রবেশ করছে; পিরামিড 'বেজে ওঠে অনাহত মেম্ননের স্বর'; এই মেম্নন টয়যুদ্ধে প্রিয়ামের সাহায্য করতে গিয়ে অখুলেসের হাতে মারা যায়, কিন্তু জিউসের আশীর্বাদে অবিনশ্বর; সূর্যের আলো যেমন অবিনশ্বর তেমনি মেম্ননের স্বরও; কবিতার ও জীবনের নিভৃত গোপনে এক অবিনশ্বরতার বেদনা এমনিভাবে জীবনানন্দ অন্তর্নিবিষ্ট করে দিতে চান : 'কলহীন নীলার বেলায়', নীলনদের অনষঙ্গ জাগছে। আধুনিক কবিতার যে-সংসহতি, সংক্ষিপ্তি, ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রতীকের দ্যুতি, সরল পরিচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ প্রকাশভঙ্গি, যা ইয়েট্‌সের শেষের যুগের কবিতায় আধুনিকতায় আনন্দদায়ক, তা এখানে নেই; এবং কখনোই জীবনানন্দে প্রাপণীয় নয়। একটু বেশি বলা, একটু এলিয়ে-পড়া এবং কাতরতায় এলানো বিষণ্ণতার বিস্তার, এবং সুরের মায়াময় বিষাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট করে তলেছে; অনেকের, বিশেষ করে, সুধীন্দ্রনাথের অপছন্দ হলেও।

২

মৃত্যুকেই তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে চান আধুনিকের মতো মিথের ব্যবহারে, বা জীবনে ও প্রেমে ঝরে-পড়া বিষণ্ণতাকে হেমন্তের মধ্যে প্রতীকিত করতে চান সূর্যাস্তের

নিঃসঙ্গ ছড়িয়ে-পড়া ব্যথায়, যেখানে গান দিনের কেন্দ্রীয় শোক হয়ে ওঠে, মধুর সংগীতে স্ফীত হয়, মধুর অশ্রু ঝরে পড়ে।

'পিরামিড' কবিতার তাৎপর্য জীবনানন্দের কাব্যে এইখানে যে জীবনমৃত্যুর দ্বৈত সীমায় জীবনের পূর্ণ রূপ মানুষের চেতনায় ও অনুভবে তিনি বিদ্যমান দেখেছিলেন। এই জীবনমৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য ধারায় জীবনের নীলনদী বয়ে চলেছে পিরামিডের পাশ দিয়ে; এই অর্থে ইতিহাসচেতনার রূপ কালের স্রোতে স্পষ্ট। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন পুনর্জাত হবে, এলিঅটের ও ইয়েট্সের মিথ্-চিন্তাবাহিত বোধ জীবনানন্দেও আছে, এবং এইখানেই সুধীন্দ্রনাথের অধুনা বা সম্প্রতি চেতনার সঙ্গে জীবনানন্দের মিল, এবং হয়তো দুজনেরই উৎস এলিঅট ও ইয়েট্স্। ইতিহাসের মল মাসে সধীন্দ্র সম্প্রতির মধ্যে প্রাকাম্যে অর্থাৎ ইচ্ছার স্বাধীনতায় সর্বতোভদ্র রূপ দেখেছিলেন, জীবনানন্দ 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় বৈনাশিক কালের সীমা পেরিয়ে নিয়ত পরিবর্তমান কালচতেনায় উৎসারিত হয়ে মানবকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'পিরামিড' কবিতায় স্পষ্ট আকারে এই চেতনা ধরা পড়ে নি, তবে বিদেশি মিথের ব্যবহারে মৃত্যুর মধ্যে নূতন জীবনের ইঙ্গিতে চিরন্তনতার সঙ্কেত ব্যঞ্জিত হয়েছে; যেমন 'মেম্নন' 'ইসিস'। ইসিসের মিথের তাৎপর্যের সারাৎসার নিয়েই তো এলিঅটের 'পড়ো জমি'র সার্থকতা।[১]

কিন্তু আট বছর বাদে প্রকাশিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কবিতায় রূপকল্পে ও অনুভবে এক বিস্তর ব্যবধান সূচিত। রূপকল্পে চিত্রে ছবিতে ধ্বনিতে নিটোলতা ও নিবিড়তা এসেছে, একটু বেশি কথন মনে হয়, কিন্তু সুরের ধারাকে প্রতিষ্ঠিত কববার জন্যে যেন ভাষাছন্দের এই প্রবহমানতা কবির ঈপ্সিত ছিলো।

রোম্যান্টিক কবিদের মতোই তাঁর চিত্তে বিরোধ, 'ঝরা পালকে'র কবিতাতেও ছিলো, পৃথিবীর মরুভূমির তপ্ত শ্বাস ও মরীচিকা থেকে পালাবার জন্যে রৌদ্র ঝিলমিল উষার আকাশের মধ্য নিশীথের নীলের ঐশ্বর্যে উধাও হতে চেয়েছেন, কেননা নীলিমায় মৌন স্বপ্নে ময়ূরের ডানা আছে। কিন্তু পৃথিবীতে অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত; পৃথিবী ভরে আছে : 'ছিন্নবাস, নগ্ন শির ভিক্ষদল, নিষ্করুণ, এই রাজপথ,/লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার/এই ধূলি ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার।' নীলিমার ঐশ্বর্য ও অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা এগুলিকে ঢেকে রাখে। তাই স্বপ্নের রাতে তুলে দিতে চান কবি নিজেকে। ভিক্টোরিয় কবিতায় এই বিষণ্ণতা ও ব্যথার মূলে এই বিরোধ প্রায়শ অনপস্থিত, তাই বাস্তবতা হারায়। কবির ধারণা এই স্বপ্নের হাতে ধরা দিলে পৃথিবীর রাতদিনের আঘাত মানুষকে সইতে হতো না আর, হৃদয়ের জরা থাকতো না, কেননা এই স্বপ্নের মধ্যেই দিন ও রাতের ঢেউ-এ এমন অপার্থিব ছায়া এসে পড়ে, যাতে জীবনের পূর্ণতা পাওয়া যায়, য়ুঙের স্বপ্নের মতো।

এই স্বপ্নজগতের ছায়ার ছবির মধ্যে এমন এক ধূসর কুয়াশাময় ঝিমধরা স্তব্ধতা আছে, যা ইয়েট্সের প্রথম যুগের কবিতাকে মনে পড়িয়ে দেয়, মরিসের কাছ থেকে ইয়েট্স্ এই গোধূলির স্বপ্নাচ্ছন্ন কুয়াশাময় জগতের জাদুই পেয়েছিলেন। স্পপ্ন থেকেই গোধূলির ধূসরতায় বিষাদ ও ক্লান্তি নেমে আসে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, সময় সব দুঃখ ভুলিয়ে

---

১. বার্নিক রায়ের 'কবিতায় মিথ্' বইয়ে 'এলিঅটের পড়ো জমির মিথ্' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

দেবে। ইয়েট্‌সের 'শাদা পাখি'র মধ্যে এই বাসনা চিত্রিত। কখনো দূর দ্বীপের অরণ্যের ছায়াঘেরা মৌমাছি গুঞ্জরিত স্থানে যেতে চেয়েছেন, যেখানে নিশীথের ক্ষীণ আলো এবং দুপুরের পীত দীপ্তি, শ্যামার পাখায়-ভরা সন্ধ্যা কবিকে ভুলিয়ে রাখবে। হৃদয়ের গভীরে এদেরই তিনি শুনতে পেয়েছেন। এ-রকম গোধূলির স্বপ্নছায়াই জীবনানন্দে আছে : আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে থেকে জীবনানন্দের চিত্রকল্প বা চিত্রের একটা বিশিষ্টতা হলো বস্তু থেকে নিয়ত পরিবর্তনে ও রূপান্তরে শেষ ছবি বস্তুর আভাসে পরিণত হয়; আকাশ, তার ছায়া এবং ছায়ার ঢেউ; এই ঢেউয়ে আকাশের সম্পর্ক অনেক দূরের। এই আকাশের ছায়ার ঢেউ-এ ভুলে যান পৃথিবীর বাস্তব ব্যথা বিরোধ। শুধু নিজে ভুলতে চান নি, সমস্ত মানুষকে এই স্বপ্নের কাছে আসতে বলেছেন। শুধু ইয়েট্‌স্ গোধূলি ব্যবহার করেন নি, জীবনানন্দও : 'গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে' স্বপ্ন পেয়েছেন, এই স্বপ্নে দেখেছেন 'সন্ধ্যার নদীর জল'—পাথরে জলের ধারা আয়নার মতো *জেগে ওঠে*।

এই কবিতায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র তাৎপর্য ছবিতে বলেছেন জীবনানন্দ। পৃথিবীর ভাষা তিনি বুঝতে চেয়েছেন, বুঝে আঁকাবাঁকা অসংখ্য অক্ষরে তাঁর অন্তরের কথা লিখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেন নি, ব্যর্থ হয়ে গেছে, এই ব্যর্থতার আলো আর অন্ধকারে অক্ষর মুছে গেছে, পৃথিবীর পাণ্ডুলিপিতে অক্ষর তিনি সব বুঝতেও পারেন নি, এবং লিখতেও পারেন নি, বরং পাণ্ডুলিপির অক্ষর যতোটা স্পষ্ট ছিলো তাও ঝাপসা হয়ে গেছে, তাই পৃথিবী কবির কাছে ধূসর পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির অধিকতর ব্যঞ্জনা 'বনলতা সেন' কবিতায় ধরা পড়েছে : 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল', যে-পাণ্ডুলিপি অস্পষ্ট এ-পৃথিবীর ও জীবনে, সেই পাণ্ডুলিপি তো আভাসে ইঙ্গিতে কল্পময় গল্পের বিচিত্র রঙের মোহময় জগৎ তৈরি করে, সেখানেই মানুষের শান্তি, কেননা স্বপ্নের মধ্যেই তার ধ্যান। মানুষের ও নক্ষত্রের আয়ু শেষ হলেও এই স্বপ্নের জগৎ চিরদিন থেকে যায়। সময় আর সব মুছে ফেললেও এই সময়কে মুছে ফেলতে পারে না। এই স্বপ্নের জগৎ আমার কাছে যথাযথ রোম্যান্টিক বলে মনে হয় না; ভিক্টোরিয় কবিতার পলায়নী স্বভাবের সঙ্গে 'ডেকাডেন্ট' কবিতায় চোখ বুজে থাকার প্রবণতার ধারায় ইয়েট্‌সের গোধূলির কুয়াশাময় স্বপ্নের জগৎ মনে হয়।

'ঝরা পালকে'র 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতার মধ্যেই রবীন্দ্ররোধিতা বা রবীন্দ্রনাথের থেকে জীবনানন্দের কবিতায় স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা আভাসিত হয়ে উঠেছে। 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধুসারস' কবিতায় জীবাননন্দ এ-যুগের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সুন্দর করে চিত্রের মধ্যে তুলে ধরেছেন তিনি :

> জানো কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
> অনেক সোনার ধান ঝরে গেছে জানো না কি! অনেক গহন ক্ষতি
> আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি;
> ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
> হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

বহুকালের আগে ঐশ্বর্যের যুগ ছিলো; এখন সোনার ধান ঝরে গেছে, গহন ক্ষতি চারিদিকে; জীবনকে ক্লান্ত করে, আনন্দের গতি নেই, আমাদের ইছা স্বপ্ন চিন্তা ও সময়

হৃদয়ে বিরস গান গাইছে, এবং শেষ সিদ্ধান্ত : 'বেদনার আমরা সন্তান'। বেদনা এখানে ব্যথা ক্ষয় ক্ষতি হারানোর কষ্ট। রবীন্দ্রনাথের বিরোধেই এই সব চিত্রকল্প ও ভাবনা। তাই নক্ষত্রের আলোর কাছে নির্দেশ চেয়েও মাটিতে দেখতে পান স্যাপের খোলস, নালা খলখল অন্ধকার, সোনালি খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে গরুর গাড়িটি চলে যায় অন্ধকারে। এই অন্ধকার, ক্ষয়, ক্ষতি, হারানো কষ্ট, ক্লান্তি, ধ্বংস, এ-যুগের দান।

এ-যগ প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাতে জর্জরিত, মানুষের বুকে চিন্তা ও জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদে ভরে আছে; মানুষের মধ্যে চিন্তা ও হৃদয়ের আঘাত ইয়েট্‌সের মতোই নিয়ত ক্ষইয়ে দিচ্ছে সংগ্রামে তাঁকে; কর্মময় জীবন ও স্তব্ধতা পাশাপাশি; এ-যুগের মানুষের ভেতরে মনের অসুখ, রক্তের অসুখ এবং সাগরের তিক্ত ফেনা; চারিদিকে ও মনে উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা, ব্যর্থতা : 'যা হয়েছে শেষ হয়—বোধ হয় কোনোদিন যা হবার নয়; কাশের রোগীর মতো এখন পৃথিবীর শ্বাস; যক্ষ্মার রুগীর মতো মানুষের মন ধুঁকে মরে'; তাই মৃত্যুই এখানে স্থায়ী, জীবনানন্দের মনে হয়েছে : 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ।' এই ভঙ্গরতার ক্ষয়িষ্ণুতার সুর মননে ও অনুভবে, অনেকটা কাফ্‌কার মতোই, অথচ জীবনানন্দের মনের মধ্যে এক সারাৎসার লকিয়েছিলো রোম্যান্টিক ও প্রতীকী কবিতার আদলে : 'গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের' আকাঙ্ক্ষা ছিলো তাঁর ভেতরে; পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে নতুন সমুদ্র, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। জীবনানন্দের বুকের মধ্যে পৃথিবীর ধানের রসের গল্প, পৃথিবীর আঘ্রাণ, পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী ও প্রেমিকের ম্লান নিঃসঙ্গ মুখের রূপ ঘুমিয়েছিলো; কিন্তু আজকে সেই সব প্রাণ বিশুষ্ক তৃণের মতো রাস্তায় পড়ে আছে। তাই রূপকথার কল্পনা, পৃথিবীর ইন্দ্রিয়ময় আনন্দবোধ, সৃষ্টির ফসলের ঐশ্বর্যের সম্মিলিত মানুষের আনন্দের কোনো চিহ্ন নেই! 'বেলা অবেল' কালবেলা' কাব্যের 'সারাৎসার' কবিতায় জীবনের লক্ষ্যসম্বন্ধে জীবনানন্দ উক্তি করেছেন :

> আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়েব কথা
> সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
> কী করে মানুষ ও মানুষীর মতো করে রাখে।

সাধারণ হৃদয়ের কথাকেই নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত করে মানুষ ও মানুষীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

জীবনানন্দের কাব্যে দঃখের তমল তাড়নায় এ-কালের জীবনে ও আধুনিক চেতনায় ক্ষয়ের ও ধ্বংসেব সুর ফসল কেটে-নেওয়া হেমন্তের প্রান্তরের প্রতীকে যেমন একদিকে ফুটে উঠেছে, তেমনি স্বপ্নের রঙিন ছবিও স্পষ্ট। 'ঝরা পালকে'ই সেদিন এ-ধরণীর' কবিতায় এই দুই বোধ একসঙ্গে সুস্পষ্ট। পৃথিবীর এই কোলাহল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মৃত্তিকার শূন্য পেয়ালার ব্যথা একেবারে ভেঙে বকের পাখার মতো শাদা লঘু মেঘে কবি শূন্যে বসেছিলেন স্বপ্নে, কিছুটা হয়তো শেলি'র স্কাইলার্কের মতো; কেননা শেলির স্কাইলার্কও আনন্দময় সত্তা, আগুনের মেঘ, অশরীরী আনন্দ, পাখার ডানায় বিবর্ণ পীত গলে যায়, তার গানে নির্জন মেঘ থেকে চাঁদ তার আলো বৃষ্টির মতো ঝরিয়ে দেয়, সুরের বৃষ্টি নামে, গোপনে কবির ভাবনার

আলো ছড়িয়ে দেয়, সুরে ঐশী আনন্দের কান্না জাগায়, কোনো গোপন অভাবকে তুলে নিয়ে আসে। এ সকলের মধ্যেই তো মৃত্যুচেতনা কাজ করে, মৃত্যু থেকে উঠে-আসা এই স্কাইলার্ক যেন মানুষ যে-ভাবে স্বপ্ন দেখে তার থেকে আরো বেশি গভীর ও সত্যভাবে পৃথিবীর বস্তুকে দেখে : মৃত্যুরই মতো, আনন্দ ও দুঃখ একসঙ্গে জড়িয়ে আছে পাখির গানে, এ-পাখি পৃথিবীকে ঘৃণা করে, কিন্তু তার গানে সামঞ্জস্যময় উন্মাদনা (harmonious madness), এইটেই শেলি'র আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন, জীবনানন্দেরও; তাই সিন্ধুসারসের মতোই উধাও হতে চান। কিন্তু উধাও হতে গিয়েও কার ভিজে চোখের কান্নার সুর শুনতে পান। কবির শিরা-উপশিরা ধরণীর নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়ে যায়। তার পেছনে পৃথিবীর জননীর মাটি-মা'র স্থবির ক্রন্দনে পেছু ডাক শুনতে পান। এই ডাকের স্মৃতির মধ্যে জড়িয়ে আছে ভিজে ঘাস, হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড়; আলেয়ার লাল মাঠ, শ্মশানের খেয়াঘাট, কঙ্কালের রাশি, দাউদাউ চিতা, পূর্বজাতকের পিতা-পিতামহ, সর্বনাশ, ব্যসনবাসনা, মৃত গোক্ষুরের ফণা, তিথি-অতিথি, যোনিচক্রস্মৃতি, আধো আলো আধো আঁধারময় তারা, মাটির স্তরের স্পর্শে রোমাঞ্চিত রোমপুট, ধু-ধু মাঠ, ধানক্ষেত, কাশফুল, বুনো হাঁস, বালির চর—এই সমস্ত উপাদান একসঙ্গে মিলে শারীর রূপ নিয়েছে বকের ছানায়, আদরের নরম কোমল বস্তু : 'বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া।' কিন্তু শেষে এইসব স্মৃতিও শেষ হয়ে যায়, শকুনের মতো আরো ঊর্ধ্বে উঠে যান, নিঃসহায় মানুষের শিশুর মতো একা মনে হয়, অনন্তের শুভ্র অন্তঃপুরে অসীমতায় বিলীন হতে চান, যেখানে স্ফীত সমুদ্রের মতো আর্ত কোলাহল ও দূর ছায়াপথ। কিন্তু এখানে অসীমের মধ্যেও পৃথিবীর প্রেতচোখ ভেসে ওঠে। জীবনানন্দের এই পৃথিবীর জননীর রূপ রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা'র থেকে একেবারে পৃথক্; যদিও দূর আভাসের মতো 'যেতে নাহি দিব' কবিতার 'বসুন্ধরা'র সঙ্গে একটা মিল আছে; জীবনানন্দের বিষাদ কুয়াশা ও আশাহীন শ্রান্ত আশা রবীন্দ্রনাথের বোধে ধরা পড়েছিলো; তবুও রবীন্দ্রনাথের বসুন্ধরা সন্তানকে বিদায় দিয়েও ব্যাকুলতায় দিগন্তপ্রসারী। এবং তাঁর বসুন্ধরা বিশ্বের প্রান্তর থেকে অনন্তের বাঁশির মেঠো সুরের কান্না শুনে উদাসী বসে আছে শস্যক্ষেত্রময় জাহ্নবীর কূলে। আর জীবনানন্দের পৃথিবী প্রেতের মতো; সে ভ্রূণ, এই সন্তানের জন্ম দেয়, তাই তার সঙ্গে বোবাশিশু বৃদ্ধ মৃতপিতা, সূতিকা-আলয় আর শ্মশানের চিতা, তার বুকে গর্ভিণীর ক্ষোভ, গর্ভের সন্তানের জন্যে সে শৈবাল বিছানা ও শাল-তমালের ছায়া রচনা করেছে। ঋতুতে ঋতুতে নতুন রঙ্ জাগিয়েছে, স্বর্গনদীতে গঙ্গাজল উৎসর্গ করেছে, মৃত্যু ভেদ করে তার স্তনে দুধ উৎসারিত হয়, দূর্বা ও ধানে পৃথিবী ভরিয়ে দিয়েছে, মিলিত করেছে মানবমানবীকে, তবু ভ্রূণ নষ্টশিশু প্রসব করে সে—তাই এই জননীর জন্যে দূর আকাশের জন্যে মক্ষিকার মতো তৃষ্ণা ফেলে চোখ বজেছেন কবি; পলাতকা নীলিমা ডুবে যায় : আর? 'সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।' 'পিরামিড' কবিতাতেও মৃত্যু-আচ্ছাদিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ইসিসের মতো পুনরুজ্জীবনের।

এই সবই ক্ষয়িষ্ণুতার, ক্ষয়ের ধ্বংসের ছবি, যার সঙ্গে 'ডেকাডেন্ট' কবিতার সাদৃশ্য

প্রচুর; যেমন ইয়েট্সের মধ্যেও বিবর্ণ বিষণ্ণতায়, জীর্ণতা ও ক্লান্তির মধ্যে বিষাদময় আত্মায় বারবার ধরা পড়েছে; ইয়েট্সের দৃষ্টিকে আবিষ্ট করেছিলো মুক্তোর মতো বিবর্ণ হাত, দীর্ঘ চুল ও দীর্ঘশ্বাস, ঝরা-পাতা, ম্লান ভ্রূ, স্তব্ধ হাত, অস্পষ্ট কুয়াশা, চুল. পেয়ালা, মড়ার খুলির মতো উজ্জ্বল শাদা, মড়ার খুলির চারধারে বোনা রঙিন গোলাপ। শহরের নাগরিকতার সঙ্গে বাইরের আগন্তুক সৌন্দর্যের মিশ্রণ ঘটে, নরকের আগুন জ্বলে ওঠে, মৃত্যুর দ্বারা জীবন আচ্ছাদিত এখানে। জীবন ও সৌন্দর্য চলে গেলেও তার ভূত আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, মৃত্যু ও পাপ ঘিরে থাকে জীবনে। নৈরাশ্য যেমন একদিকে, তেমনি নৈরাশ্য-প্রতিক্রিয়ায় নির্লজ্জ আনন্দে ভেসে যাবার আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়। অসীম দুঃখভোগ ও সৌন্দর্যচেতনা পাশাপাশি শুয়ে থাকে। পশু ও সৌন্দর্য একই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রক্তে। তাই সৌন্দর্য অপ্রাপণীয়, অপ্রাপণীয় বলেই বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তি থেকে মৃত্যুর ইচ্ছা, মৃত্যুর ইচ্ছা ক্লান্তিকেই টেনে আনে; এবং ক্লান্তি মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। এই অবস্থায় খর রৌদ্র ভালো লাগে না; ক্ষীণ আলো মৃদু রঙ অস্পষ্ট রেখা, ক্ষীণ শক্তির দোলা হৃদয়কে ভুলিয়ে রাখে। জগতে, বর্তমানে, পরিবেশে, কালে এমন বিরুদ্ধতা যে বোদ্লেয়ারের মতো বিষণ্ণকাতর উদ্বিগ্নতা ও যন্ত্রণাময় অবসাদ ও ক্লান্তি আমাদের অবশ করে দেয়। মৃত্যুর নৃত্যের মতো করাল ভয়পূর্ণ বিষণ্ণতার সঙ্গে আত্মিক দূরত্ব ও দূরের বাইরের গন্ধময়তা মিশে থাকে। নারীকে চুম্বন দিতে গিয়েও পূর্বের রমণীর ছায়া ঝুঁকে পড়ে দুজনের নিবিড় ওষ্ঠের মাঝখানে; তাই ডাউসন নিঃসঙ্গ ও প্যাশনরুগ্ন। সালোমে কুন্দশুভ্রকান্ত পুরোহিতের গোলাপ রক্তিম অধর চুম্বন করবার জন্যে অধীর হয়ে তাকে না পেয়ে শেষে হত্যা করে, বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত মস্তকে ও অধরে চুম্বন এঁকে দেয় কামনার রক্তবাসনায় : বাসনা ও হত্যা একই সঙ্গে। চাঁদ ওঠে সেখানে কবর থেকে : রাজকুমারীকে দেখতে লাগে ছায়ায় মতো, অথবা রুপোর দর্পণে শাদা গোলাপের মতো, ঈশ্বরও সেখানে রক্তে অনুরাগী : নার্সিসাসের মতো রাজকুমারীর হৃদয় কাঁপে, চোখ কালো গহ্বরের মতো, যেখানে ড্র্যাগন বাস করে। অথবা চোখ কালো হ্রদ, মায়াময় চাঁদের দ্বারা বিব্রত। রক্তে আকাঙ্ক্ষার নাচ হয়। পরোহিতের মৃত্যুতে ভয়ংকর স্তব্ধতা নেমে আসে। রাজকুমারী সালোমে সৌন্দর্যে তৃষ্ণার্ত, শরীরের জন্যে ক্ষুধাতুরা; নিহত মুখে চুম্বন দিয়ে রক্তময় ভালোবাসার তিক্তস্বাদ নেয় কামাতুরা তরুণী সালোমে। ভের্লেন এই ক্ষয়িষ্ণু কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন : ইন্দ্রিয়ময় আত্মা, ক্লান্ত শরীর ও নরক-রাজ্যের তীব্র ঐশ্বর্য একসঙ্গে মিশে থাকে (Il est fair d'un mélange d'esprit charnel et de chair triste et de toutes les splendeurs violentes du Bas-Empire.) জীবনানন্দের কবিতায় এই ক্ষয়িষ্ণুতার ছাপ নিজেই স্বীকার করে গেছেন : 'আধুনিক কালের ভাব ও চিন্তা-বৈষম্যের হেঁয়ালির ভিতরে পড়ে ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশি'। 'ডেকাডেন্ট' কবিতার অসংখ্য বৈশিষ্ট্য পণ্ডিতেরা লক্ষ করেছেন; এর মধ্যে জীবনানন্দের মধ্যে দেখা যায় : অতিরিক্ত আত্মবিশ্লেষণ, ভাঁড়ের সুখময়তা, বিষণ্ণকাতরতার অন্ধকার, ইচ্ছার বিশৃঙ্খলা, পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার বাসনা ও পৃথিবীকে ঘৃণা ও ভালোবাসা, ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয় ও রূপান্তর, জটিল ও কঠিন বাক্যগঠন, সরময়তা ও যুক্তিহীনতা, নতুন ছন্দস্পন্দ, শব্দে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ময়তা, অবচেতনার প্রতি ঝোঁক, ছেদহীনতা, ভাষায় চিত্রকল্পে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গময় জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা, হারানো স্মৃতির গন্ধ; অতীন্দ্রিয় নয়, অথচ অতীন্দ্রিয় পরিবেশ—এইসব ক্ষয়িষ্ণু

কবিতার লক্ষণ জীবনানন্দে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে; এই সঙ্গে ভাঙা-চোরা শরীর, মৃত চোখ, বিকৃত নাক, সংগতিবিহীন মুখ, হাড় ও কঙ্কাল, মৃত—জীবনানন্দের কবিতার ভয়ংকর বিষণ্ণতার সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। ভের্‌লেন ও বোদ্‌লেয়ার থেকেই এর শুরু, আধুনিক চেতনা এই ক্ষয়িষ্ণু জীবনের বোধ থেকেই নিবিড়তর হয়েছে, ইয়েট্‌স্ শেষ রোম্যান্টিক হলেও এই বোধের দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত, এলিঅটতো এই চেতনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং জীবনানন্দকে রোম্যান্টিক কবিতার সম্প্রসারণ বলায় সরলীকরণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় আধুনিক চেতনার লক্ষণের দিকে চোখ বুজে থেকে। রোম্যান্টিক কবিতায়, বিশেষ করে, শেলি'র কিট্‌সে'র কিছু কিছু কবিতায়, ভয়ংকরের আভাস আছে, কিন্তু ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। ভিক্টোরির কবিতায় যুগের বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কার এবং পার্থিব সম্পদের সমৃদ্ধি এক আত্মিক অস্থিরতা নিয়ে এসেছে। এই আত্মিক অস্থিরতার একটা দিক ক্ষয়িষ্ণুতায় প্রকাশদীপ্ত, যেমন ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতায়, যা জীবনানন্দের মধ্যে অনুষঙ্গ জাগিয়ে দেয়।[1] সন্দেহ, সর্বব্যাপী দুঃখ, আশাহীন অদৃষ্টবাদ, সর্বজনীনবিলাপ, আধুনিক জীবনের অদ্ভুত অসুখ, রুগ্ন ও তড়িঘড়ি দ্বিধাবিভক্ত উদ্দেশ্য, ক্লান্তি, অবসাদ, রুগ্নতা, বিষাদ, বিশৃঙ্খলা আর্নল্ডকে বিভ্রান্ত করেছে, তবু এই পরিবেশে নিজের মধ্যে উৎকর্ষের সাধনা করেছেন তিনি। আর টেনিসনের 'লোটাস ইটারে'র সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন আরাম-আলস্যের নিবিড় উপভোগে জীবন থেকে পলায়ন। এই দয়ের মধ্যবর্তী ব্রাউনিঙের অশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষাময় চেষ্টা ফুটে-ওঠার জন্যে আত্মার বিকাশের প্রেরণা। তাই ব্যর্থতার মধ্যেও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রম চিহ্নিত। ভিক্টোরিয় কবিতার পলায়নেরই আর একটি ধারা মধ্যযুগের জাদুপরী ডাইনির অদ্ভুত পরিবেশে ও লোকসাহিত্যে উধাও হয়ে-যাওয়া, সেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন মনকে বিব্রত করে না, আছে শুধু ইন্‌স্টিংক্ট ও ইন্দ্রিয়ের রঙিন বেদনাময় নিবিড় অনুভব, যা চিত্রের রঙে সুন্দর প্রকাশ পায়। প্যাশনে রঙিন দ্বার খুলে যায় তীব্র গন্ধে, যেমন রসেটির কবিতায়। এ কিট্‌সে'র স্বপ্নঘুম বিষণ্নতা জা[illegible]র্গ ও চিত্রময় জগতের নিবিড়তা থেকে পৃথক্ ও জীবনের যে-চেতনায় কিটস্ মধ্যযুগের স্বপ্নে গিয়েছিলেন বাঁচতে, রসেটি বা মরিসের অর্থাৎ প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর কবিতায় তা নেই। মরিসের কবিতায় চিত্রের আনন্দ ও ঝালরের নক্‌শা-কাটা অলংকারই তাঁর ইমোশন ও কল্পনার দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে নষ্ট করেছে। শুধু উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন রঙের সমারোহ, কবিতার নিখুঁত গঠন, সৌন্দর্য ও শান্ত নির্জনতা, পাখির ডানার অস্পষ্ট সংগীতের ঐকতান, সমুদ্রের মেঝে থেকে কালিঝুলি-মাখা আঙুলের গাছ, তুষারীভূত রামধনুর আলোকের ফোঁটা, আনন্দের মর্মরিত টুক্‌রো, মধুর মতো কেল্লা। আর সুইনবার্ন দেখতে পেয়েছেন একটা মানুষ ডাল ও কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে পথ করে সে জীবন দেখতে পায় না, দেখে অশান্ত সমুদ্রবাতাস, এই জীবনবিহীন নির্জনতায় মৃত্যুই আছে শুধু, পালিয়ে-যাওয়াও মৃত্যু এবং এই বিরুদ্ধ পরিবেশে বেঁচে থাকাও মৃত্যু। তাই সুইন্‌বার্নের ভাষায় বলা যায়, মৃত্যুর মধ্যেই মৃত্যু বেঁচে থাকে। মৃত্যুর আগে যে-বোধ, তাকে হয়তো ভীষণ বা 'ড্রেড' বলা যায়, যার সঙ্গে উদ্বিগ্নতা জড়িত। নিষ্পাপতার মধ্যে যখন পাপ ঢোকে, তখন অস্থিরতা অস্বস্তি জেগে ওঠে তীব্রভাবে, শান্তি থাকে না, অসুখ বেড়ে আসে, ঘূর্ণি জাগে, মনে হয় উঁচ পাহাড় থেকে পড়ে যাবো, এবং

---

[1] The evening comes the fields are still The tinkle of the thirsty rill, unheard all day, ascends again, deserted is the half mown plain, silent the swaths! the ringing wain The mower's cry, the dog's alarms, all housed within the sleeping farms!

আত্মা ও দেহে এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ে নিরন্তর বিরোধ জেগে ওঠে। হাইডেগের বলেন . জগতে সত্তা এই উদ্বেগের অবস্থায় ডুবে যেতে চায়। মনে হয়, জগতে সে নিজেকে দেখতে পায় না; জগতে লিপ্ত সত্তা তার স্বাধীন সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে অস্তিত্বে ভয় পায়। এই আলো-অন্ধকারে-জাত বোধ হলো উদ্বেগেজাত ভীষণ; তাই এর স্বরূপ নিশ্চিত করে বলা যায় না, অভাবাত্মক উপায়ে বলা যায়, স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়। কিন্তু আত্মসচেতন মানুষ এই বোধের হাত থেকে এড়াতে পারে না কখনো। অথচ এর প্রভাবে সব কাজ তুচ্ছ ও পণ্ড হয়ে যায়, সব ভাবনা চিন্তা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও প্রার্থনা এবং সময় শূন্য মনে হয়। অর্থাৎ সর্বময় শূন্যতা ও ধ্বংস।

এই বোধের দ্বারা অভিভূত মানুষ সহজ লোকের মতো চলতে পারে না, কারণ দেহ ও মনের বিরোধ তার মধ্যে তীব্র। সাধারণ মানুষের ভাষা, নিশ্চয়তা, শরীরের স্বাদ, প্রাণের আহ্লাদ সে হারিয়েছে; সাধারণ মানুষ সার্থকতা খোঁজে এই পৃথিবীতে বীজ বুনে,[১] ফসলের আকাঙ্ক্ষা থেকে ফসল তুলে শরীরে মাটির ও জলের গন্ধ মেখে, উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে, ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায়। দেহ ও মনের সামঞ্জস্য কর্মের ও শ্রমের মধ্য দিয়েই মানুষের বেঁচে থাকবার সার্থকতা। কিন্তু যে-মানুষের মাথার মধ্যে বোধ কাজ করে, সে সাধারণ মানুষের মতো চাষির শ্রমের সার্থকতায় বেঁচে থাকতে পারে না। এই বোধকে তাড়াতে গেলেও যায় না : 'মড়ার খুলির মতো ধরে আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে তবু সে মাথার চারিপাশে। এই বোধ অতীতের মৃত্যুর ভূতের ভয়ের মতো মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এবং এই চিত্রকল্পে, মড়ার খুলির মতো, ক্ষয়িষ্ণু কবিতার ছাপ সুস্পষ্ট। এবং অনির্দেশ্য বোধকে দেহময় করে তোলবার নিপুণতা জীবনানন্দের কাব্যকৃতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এখানে চিত্রিত। মাথায় বুকের চোখের চারপাশে এই বোধ ঘোরে। মস্তিষ্কে, হৃদয়ে ও চোখে—সর্বত্র এই ভয় বা ভীষণ। জীবনের সমস্ত চলায়, এবং জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়।

এই বোধ যার মধ্যে জন্ম নেয় সে বিচ্ছিন্ন; আলাদা; আত্মা থেকে শরীরের বুদ্ধি থেকে ইন্দ্রিয়ের, নিজের থেকে নিজের, নিজের সঙ্গে মানুষের। কিন্তু কেন? আসলে সাধারণ মানুষের মতো এই লোকটি আহারনিদ্রামৈথুনে কাজে জীবন কাটাতে চায় নি, পারে নি। তাদের মতো আর তার হৃদয় ও মন নয়। অথচ শ্রমের সঙ্গে এই লোকটি যুক্ত ছিলো, কাস্তে নিয়ে মাঠে ফসল কেটেছে, বালটিতে জল টেনেছে, নদীর ঘাটে মেছোদের মতো ঘুরেছে; পুকুরের পানা, শ্যাওলা, মাছের আঁশটে গন্ধ গায়ে মেখে জগৎ ও জীবনের আস্বাদ নিয়েছে আগে। অতীতের বাতাসের মতো অবাধ জীবন রয়েছে তার যখন সে নক্ষত্রের নীচে ঘুমিয়েছে। এবং মেয়েমানষকে ভালোবেসে অবহেলা করে, ঘৃণা করে তাদের ও নিজের হৃদয়ের প্রেম জেনেছে। কিন্তু এই ব্যক্তি নারীকে ভালোবেসেও নারীর ভালোবাসা পায় নি। উপেক্ষা ও ঘৃণা করে চলে গেছে সেই নারী। এর কারণ সে মনে করে : 'যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা আমি তা ভুলিয়া গেছি।' কিন্তু এই ভালোবাসার মধ্যে ইয়েট্সেরই মতো সে দেখেছে ধুলো ও কাদা। এখানে

---

[১] যো যয়োম কারয়েইতি হো অষম্ কারয়েতি।—আবেস্তা, ৩.৩১. যঃ যবম্ কিরতি সঃ ঋতম্ কিরতি।—সংস্কৃতে রূপান্তর

এই নক্ষত্রের অর্থ তাৎপর্যবহ : কেননা নক্ষত্রের আলোর উদ্‌ভাস ও মৃত্যুই জীবনানন্দের কবিতায় বারবার ছায়া ফেলেছে।

আবার ধুয়ার মতো বলেছেন : 'মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক 'বোধ কাজ করে', 'এই বোধ' জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!' তার অবসাদ নেই, শান্তি নেই, ঘুমোয় না, থাকবার স্বাদ পায় না, মানুষের মানুষীর শিশুর মুখ দেখে আহ্লাদ পায় না।[১] সকলের ও নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন।

আর এই বোধের স্বাদে তার চোখে কালো শিরার অসুখ, কানে বধিরতা। হৃদয় নষ্টশসা ও পচা চালকুমড়োর মতো পচে উঠেছে : 'সেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে/নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,/যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে/সেই সব।' আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা, মানুষকে এই পচনের স্তরে নিয়ে যায়; এই পচন মৃত্যুরই সামিল। 'মহাপৃথিবী'র 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় এই মৃত্যুর রূপ আরো সংহত চিত্রের বর্ণনায় ও প্রতীকে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মৃত্যুর বিরোধ প্রথমেই প্রতীকিত, বসন্তের ফাল্গুনের পঞ্চমীর চাঁদের আলোয় লোকটি ভূত দেখেছিলো, এই ভূত সেই বোধই। বর্তমান কালে বিচ্ছিন্নতায় মানুষের জীবন; রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো। তাই মরুভূমির মৃত্যুর ধূসরতা, উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা আর মহাকালের মতো প্যাঁচা জেগে আছে জীবজগতের ক্ষুধার সংগ্রাম দেখতে; ব্যাঙ, মশা, রক্তক্লেদে বসে-থাকা রৌদ্রে উড়ে যাওয়া মাছি, কীটের খেলা সবই তার দৃষ্টিতে পড়ে; এই জৈব জীবনের আস্বাদে লোকটি শান্তি পায় নি। জোনাকির ভিড় ও সোনালি ফুলের ঝাঁকে তো জৈব প্রাণের মাখামাখি; চেতনা কোথায়? যেখানে চাঁদ, সৌন্দর্য;—বুড়ি হয়ে বেনো জলে ভেসে গেছে, আছে শুধু প্যাঁচা ও ইঁদরের খাদ্য-খাদকের সংগ্রাম। তাই দ্বিধাবিভক্ত, বিচ্ছিন্ন চৈতন্য অনবরত সংগ্রামে মৃত্যুতে শান্তি চেয়েছে বসন্তের চাঁদের আলোয়। এই বিচ্ছিন্নতার বোধ বা ভীষণ মনে বা চেতনায় জাগলে তার কাছে নারীর প্রেম শিশুর নিষ্পাপ মখ, গৃহের আরাম, অর্থকীর্তি সচ্ছলতা সবই নিরর্থক মনে হয়; চেতনায় এই স্বরূপ, বিপন্ন বিস্ময় : 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে ; / আমাদের ক্লান্ত করে, / ক্লান্ত—ক্লান্ত করে'; এই রোগ বাইরের নয়, ভেতরের গভীর রক্তের। এই বিপন্নতা ও বিস্ময় কির্কেগার্দের ভীষণ বা 'ড্রেড'; মানুষ যখন নিষ্পাপের অবস্থা থেকে পাপ করে, তখন তার মধ্যে অস্থিরতা অনিশ্চিয়তা ও নিরাশ্রয়তা নিয়ে আসে, অশুভের ইঙ্গিতের উদ্‌ভাস ঘটে। এই অশুভ পাপ সব শান্তি নষ্ট করে দেয়, নষ্ট করে দেবার পর আর নিষ্পাপত্ব থাকে না, অস্তিত্বের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তিত অস্তিত্বের অবস্থার মধ্যে এগোয় বলেই বিস্ময় থাকে। ভীষণের চেতনায় বিচ্ছিন্ন মানুষটি মারা গেলেও সেই জৈব পৃথিবী একই নিয়মে চলে। থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশথের ডালে বসে সৌন্দর্য ডুবিয়ে দিয়ে ক্ষুধার খাবার ইঁদুর খায়। এই জৈব প্রাণের উল্লাসেই এখন সারা পৃথিবীতে ; তাই ধিক্কার শেষ পঙ্‌ক্তিতে : 'আমরা দুজনে মিলে শূন্য কবে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'।[১]

---

১. জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন ছায়া ফেলেছে এখানে

১. 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাসম্বন্ধে জীবনানন্দের উক্তি স্মরণীয় : 'কবিতাটিতে subjective note শেষের দিকে ফুটে উঠেছে; সে তো লাসকাটা ঘরের বাইবে—অনেক দূরে—প্রকৃতির প্রাচুর্য ও ইতিহাসের প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে আনন্দিত করে রেখেছে কবিকে'।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় চিত্রকল্প আরো গাঢ় ইঙ্গিত প্রতীকময় হয়ে উঠেছে উপমার অভিনবত্বে। কবিতার অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ছবির বস্তুর উপাদান অসংখ্য অনুষঙ্গ জাগায় মনের মধ্যে। ছবিগুলি কুৎসিত, কিন্তু হৃদয়ের বেদনার তীব্রতায় গভীর শক্তিতে সৃষ্টির বৃক্ষের মতো নবায়মান, রক্ত ফেনামাখা মড়কের ইঁদুরের মতো কুৎসিত হলেও অনুপ্রাসের কোমল ধ্বনির সুরের কান্না উপেক্ষিত হয়নি, 'ম' 'র' কান্না জাগায়। 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে'; নিস্তব্ধতা শারীর রূপ পেয়েছে উটের গ্রীবায় এবং উট ও তার গ্রীবা অনুষঙ্গে মরুভূমির দুঃসহ জীবনের সঙ্গে মৃত্যুকে দ্যোতিত করছে। এবং দুটোই বাচ্য-উৎপেক্ষা, সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করছে 'মতো' শব্দ। নিস্তব্ধতার চেয়ে উটের গ্রীবাই বড়ো হয়ে উঠছে এখানে এবং সন্দেহ জাগাচ্ছে। 'রক্তক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি'; এখানে কোনো উপমা নেই, কিন্তু ছবির গতিময়তা ও স্পষ্টতা কবিতার অর্থকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছে এবং উপমার কাজই সাদৃশ্যে দূরে নিয়ে যাওয়া। জীবনানন্দের কবিতায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষাই ভিড় করে আসে বেশি। যেখানে জীবনানন্দ বোধের গভীরতার আদি-উৎসে পৌঁছতে চান সেখানেও এই রীতি। 'ঘাস' তাঁর কাব্যে জীবনের গভীরে অন্ধকার আদি-উৎসের ও সৃষ্টির প্রতীক : 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা।' তাঁর এই ছবিতে স্পর্শ, দৃশ্য ও ঘ্রাণ একসঙ্গে মিশে আছে এবং তাঁর ছবি ও রঙ একই চিত্রকল্পে পাল্টে যায়, নতুন হয়ে ওঠে, সবুজ আলোতে রূপান্তরিত হয়েছে এখানে। একটা উপমার সঙ্গে আরেকটা উপমা আসে, কচি লেবপাতার মতো সবজ, কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ, দুই সবুজের রঙের ছায়ার স্তর বিভিন্ন, তার সঙ্গে আলো ও ঘ্রাণ মিশে গেলো, তারই ফলে ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো হয়ে ওঠে। মদের মধ্যে যেমন আস্বাদ, ছানা ও ঘষা শব্দের স্পর্শের ইন্দ্রিয়ময়তা জাগছে; সব মিলে এক নিবিড় ঘাসপাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে গভীর স্তরে পৌঁছেছে। এই সুস্বাদ অন্ধকারের নিবিড়তাই জীবনানন্দের কাঙ্ক্ষিত। বিচ্ছিন্নতার দ্বারা মৃত্যুচেতনা এবং অন্যদিকে প্রকৃতির গভীরে নিবিড় প্রাণের আস্বাদে এক হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতায় এই দুই বোধ ছিলো একসঙ্গে, এখানে দুই পাখায় উড্ডীয়মান। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে ও 'বোধে'—মৃত্যুচেতনা, অন্যদিকে 'স্বপ্নের হাতে' মুক্তির বাসনা।

'বোধ' কবিতায় জীবনানন্দের প্রেমের ব্যর্থতার ও প্রকৃতির রূপ চকিতে ব্যক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর এলানো ভেঙে-পড়া বিষাদময় বিষণ্ণ সরের বিস্তারতার টেক্‌নিকও ঐ কবিতায় আছে, তিনি পনরাবৃত্তি করতে ভালোবাসেন; কারণ একটা মর্জিকে পাঠকের হৃদয়ে তীব্র ও স্পষ্টভাবে এবং গভীরে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চান। তাঁর কাব্যের বিশেষ প্যাটার্নই গড়ে উঠেছে জলের ঘোরানো সুরের একার বিষণ্ণতায় : 'সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়'। এই নরম শব্দের বিষণ্ণ গানের জন্যেই জীবনানন্দের কবিতা মর্মস্পর্শী। তিনি বুদ্ধির খেলার চেয়ে হৃদয়ের ও অনভূতির নিবিড়তাকেই আনতে চান কল্পনার সাহায্যে সুদূরে যেতে। সুধীন্দ্রনাথও অস্তিত্ববাদীর অনামিক শঙ্কা চকিতে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু জীবনানন্দের মতো হৃদয়ের

উপলব্ধিতে গভীরভাবে তাকে আত্মস্থ করতে পারেন নি।

জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা প্রথম থেকেই; এই মৃত্যুচেতনা রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক্। রোম্যান্টিকেরা মৃত্যুচেতনা-বিদ্ধ। শেলি 'স্কাইলার্ক' কবিতায় এক জায়গায় বলেছেন : ঘুমে বা জাগরণে, মৃত্যু থেকে এসে তুমি বস্তুকে আরো সত্য গভীরভাবে দেখবে, আমরা নশ্বর মানুষেরা এমনি স্বপ্নে দেখতে পারি না। রিল্‌কে মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত ভুবনে জীবনের লীলা দেখেছেন। এ-ও অনুভব করেছেন তিনি যে মৃত্যু নিয়েই মানুষ জন্মায়, মানুষের জীবনের সার্থকতায় মৃত্যুর সঙ্গে মিলনে পূর্ণতা আসে। এই পূর্ণতাবিহীন মৃত্যু ভয়ংকর, এর রূপও তাঁর কাব্যে আছে। ব্লেক দেহ ও আত্মার আলিঙ্গনের মতো মৃত্যুকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন উপলব্ধিতে। ইয়েট্‌স্ ব্যক্তিগত বোধের নিবিড়তার মৃত্যুর মিলনের উল্লাস উপলব্ধি করেছেন। বস্তুধর্মিতার মধ্যে আছে জ্ঞান, ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে আনন্দ-উল্লাস, আনন্দ-উল্লাসময় সারাৎসার; ইয়েট্‌সের বিশ্বাস, আত্মাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পায়। 'সমস্ত আত্মার রাত্রি' কবিতায় ইয়েট্‌স্ বলেছেন, মনের গতির মধ্যে মৃত্যু জড়িয়ে থাকে, যেমন মমির বস্ত্রে মমি জড়িয়ে থাকে।[১] এরকম কথা জীবনানন্দেরও। এলিঅট মৃত্যুকে দেখেছেন পনরুজ্জীবনে, অথবা যেমন 'জার্নি অব দ্য ম্যাজা'ই কবিতায়, এই জন্মমৃত্যুরই মতো কঠিন, যন্ত্রণাদায়ক, জন্মের সঙ্গে মৃত্যুবোধ জীবন ও জীবনের সঙ্গে মৃত্যুকে একসঙ্গে উপলব্ধি করেন : 'যখন ঝরিয়া যাবো হেমন্তের ঝড়ে/পথের পাতার মতন তুমিও তখন/আমার বুকের ওপরে শুয়ে রবে।' মৃত্যু জীবনকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। তাই মৃত্যু হলেও অগাধ থেকে যায়। ইয়েট্‌সের এই মমিই ব্যবহার করেছেন মৃত্যুচেতনায় জীবনানন্দ : 'মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর/এক মাইল রৌদ্রে পড়ে আছে' (খেতে প্রান্তরে)। জীবনানন্দের প্রেমের মধ্যেও এই মৃত্যু কাজ করছে : 'তুমি যদি বেঁচে থাকো,—জেগে রব আমি এই পৃথিবীর 'পর/যদিও বুকের 'পরে রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর।' নতুবা : 'সকলের ঘুম আছে, ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে সকলের।' 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনের প্রতি ভালোবাসা, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতে রাঙা কামনার মতো উজ্জ্বল, শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ সব কিছুই ঘুরেফিরে বারোমাস আস্বাদন করেছেন কবি, কিন্তু প্রকৃতির এই ভালোবাসার মধ্যেই মৃত্যর ধূসর মুখ দেয়ালের মতো এসে জেগে থাকে। মৃণালিনী ঘোষালের শবই পৃথিবীতে লাল নীল মাছ, মেঘ, ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো হয়ে ফুটে আছে। প্রকৃতি প্রেম ও মানষের মনে সর্বত্রই মৃত্যুর অস্তিত্ব অনুভব করেছেন, প্রকৃতির গভীর অন্ধকারে আস্বাদ নেওয়া মৃত্যকেই লাভ করা। জীবনকেই তিনি গভীর অনভব করেছেন জীবনমৃত্যর সমন্বয়ে : 'আমাদের রক্তের ভিতর বরফের মতো শীত—আগুনের মতো তবু জ্বর।' মৃত্যর ভয়ংকর রূপ 'মহাপৃথিবী'র 'মৃত্য' কবিতায়: 'হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীতবোধ করে মাঝ রাতে' তারা দুপুরে বসে শহরের গ্রিলে মৃত্যু অনুভব করে আরো গাঢ়। এই মৃত্যু দৈত্যাকৃতি হয়ে জনতাকে চালায়, এই মৃত্যুর আলোকেই মানুষের মুখ সহসা ভীত হয়। রিল্‌কে এই মৃত্যুকে জনতার মৃত্যু ও ভয়ংকর মৃত্যু বলেছেন।

---

[১] Wound in mind's pondering As mummies in the mummy-cloth are wound.

জীবনানন্দকে মনে হয় তিনি প্রেমের, ব্যর্থ-প্রেমের, নারীর চেতনায় উজ্জ্বল বোধের কবি, যার সঙ্গে জীবন প্রকৃতি ও মৃত্যু জড়িয়ে আছে। 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় প্রেমের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন : 'কোনো এক মানুষীর মনে/কোনো এক মানুষের তরে/যে-জিনিশ বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—/নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে/কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।' 'সুরঞ্জনা' কবিতায় জীবনানন্দ প্রেমকে ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল ও সেই নিহিত উজ্জ্বল বলে বর্ণনা করেছেন। ভালোবাসার মধ্যেই কান্না আছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেমের কবিতায় ঘুম, গহ্বর, অন্ধকার, আহতবোধ, হরিণের মতো হৃদয়; ক্লান্তি, জীবনের জ্বর, পাতাঝরা ও কুয়াশা—এই সব শব্দের ছবির সঙ্গে প্রতীকতা এসেছে। প্রেম কবির হৃদয়কে ছিঁড়ে ফেঁড়ে গেছে, তবু যে-প্রেম চলে গেছে সেই প্রেমের হাত ধরে তাকে বীণার মতো করে বাজান। তিনি জানান : কারণ সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি : 'তাই রাখিয়াছে ঢেকে পাখির মায়ের কত প্রেম এসে আমাদের বুকে/সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ।' প্রেম চলে যাবার সময় জলের ঢেউ-এ প্রাণকে ছিঁড়ে গেলেও ঢেউ-এর মতো প্রেমের প্রাণ আবার ফিরে আসে। ঢেউ-এরই মতোন প্রেমের উত্থানপতন ঘটে। কিন্তু মানুষ প্রেমকে ধরতে পারে নি, সে প্রেমের ছায়ার পেছনে ঘুরেছে শুধু। মনের অসুখে প্রেম নক্ষত্রের মতোন ঝরে গেলেও সে আকাশে সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকে :

প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে।
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম তোমারে! মৃতেরা আবার জাগিয়াছে!
যে-ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,—
ওগো প্রেম সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে।

প্রেমের এই রোম্যান্টিক ব্যথার সঙ্গে, যা ব্লেকের, বার্নসের কবিতায় পাওয়া যায়, আর এক অনুভব, ব্যর্থতার যন্ত্রণা, পরাজয়ের গ্লানি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই ফুটে উঠেছে। যে-নারীকে কবি ভালোবাসতেন, সে এখন অন্যের কাছে শরীর দিয়েছে, সে এই নারীর শরীর ছানে, তাকেই সে রক্তের ভালোবাসা দিয়েছে। আর কবি সমুদ্রের পারে একা বসে আছেন; আর মনে হয়, চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা। প্রেমের অনুভবের ব্যথা থেকে চিন্তায় এই সত্যে এসেছেন যে, প্রেম চিরদিন তারার মতোন জ্বলে না, কিন্তু মর্মান্তিক যন্ত্রণা হচ্ছে, দেহ ঝরবার আগে মন ঝরে যায় : 'জানি আমি;—তবু এই পৃথিবীর ফসলে- ভূমি আকাশের তারার মতোন ফলিয়া ওঠে না রোজ; দেহ ঝরে,—ঝরে যায় মন তার আগে।' 'পরস্পর' কবিতায় হারানো প্রেম স্মৃতিতে সৌন্দর্য আনে নি, বরং নারীর থুঁতনিতে হাত দিয়ে তাঁর মনে হয়েছে : 'সব বাসি—সব বাসি—একেবারে মেকি।' এই বাসি ও মেকি প্রেমের ধূসরতা তাঁর কাব্যে হেমন্তের ক্ষয়ের মতোই : 'তাই চোখে ঠোঁটে চুলে শুধু পীড়া, শুধু পীড়া'; রূপকথায় যে-নারীকে স্বপ্নের দেশের হাতির দাঁতের-গড়া শুভ্রতার স্তব্ধ প্রতিমূর্তি মনে হতো,

তারও রূপ ঝরে যায়, সে শরীরের ঘুম ও ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখে। চোখে ঠোঁটে অসুবিধা, ভেতরে অসুখ, দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষ এই ঘুমনো মেয়ের রূপ খেয়ে নেয়, তাকে শুষে ফোঁপরা করে দেয়। স্বপ্নে সে-রূপকথার স্তব্ধ সৌন্দর্য, কিন্তু বাস্তবে এলেই দেহের ক্ষুধা ও বাসনায় সে ফোঁপরা হয়ে যায়। রোম্যান্টিকতার সঙ্গেই প্রেমের মধ্যে রক্তমাংস শিরা-উপশিরা শারীর স্পর্শ ইন্দ্রিয়ময়তা ও প্যাশন আসে। সেই সঙ্গে প্রেমে ক্রূরতা ও আদিমতা এবং যৌনতা; ঘাই-হরিণীর ডাকে জ্যোৎস্নায় নোনা মেয়েমানুষের শরীরের ঘ্রাণ পেয়ে হরিণেরা মৃত হয়। তাই প্রেমের মধ্যে সাহস স্বপ্ন সাধ যেমন আছে, তেমনি ব্যথা মৃত্যুও আছে। এবং বিয়োগের কান্নাই প্রধানত জেগে ওঠে, মৃত হরিণের মতোই কবির বুকের প্রেম, যে-প্রেমের মধ্যে শুধু ধুলো আর রক্ত মিশে আছে। 'ক্যাম্পে' কবিতায় বসন্ত প্রকৃতির ভেতরে প্রাণীর হিংস্র যৌন কামনা, আবার প্রকৃতির মধ্যে প্রাণিহত্যায় মানুষের নৃশংসতা, মৃত হরিণের জন্যে ব্যথা ও প্রেম কবিকে ব্যথিত করে, সকল প্রাণী-কীট-পতঙ্গের জন্যেই মানবিক ব্যথা তাদের হত্যায়।[1]এবং মানুষের জন্যেও।

বুদ্ধদেব বসু বাংলাকবিতার সমালোচনাকে তাঁর বুদ্ধির ও দর্শনের অপভ্রংশতার জন্যে দুর্গন্ধময় জলাভূমিতে ডুবিয়ে দিয়েছেন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি তিনি বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কবিতার প্রকৃতিতে প্রাণের মতো স্বতঃস্ফূর্ত বিশুদ্ধ সহজ ইন্দ্রিয়ময় হয়ে-ওঠার জীবন্ত অভিজ্ঞতার একমাত্র সত্য নেই, তার সত্য এই ইন্দ্রিয়ময়তাকে তাৎপর্যে সর্বজনীন করে তোলা। গোয়েঠের মতে কাব্য যেমন 'ডিশ্‌টুঙ্', প্রকৃতির মতো হয়ে-ওঠা, তেমনি 'হুরহাইট্' অর্থাৎ সত্য, এই সত্যের মধ্যে চিন্তার অনুভব রূপময় হয়ে উঠে। বুদ্ধদেব একথা বুঝতেন না, তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম ও সমালোচনা হৃদয়ের পচা গন্ধে ম্লান। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে শুধু প্রকৃতির রূপ ও ঐশ্বর্য সুরের সম্মোহনে কবি গভীর আস্বাদন করেন নি, এই আস্বাদনের সঙ্গেই মৃত্যুর বোধ জড়িত। জীবন ও মৃত্যু একসঙ্গে গ্রথিত, ব্লেকের মতো জীবন ও মৃত্যু আলিঙ্গিত। হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে রিল্‌কের গন্ধ আছে, মৃত্যুর দ্বারাই জগৎ আচ্ছন্ন, তার মধ্যেই জীবনের হাসি ও আলো ক্ষণিকে ফুটে ওঠে। এবং এখানেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-ভাবনা থেকে এ-কবিতা আলাদা। জীবনমৃত্যুর মিথুন রূপ কবিতার শেষ স্তবকে, সব উপাদানকে সংগ্রথিত করে বলেছেন জীবনানন্দ : 'সব রাঙা কামনার শিয়রে দেয়ালের মতো এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ।' পৃথিবীর স্বপ্ন শান্তি মৃত্যুতেই নিরুত্তর শান্তি পায়। মায়াবীর প্রয়োজন শেষ হয়, এই উপলব্ধি ছাড়া জীবনের আর কোনো অর্থ নেই। অদ্ভুত বিস্ময়সূচকতায় তাঁর শেষ প্রশ্ন : 'প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!' এই মৃত্যুর সঙ্গেই প্রকৃতির অপূর্ব রূপসৌন্দর্য ও নিভৃত নিবিড় আস্বাদন, যা কিট্‌সে'র সৌন্দর্যের আস্বাদনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যার জীবন, মাঠের পারে নরম নদীর নারী তার কুয়াশার ফুল ছড়ানো; মনে হয়, পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে ভরে গেছে, ফসলহীন

---

[1] জীবনানন্দের ভাষ্য : 'যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের—মানুষের—কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়—'ক্যাম্পে' কবিতাটির ইঙ্গিত এই মাত্র। কবিতাটির এই সুর শিকারী, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে-হিংসা সফল—পৃথিবীর এই সব ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়, বিষণ্ণ যতখানি, বিষণ্ণ, নিরাশ্রয়।'

রিক্ত মাঠের শিয়রে নিস্তব্ধ চাঁদ সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই সব ছবিতে যেমন আস্বাদন আছে তেমনি তাৎপর্যও আছে, রিক্ত মাঠ ক্ষয়েরই চিহ্ন : এবং মৃত্যুর রূপ বিভিন্ন স্তবকে বিচিত্র : কখনো ফসলহীন রিক্ত মাঠের মতো, কখনো নিভৃত কুহকের রূপে, কখনো শিকারীর গুলির আঘাতে বুনোহাঁস মারার প্রতীকে, অথবা কখনো ইয়েট্সের অনুসরণে : 'সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ', প্রকৃতির এই চিরন্তন জন্মমৃত্যুর লীলায়; মৃত্যুকে জীবনানন্দ দেখেছেন। অথচ এই মৃত্যুর সঙ্গে অদ্ভুত আস্বাদনের নিবিড়তা জাগে 'নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;' 'প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ।' আর এখানেই পৃথিবীর কঙ্কাবতী, ম্লান ধূপের শরীর পেয়ে আমাদের বিকেলবেলার ধূসরতা কাটিয়ে আরো এক আলোর সন্ধান দেয়। জীবনানন্দের সমগ্র জীবনদর্শন এই কবিতায় ব্যক্ত; প্রকৃতির রূপময়, চিত্ররূপময় বর্ণনা নয়। আর একটি জিনিশও বিশেষভাবে লক্ষণীয় : এ-কবিতায় কোনো স্থির ছেদচিহ্ন দাঁড়ি নেই, বিস্ময়সূচক দাঁড়ি পড়েছে শেষ স্তবকের আটচল্লিশ পঙ্‌ক্তিতে। এই দীর্ঘ প্রবহমান সুরের জাদুর সম্মোহনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিগূঢ় রূপের মধ্যে মৃত্যুর গোপন খেলার ভয়ংকরতা একসঙ্গে মিশে গেছে। এমনিভাবে কবিতার জৈব ঐক্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যা ধরতে পারেন নি, জীবনানন্দেব কাব্যে সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। আসলে বুদ্ধদেব পেটার ও ওয়াইল্ডের মানসসন্তান, সাহিত্যে তাই ইন্দ্রিয়ময়তা, স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ রূপ দেখতে চেয়েছেন। আমাদের সৌভাগ্য, প্রি-রাফেলাইট ও ডেকাডেন্টের স্পর্শ ইয়েট্সের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দে স্পর্শ করলেও জীবনের বোধের গভীরতা ও বাস্তবতায় তিনি মহান্ হয়ে উঠেছেন, তাই বুদ্ধদেব আজ মৃত। জীবনানন্দ এই ঝরে-পড়া ও হারানো প্রেমের গানের সুরই কোমল গন্ধে ধ্বনিত করেছেন কবিতায়। 'বনলতা সেন' কাব্যে 'দুজন' কবিতায় মুছে-যাওয়া ও মরে-যাওয়া প্রেমের করুণ বিষণ্ণতা প্রেমিক-প্রেমিকার সংলাপে এক উদাস ব্যথা জাগিয়ে দেয়। প্রেমের চেতনা হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে, তারপর ঝরে গেছে, যদি প্রেম না ঝরতো, যদি আরক্ত বাসনা না ফুরোতো হৃদয় থেকে, এই অসমাপ্ত আক্ষেপে নারীর কথা শেষ হয়েছে আঁচলের আচ্ছাদনে। আর প্রতীকের মতো নারীর শাড়িতে চোরকাঁটা বিঁধেছে, এলোমেলো অঘ্রানের খড় এসে পড়েছে, চুলের ওপর কুয়াশা ও শিশির। রিক্ততার মধ্যেও একটা মায়াবী স্পর্শ। কিন্তু কবিতার শেষে একটা আঘাত আছে, নারী চলে গেলে প্রেমিকের মনে হলো : এই নারী হরিণীর মতো কামনার ভালোবাসা খুঁজে নেবে, অন্য হরিণকে নিহত করবে, কিন্তু সে একা থাকবে। এবং শেষের দিকে জীবনানন্দের প্রেমের অনুভূতিতে হতাশার সঙ্গে ইয়েট্সের নিষ্ঠুরতা ও হত্যা রক্ত মেখে যন্ত্রণাময় দ্বিধা তৈরি করেছে : 'দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে আমরা অঙ্গার রক্ত : শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে।' প্রেমে ভালোবাসায় স্মৃতির অঙ্গার ও পাপ অনুভব করেছেন জীবনানন্দ।

তবু নারীকে তিনি সুরঞ্জনার মতো পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম করে বিচিত্র উজ্জ্বলতায় দেখেছেন। তার দেহের মধ্যে সিন্ধুরাত্রি মৃত মিশে গেছে, তবু তাকে দিয়েই ভোরের কল্লোল জেগে ওঠে। সূর্যের জাগার মতোনই সবিতা অন্ধকার পেরিয়ে অতীতের গর্ভ থেকে আলোয় দীপ্ত করে চলেছে মানুষকে; এবং সুচেতনা আমাদের চিত্তের গভীরতম প্রদেশের বিশুদ্ধ নির্জনতা, যেখানে অস্থিরতা ও অশান্তি স্তব্ধ হয়ে যায়; শাশ্বত রাত্রির বুকে

সকলি অনন্ত সূর্যোদয়। এবং বনলতা প্রকৃতির, অতীতের সৌন্দর্যের, মানুষের আকাঙ্ক্ষার ও আশ্রয়ের ও শান্তির প্রতিমূর্তি।

জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতি যেমন স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে প্রতীক হয়ে উঠেছে রূপময় গন্ধে, তেমনি প্রকৃতির সারাৎসার ও তাৎপর্য, তার বিভিন্ন উপাদান মানুষের চেতনায় ও শরীরে একাত্ম হয়ে নতুন রূপের মাধুর্যে উদ্‌ভাসিত। অনেক সময়ই প্রকৃতির বর্ণনায় ক্ষয়ের ও ধ্বংসের প্রতীক : 'বাঁশ পাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা, / বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা; / ধানক্ষেতে মাঠে / জমিছে ধোঁয়াটে/ধারালো কুয়াশা; ঘরে গেছে চাষা।' অথবা 'মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে / আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে—পোড়ো জমি, খড়— নাড়া মাঠের ফাটল / শিশিরের জল / মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—' প্রতীক ছাড়াও ছবির সুরের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অপূর্ব : 'প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ।' সৃষ্টির আনন্দের সঙ্গে সূর্যের আলোর চেতনা একসঙ্গে মিশে আছে। যদিও রবীন্দ্রনাথের গানের একটি পঙ্‌ক্তির অনুসরণে রচিত বলে মনে হয় : 'ফুলের মতো প্রভাত মম উঠিবে পুরে।' তবে রবীন্দ্রনাথে ফুলের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য শুভ্রতায় ব্যক্ত, ধানের গুচ্ছে সৃষ্টি ও ফসল এবং সবুজে সমগ্র প্রাণের বোধ ইঙ্গিতবহ।

এই সঙ্গেই জীবনানন্দের সময় ও ইতিহাস চেতনার শুরু। 'শকুন' কবিতায় জীবনানন্দ সমাজে শোষণ ও লুণ্ঠনকারী বুর্জোয়াদের রূপই 'হুন' শব্দে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সব শকুনরূপী হুনেরা বোম্বাইয়ের বন্দরে অন্ধকারে মাল চুরি করে মালাবারে ছুটে যায় চুরির উদ্দেশ্যেই। 'সুচেতনা' কবিতায় এ-বাস্তবতা আরো সুস্পষ্ট : 'সেই শস্য অগণন মানষের শব।' বাইরের বস্তু কীভাবে হৃদয়ে চিত্রের অদ্ভুত রূপে রূপান্তরিত হয় জীবনানন্দের কাব্যে 'শকুন' কবিতায় তার উদাহরণ।

'রূপসী বাংলা'র কবিতায় প্রকৃতি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই ধরা পড়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে নক্ষত্র থাকলেও কবি পৃথিবীর ক্ষেতেই সবুজ ফসল হয়ে জন্মাচ্ছেন অনবরত; অন্ধকারে শিশিরের জলের গান, তার শীত গন্ধ, কুয়াশার কুমারী আঙুলের আদর, ঘ্রাণ ও স্পর্শ, আকাশে কাস্তের চাঁদের আলোর প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো চুম্বন, তাঁকে ব্যথা দেয়; কিন্তু ব্যথার সুখ পান; প্রকৃতির উপাদানে দৃশ্য গন্ধ বর্ণ স্পর্শ ঘ্রাণে পৃথিবীর চিত্রছবি বেদনায় কবি একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন। পিপাসা ও ক্ষুধিতের ভাষা বুকে করেই পৃথিবীর শস্যক্ষেতে বারবার ঝরে পড়ে, ফলে উঠতে চেয়েছেন নক্ষত্রের আলো চোখে নিয়ে। এমনি করে আকাশমাটির যোগেই তাঁর দেহ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে পৃথিবীর মতো।

এই বোধ আরো তীব্র, সংহত নিবিড় বেদনা ও কল্পনাময় হয়ে উঠেছে 'রূপসী বাংলা'য়, প্রকৃতির রূপের ভালোবাসার মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে ও সামঞ্জস্যে, এক স্তব্ধ শান্তির মৃত্যুবোধ নিয়ে আসে। 'রূপসী বাংলা'র কবিতায় জীবনানন্দেব রোম্যাণ্টিক কবিসত্তার সারাৎসার বিচিত্র বর্ণে রূপায়িত হয়েছে এখানে। সেই সঙ্গে দেশের ঐতিহ্য রূপকথা কিংবদন্তি ইতিহাস পুরাণ এর মধ্যে মিশে একটি সামগ্রিক দিব্য জ্যোতির্ময়ী বেদনাবিধুর নারী ও দেশরূপে আমাদের সকল অশান্তিকে দূর করে দিয়ে নির্জনে হৃদয়ের স্তব্ধতায় শান্ত করে দেয়। আধুনিক চেতনায় যে-চৈতন্য হৃদয়মনের বিরোধ আনে, এখানে রোম্যাণ্টিক জীবনানন্দ সেই বিরোধ পরিহার করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন।

এই প্রকৃতিচেতনার গভীরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ সুচিহ্নিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ফেলে-আসা প্রাণকে খুঁজতেই, যে-প্রাণ প্রথমে সমুদ্রের জলে অ্যামিবা হয়ে জন্মেছিলো. নদীর জলে কান পেতে থাকেন, পাতার মর্মরেতে প্রাণের কাঁপন শুনতে পান, ফুলের ভাষা বুঝতে পারলেই, তাঁর মনে হয়েছে সন্ধ্যাতারার পারের পথ, অসীমের লক্ষ্য, তিনি খুঁজে পাবেন।

'রূপসী বাংলা'র সনেটগুলিও ফর্মের দিক থেকে অভিনব ও স্বতন্ত্র: অক্ষরবৃত্তের বাইশ মাত্রার পঙ্‌ক্তির প্রবহমানতা ব্যবহার করেছেন পেত্রার্কার মিলের অনুসরণে, কখখক কখখক। ষট্‌কেই তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন মিলে : 'আবার আসিব ফিরে', কবিতার ষট্‌কে খগ খগ ঘঘ। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির মিল শেক্‌স্‌পিয়রের রীতি স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' সনেটে চতষ্ক ও ষট্‌ক পেত্রার্কীয়, কখখক-কখখক-গঘঙ-গঘঙ। সবচেয়ে আশ্চর্য 'তের্জারিমা'র প্যাটার্নে ছাব্বিশ মাত্রার সনেট রচনা করেছেন 'বনলতা সেন' কাব্যে 'পথ হাঁটা' কবিতায়। জীবনানন্দের আবেগ এতো বিস্তার ও প্রসার চায়, করুণ বেদনায় এলিয়ে যেতে বাধ্য হয়. দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি ও বাক্যের প্রসার অনিবার্য হয়ে ওঠে. তাঁর অনুভূতি গদ্যের ছন্দস্পন্দনকে মিলিয়ে নিতে চায়, গদ্যের ছন্দস্পন্দে কবিতা কিছু লিখলেও অক্ষরবৃত্তের ভাঙা রূপই তাঁর অভীষ্ট সুরকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারে। ইয়েট্‌স্‌ যেমন নাটক রচনা করে কাব্যে গদ্যের দৃঢ়তা ও সুর এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস সনেটে সংহত হয়ে উঠেছিলো, জীবনানন্দের এই সনেটও তাঁর পরবর্তী কবিতার রূপগঠনের সংহতিতে সাহায্য করেছে। এমনকি অনেক সময় চতুষ্ক ও ষট্‌কের প্রভেদও মানেন নি কোথাও।

'রূপসী বাংলা' চিরন্তন ও আবহমানকালের বাঙালির শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা, জন্ম-জন্মান্তরে এই পৃথিবীতে এসে রূপের ও ভালোবাসার পিপাসা মেটানোর বোধ, সর্বাস্তির চেতনা ও প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা চিত্রিত হয়েছে; এই বাসনার মধ্যে প্লেটো বা হেগেলের পরমের স্পর্শ নেই, আছে জীবন ও জগৎকে গভীর করে পাবার ও উপলব্ধি করার আকূতি। তাই ধানসিরি নদী, শঙ্খচিল, শালিখ, ভোরের কাক, কার্ত্তিকের নবান্ন, কুয়াশা, কাঁঠালছায়া, হাঁস, কিশোরীর ঘুঙুর, কলমির গন্ধ-ভরা জল, জলাঙির ঢেউ, সবুজ করুণ ডাঙা, সুদর্শন, লক্ষ্মীপ্যাঁচা, বক, ছেঁড়া পালে ডিঙা—সব মিলে কবির শরীর নতুন হয়ে উঠছে বাংলার রূপে। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।' এই বোধ জীবনানন্দেরও, রবীন্দ্রনাথ বস্তু থেকে নির্যাসময় অনুভূতি দীপিত করে তোলেন গানে, জীবনানন্দ প্রকৃতির বস্তুর গন্ধ ঘ্রাণ শব্দ রূপ কোমলতার গানের মাধুর্যে মরিসের নক্‌শার মতোই ফুটিয়ে তোলেন শব্দের গন্ধে। ডুমুর গাছের ছাতার মতোন বড়ো পাতা, তার নীচে দোয়েল পাখি, জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল, অশ্বত্থের সারি, ফণিমনসার ঝোপে শটিবনের ছায়া রূপের মুগ্ধতা ও শান্তি তৈরি করেছে, তা থেকেই কবির মন চলে গেছে আবহমানকালের চাঁদ ও বেহুলার কাহিনীতে। বেহুলাই রূপসী বাংলা হয়ে উঠেছে প্রকৃতির বিচিত্র উপাদান শরীরে ও চেতনায় নিয়ে : 'বাংলার নদী মাঠ ভাটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।'

'বনলতা সেন' জীবনানন্দের কাব্যের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যবাহী; চিত্রকল্প রূপগঠনের গাঢ় সংহতিতে, প্রতীকের ও স্বপ্নজগতের সঙ্গে বাস্তবের যথাযথ সংরাগময় সংগতি ও সংস্থিতিতে, সেই সঙ্গে উপলব্ধ অনুভূতির জটিল অনুষঙ্গময় বিচিত্রতায়। 'বনলতা সেন' যেমন তাঁর প্রেমচেতনাকে প্রকাশ করেছে, সেই প্রেমচেতনার মধ্যে অতীত ইতিহাস, সময়, কালচেতনা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, মন্ময় আদর্শজাত রোম্যাণ্টিক সারাৎসার মিশে কবিচিত্তের প্রাণনার ও প্রেরণায় রূপময়ী ছায়াময় বিভা হয়ে উঠেছে, শেলি'র 'এপিসাইকি' বা 'অ্যানিমা'র মতো। 'এপিসাইকিডিয়নে' শেলি বলেছেন : সে আমাকে দেখতে পেলো, জীবনের কঠিন পথে আগন্তুক, পথিক, মৃত্যুর দিকে আমাকে লুব্ধ করলো, দিনের পাশে রাত্রি, বসন্তের পাশে শীত, অথবা দ্রুত আশার পাশে দুঃখ-আলোর জীবনে শান্তিতে চালিয়ে নিলো। যখন জীবনের কঠিন পথে এই নারীর আকস্মিক দেখা পাওয়া যায়, তখন মৃত্যু, দিনরাত্রির কালের আবর্তন, ষড় ঋতু, আশা দুঃখ সব মিলে আলোময় জীবনশান্তির পূর্ণ প্রতীক হয়ে ওঠে। জীবনানন্দেরও কবিতায় 'অন্ধকার,' যে-অন্ধকার সৃষ্টির আদি-উৎসে মৃত্যুর শান্তি ও পবিত্রতা নিয়ে স্থিত। এই বোধ তিনি পো-এর কবিতার মধ্যেই পেয়েছিলেন, জীবনের জীর্ণ পথে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে হেলেনের মুখ দেখে যে-ঘর পেয়েছিলেন কবি, সেই ঘরে হীরের প্রদীপ জ্বালিয়ে হেলেনকে দেখতে গিয়ে তাঁর 'সাইকি' বা 'অ্যানিমাকে'ই দেখে চমকে উঠে বলেছিলেন : 'আঃ, আত্মপ্রতিচ্ছবি, জীবনের উৎস থেকে উঠে এসেছে, যে-উৎস পবিত্র দেশ।' এই অর্থেই 'সাইকি' শব্দের ব্যবহার পো-এর কবিতায়। তবে জীবনানন্দের কবিতায় চিত্ররূপ ধ্বনিসুর সংগীতের কুয়াশাময় নক্ষত্রের আলোর জাদু এতো মোহময়, সেখানে পো-এর কবিতা ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। ওখানেও পৌরাণিক হেলেনের সঙ্গে প্রেমের বর্তমান নারী 'সাইকি'তে এক হয়ে গেছে।

জীবনানন্দ বনলতা শব্দে বাস্তব নারীর শারীর রূপের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ময়তাকে যুক্ত করেছেন বনের লতার প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে। তাই প্রেম ও প্রকৃতি এখানে একাত্ম; তার পরেই ইতিহাসের ও ভৌগোলিক বিস্তার। অতীত ও দেশকালের বিস্তার পেরিয়ে বর্তমানে। এই বর্তমানে সে ক্লান্ত, কারণ চারদিকে জীবনের সমুদ্রে তরঙ্গবিক্ষোভময় ফেনা। এই অশান্ত অস্থিরতার মধ্যে এই দু দণ্ডের শান্তি ঐ প্রেমের নারী ও আকাঙ্ক্ষার নারীই দিয়েছিলো। আলোর উদ্‌ভাস, নক্ষত্রের আলো রোজ রোজ জেগে থাকে না, দু দণ্ডের শান্তিই চিরকালের শান্তি হয়ে ওঠে ব্রাউনিঙের মতো, রবীন্দ্রনাথের 'এক রাত্রি'র মতো। অতীতের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে স্বপ্নের গন্ধে তাকে দেখে, তার রূপের বর্ণনায় অতীত স্বপ্নের মায়া সৃষ্টি করেছে, সংগীত চিত্র ও ভাস্কর্যে রূপময় হয়ে উঠেছে 'অ্যানিমা' এবং বাস্তব নারী দূরে সরে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে : 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, / মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।' প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পথিক সত্তা ও নাবিক সত্তা থাকে, জীবনানন্দের কবিতায় নাবিক ও সমুদ্র বার বার এসেছে, শেষে 'যাত্রী' শব্দ। সমুদ্রের ওপর দিশাহারা হালভাঙা নাবিক যেমন দারুচিনি দ্বীপের ভেতর ঘাসের দেশ চোখে দেখে, সে তখন আশ্রয় ও আকাঙ্ক্ষায় নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরে পায়। সারাদিন প্রখর রৌদ্রে উড়ে পাখি যেমন সন্ধ্যার নীড়ে ফিরে শান্তি পায়, কবির পথিক ও নাবিক সত্তা আকাঙ্ক্ষার নারীর চোখে আশ্রয় নীড় শান্তি জীবন ও আলো খুঁজে পেয়েছে। তৃতীয়

স্তবকে আগের দুটি স্তবকের সারাৎসার নিয়ে পরিণামকে তাৎপর্যময় করেছেন শব্দের কোমল সংগীতে, চিত্রের সুরের রঙিন মোহময়তায়; শিশিরের শব্দ, সুর, সন্ধ্যার নীরব নেমে আসা, মুছে ফেলা রৌদ্রের গন্ধ, চিলের ডানা, মৃদু অন্ধকারে পৃথিবীর পাণ্ডুলিপি, মানুষের আকাঙ্ক্ষার গল্প, জোনাকির ঝিলমিল রঙের স্বপ্ন, সব পাখি সব নদীর ফিরে-আসা—জীবনের পূর্ণতা নিয়ে এলো, লেনা-দেনার সংসার মুছে গেলো, অন্ধকার জেগে উঠলো, এই অন্ধকারই হৃদয়ে নিহিত গভীর উজ্জ্বল বনলতা; বনলতা ও অন্ধকার এখানে এক, সৃষ্টির আদি অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে। আলোর রহস্যময়ী সাহোদরার মতো হতে পারে অন্ধকার। এই সৃষ্টির আদি-উৎসের অন্ধকারময় নারীকেও জীবনানন্দ সারা জীবন খুঁজেছেন : 'তবু গভীর বিশ্বাসে আমি টের পাই—তুমি আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।'

এখানেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মতো হেমন্তের রিক্ত প্রকৃতি প্রতীকিত এবং বর্তমান জীবনের চিন্তা ও জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রকৃতির গভীর সবুজ ঘাসের ফড়িঙের নীচে শুয়ে থাকেন। এই তিনটিই মূল ম্যোটিফ, প্রেমের মধ্যে এর বিস্তার। পথচলার ক্লান্তি থেকে শান্তি ও ঘুমের জগতে যাবার আকাঙ্ক্ষা আরো অনেক কবিতায়। বর্তমানের সঙ্গে ইতিহাসের অতীত ব্যাবিলন মিশে যায় জন্ম-জন্মান্তরে। এবং পথহাঁটা কবিতার মধ্যেই শহরের চিত্রকল্প ও ছবি আসছে, আগে শুধু ছিলো পল্লির, মেঠো চাঁদ, মাঠ, ইঁদুর, গাছ, শস্য, নদী, আকাশ, পাখি, জল, খড়। এখন ইট বাড়ি সাইনবোর্ড জানলা কপাট ছাদ গ্যাসলাইট মনুমেন্ট মিনার চুরুট—ছবি হিশেবে আসছে। তবু পৃথিবীকে স্বপ্নের জাদুর দেশ মনে হয় কবির, এই রূপই কবিকে জীবনের স্পৃহা ও উৎসাহ এনে দিয়েছে : 'পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।' তাই বাতাসে বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা। আর সব মিলে, আলো প্রেম নির্জনতা মিশে গিয়ে মরণের পারে অন্ধকার জেগে ওঠে। তিরিশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত জীবনানন্দই প্রথম এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়েছেন 'আমাকে তমি' কবিতায়। অন্ধকারে ঘমিয়ে-পড়া, আবার সেখান থেকে নদীর ছলচ্ছল শব্দে জেগে ওঠা, সমুদ্রের ঢেউ-এর ওঠা-নামা তার চৈতন্য ও জীবনকে ছেয়ে রেখেছে। এই ঘুম মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা, অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে হঠাৎ ভোবের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে বুঝতে পেরেছেন আবার। এই পৃথিবীর কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে বলেই অন্ধকারে ঘুমোতে চান। সংগ্রামের শক্তি কবি এখনো সংগ্রহ করতে পারেন নি। ঘোষণা করেছেন : 'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত।' হয়তো পরিপূর্ণতার জন্যেই।

'সুচেতনা' বনলতা সেনের অন্য এক রূপ, সে-ও কবির আকাঙ্ক্ষার, বিকেলের নক্ষত্রের কাছে দূরতম দ্বীপ, হৃদয়ের গভীর পবিত্র নির্জনতা, যেখানে পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা শেষ হয়ে গিয়ে চিরন্তন জ্যোতির্ময় সত্তা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। এখানেও রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে তিনি নিহত প্রাণ দেখেছেন, দেখেছেন পৃথিবীর গভীরতম অসুখ। এই অসুখ মানুষ মানুষকে হত্যা করায়, শোষণ করায়, সমাজতান্ত্রিক বোধেই দেখেছেন, জাহাজে করে বন্দরে যে-য[illegible]ল আসে, সেই শস্য অসংখ্য মানষের শব, শব থেকেই স্বর্ণের বিস্ময়

উৎসারিত। এই সব দেখেও আমাদের প্রাণ মূক, বুদ্ধের অহিংসার আদর্শে। কিন্তু রণক্লান্ত কাজের আহ্বান জীবনে রয়েই চলেছে। শস্য শব হয় তখনই যখন কর্মে উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য পুঁজিবাদীরা শোষণ করে নেয়, শ্রমজাত ফসলে বঞ্চিত মানুষের সুচেতনা নিয়ে, অনেক দূরের অন্তিম প্রভাতের জন্যে এ-যুগের ক্লান্ত মানুষের ক্লান্তিহীন পরিশ্রম প্রয়োজন। এ-জীবনে অনেক নৈরাশ্য অনেক জ্বালা ব্যর্থতা ; তার পরেই এখান থেকে 'তবু'র শুরু; তবু এখানে এসে তিনি বুঝেছেন জীবনে গভীরতর লাভ হয়েছে। সমুজ্জ্বল ভোরে শিশিরে শরীর স্পর্শ করেছে, অতীতের তাৎপর্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও যুক্ত হয় এ-জীবনে; তার ফলেই শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়। কবির এই 'সুচেতনা' মানবিক বোধে ও চেতনায় উজ্জ্বল, নতুন সমাজগঠনে উদ্দীপিত, সেই সঙ্গে প্রকৃতির নির্জনতা ও গভীর বোধযুক্ত। এবং জীবনানন্দের কাব্যে পরিবর্তন ও উত্তরণ এখান থেকেই।

'মহাপৃথিবী'র নামকরণেই স্পষ্ট কবি ব্যক্তিগত জগৎ থেকে বেরিয়ে বিশ্বের মধ্যে মুক্তি খুঁজছেন, তার শুরু 'সুচতনা' কবিতায়ই; কিন্তু জীবনানন্দের আমরণ মৃত্যুবোধের হতাশা ও ক্ষয় এখানেও আছে : 'মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে।' এই স্বপ্ন ও মৃত্যুর নক্‌শার বুনোন এখানেও এই জগৎ ভরে আছে, মৃতবৎসা, কুকুর, মাতাল ও ভিখিরির দল। এই পৃথিবীতে টিকে থাকবার অর্থ ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আনন্দ। আজকে মানুষই সিংহ হয়েছে, যে-সিংহ আগে :

> বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কতোবার দেখলাম
> কতো বালিকাকে নিয়ে গেল বাঘ—জঙ্গলের অন্ধকারে;
> কতোবার হটেন্‌টট জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
> আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম;

শহরের অভিজ্ঞতা এসেছে গভীর হয়ে এখানে, শহরে আশা-নিরাশার কথাও কাজের ভয়াবহ হৃত চক্ষু জেগে থাকে, আর কবির মনের মধ্যে বিস্বাদ, এই বিস্বাদে সমস্ত কিছু ছাই হয়ে পুড়ে যায়, তবু আকাশে সূর্য উঠতে দেখেন, শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু মিনারের ওপরই নক্ষত্রদের দেখতে পান বুনোহাঁসের মতো দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে। শহরের মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছেন না, ট্রামলাইনকে দেখে মনে হচ্ছে আদিম সর্পিণী, সর্পিণীর রক্তে বিষাক্ত বিস্বাদ তাঁকে স্পর্শ করে ও রক্তে নিয়ে তিনি হাঁটছেন। তাই আদিম প্রকৃতির সৌন্দর্যের স্মৃতি তাঁকে বারবার ভোলায়।

এখানেও প্রেম এসেছে হারানো স্মৃতি নিয়ে, কুড়ি বছর পরেও নারীকে দেখবার আকাঙক্ষা জাগে, আকাঙক্ষা জাগলেও মনে হয় সোনালি চিলকে শিশির—সন্ধ্যারাত্রি, শিকার করে নিয়ে গেছে অন্ধকারে। এই নারীর সঙ্গে কখনো হঠাৎ দেখা হয়েছে, দেখে মনে হয়েছিলো রাত্রি থেকে উৎসারিত জলের মতো শান্তি সেই আগের মহিলার মন স্নিগ্ধ করেছে, তার স্নেহে দ্রোণফুলের করুণ মাধুর্য জাগে, একটু পরেই তিনি অনুভব করেন, এই নারীর শরীরে নদী নেই; তার হৃদয়ের কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে, তার নক্ষত্র চুরি করে নিয়েছে, সেই নক্ষত্র আর ফিরে আসবে না। জীবনানন্দের কবিতায় সংলাপের

নাটকীয়তার চেয়ে চরিত্র ও উপলব্ধির গভীরতা করুণ মাধুর্যে প্রকাশ পায়। কবিতার বর্ণনায় তাতে নতুন সুর লাগে। শিল্পের প্রতি নারীর নির্বোধ চেতনার কথা জীবনানন্দ বলেছেন, এদের মনে হয়েছে বধির নিশ্চল সোনার পিত্তলমূর্তি, সুন্দরীরা সসম্মানে আদ্ধেক কথা শোনে, কিন্তু কিছুই বোঝে না, যেহেতু মূর্খ। তবু এদেরই কানে কবি ও শিল্পীরা নক্ষত্র ও বেদনার গানের ঐশ্বর্য ঢেলে দেয়। বুদ্ধদেবের বোদ্‌লেয়ারের অনুচিকীর্ষা এখান থেকেই।

নক্ষত্র জীবনানন্দের কাছে ব্যথা বেদনা স্বপ্ন প্রেমের ও হৃদয়ের সারাৎসার রূপে প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'হাওয়ায় রাত' কবিতায় কবিকল্পনা অসীম আকাশে উধাও হয়ে গেছে হাওয়ার উচ্ছ্বাসে। বাস্তব জগতের বন্ধনহারা হয়েছে বলেই আধো ঘুমের স্বপ্নের অবস্থায় কবি দেখতে পেয়েছেন মৃত নক্ষত্রেরা তাঁর কাছে ভিড় করে এসেছে, প্রিয় মৃতদের ধূসর মুখ ভেসে উঠেছে, মৃত আকাশ ও মৃত নক্ষত্র তাদের আত্মা নিয়ে উপস্থিত, ইতিহাসের প্রাচীন দেশের রূপসীরা এসেছে মৃত্যুকে দলিত করে জীবনের ও প্রেমের জয় প্রকাশ করবার জন্যে, আর কবির মনে হয়েছে এসব নীল অত্যাচার যা তাঁকে ছিঁড়ে ফেলেছে বাস্তব পৃথিবীর বন্ধন থেকে। এই সব মৃতের স্পর্শেই কবির হৃদয় ভরে গেছে সবুজ ঘাসের গন্ধে, বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে, সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে, 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়', জীবনের আদিমতা যেন ফিরে পেয়েছেন তিনি : 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে।' মৃতের স্পর্শেই যে-জীবনেব পরিপূর্ণতা, ইয়েট্‌সের 'অল্‌ সোল্‌'স্‌ নাইট' কবিতায় যা ব্যক্ত, এখানে আভাস তার আছে। কবির উধাও কল্পনায় চিত্রকল্পে অভিনবত্ব এই কবিতার বৈশিষ্ট্য। অন্ধকারকে স্পষ্ট জীবন্ত ও প্রাণময় করা হয়েছে মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনে, এই অন্ধকারকে আরো প্রসারিত করা হয়েছে বাঘিনীর সজীব রোমশ উচ্ছ্বাস দিয়ে। সুতরাং স্পষ্ট বস্তুরূপের সঙ্গে ক্রিয়াজাত বিশেষ্যের শব্দ, তার সঙ্গে বিমূর্ত বিশেষ্যের আবেগ মিশে গেছে। তাই অন্ধকার আর অন্ধকার থাকছে না, প্রাণের ও আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সজীব সত্তা হয়ে উঠেছে। নক্ষত্রে ও আকাশের ছবিও সুন্দর । অন্ধকার রাত্রে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিলো, সমস্ত নক্ষত্রেরা আকাশের নক্ষত্রকে পৃথিবীর বস্তু দিয়ে কাছে টেনে এনেছে স্নিগ্ধ করুণ বিষণ্ণতায়; বিশাল আকাশকে ব্যাবিলনের রানী ও চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় প্রাণিহত্যার হিংস্রতা ও কামনার রক্তলাল ও জ্যোৎস্না রাতের কোমলতা ও নারীর বাসনা ও অহংকার একসঙ্গে মিশে গেছে। আকাশের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে জ্যোৎস্নারাত, ব্যাবিলনের রানী, চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল। পঙ্‌ক্তির বিস্তারতায় আবেগের উচ্ছ্বাস প্রসারিত হয়েছে। বাতাসের উপমায় বলেছেন : 'সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।' উপমার এই ছবির মধ্যেই জীবনানন্দের জগৎ ও জীবনের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছ, সিংহের হুংকারের আদিমতার সঙ্গে জেব্রার পালিয়ে যাবার অসহায়তা ও করুণ রূপ, সেই সঙ্গে হরিৎ প্রান্তরের সবুজ মায়ার ভালোবাসা। জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতিতে এমনি বিরোধের উপাদান একসঙ্গে মিশে থাকে এখন থেকে। আগেও বিরোধ ছিলো, তবে পাশাপাশি, এমনি জৈব মিলনে এক হয়ে ছিলো না। শিল্পরূপের এই পার্থক্য লক্ষ করবার মতো।

'নগ্ন নির্জন হাত' হাতের বিশেষণের মধ্যেই নগ্নতা ও নির্জনতার বিশুদ্ধ রূপ স্পষ্ট, হাতে তা অবয়ব পেয়েছে। এখানে যে-অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে সে সৃষ্টির অন্ধকার। তাই আলো ও অন্ধকার এখানে দিন ও রাত্রির মতো বেদের উষা ও রাত্রির মতো রহস্যময়ী সহোদরা। এই অন্ধকার সেই মিস্টিক রহস্য, যাকে দেখতে পাওয়া যায় না, অথচ সেই নারীর জন্যে বেদনার আঘাত জাগে। সেই সঙ্গেই তাঁর মন চলে গেছে স্বপ্নের সেই বিলুপ্ত নগরীতে, সেই নগরীর ধূসর প্রাসাদের রূপ, অর্থাৎ স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষার জগৎ জেগে ওঠে। ইয়েট্সের 'বাইজান্শিঅ্যামে'র মতোই এই বিলুপ্ত নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন, ভারত-সাগরের তীরে কিংবা ভূমধ্যসাগরের ধারে নতুন টায়ার সিন্ধুর তীরে যে-বিলুপ্ত নগরী তার প্রাসাদ নিয়ে উজ্জ্বল ছিলো। প্রাসাদের আসবাবে ছিলো পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন সমুদ্রের নিটোল মুক্তা প্রবাল, সেই সঙ্গে কবির বিলুপ্ত হৃদয়। মৃত চোখ, বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, আর নারী। এই সব নিয়েই তাঁর স্বপ্নের জগৎ, সৌন্দর্য, আজ যা হারিয়ে গেছে, কল্পনায় ও স্বপ্নে যাকে দেখতে পান। দেখতে পান কমলা রঙের রোদ, মেহগনির ছায়াঘন পল্লব, আর নারীর মুখ। এবার চিত্রশিল্পীর মতো আরো বিচিত্র ছবি উজ্জ্বল বর্ণে এঁকেছেন : 'ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায় কক্ষ কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ কক্ষান্তরের / ক্ষণিক আভাস।' এই ক্ষণিক আভাস সৌন্দর্য ও শিল্পের চিরন্তনতা : 'আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।' এই সমস্ত রূপের রঙের বিচিত্রতায় নগ্নতার ও নির্জনতার বিশুদ্ধতাই জেগে উঠেছে। এই কবিতায় জীবনানন্দ যেন শব্দে ছবি এঁকেছেন উজ্জ্বল রঙে, মাতিসের মতো, গগাঁর মতো : 'পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ, / রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।' অদ্ভুত প্যাশন। রক্তিম গেলাশে তরমুজ মদ ইয়েট্সের এই পঙ্‌ক্তিটির আভাস আনে মনে : And two long glasses brimmed with muscatel Bubble upon the table. সুতরাং এই কবিতার অন্ধকার স্বপ্নের সৃষ্টির ও সৌন্দর্যের বিশুদ্ধতার উৎস।

সমাজবাস্তবতার, আধুনিক জীবনের শোষণের কৎসিত অন্ধকারের কদর্যতা 'বিড়াল' কবিতায় তীব্র ব্যঙ্গ ও ধিক্কারে জীবনানন্দ প্রকাশ করেছেন। এই বিড়ালের মতো মানুষ সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাছের কাঁটার সফলতা পেলে কিছুক্ষণের জন্যে সে নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকে, তারপর তার স্বাভাবিক প্রকৃতিতেই সৌন্দর্যের কৃষ্ণচূড়াকে নখে আঁচড়ায়; সূর্যকে এমনি আঁচড় দেবার জন্যে তার পেছনে পেছনে চলে; আর হেমন্তের সন্ধ্যায় শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে সমস্ত পৃথিবীতে অন্ধকার ছড়িয়ে দিলো। বেড়ালের মতো লোভী সভ্যতার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে লুপ্ত। এই ছবির মধ্যে পরাবাস্তবতার ছোঁয়াচ আছে, হয়তো কিছু অ্যাব্সার্ডিটির অবচেতন চিত্রকল্প।

'নিরালোক' কবিতায় জীবনানন্দের কবিতার ফর্ম ও স্টাইল চমৎকারভাবে ব্যক্ত।[১] নক্ষত্র ও প্রান্তর দুই-ই তাঁর দৃষ্টির সামনে প্রসারিত। প্রান্তরে চেয়ে দেখেন ধানের ক্ষেতের গন্ধ কবে যেন মুছে গেছে। বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা চারদিকে, ক্ষয় ছেয়ে গেছে, এবং

---

[১] 'তিমির হননের গান' কবিতায় এর ব্যাখ্যা জীবনানন্দ নিজেই দিয়েছেন 'সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।'

নক্ষত্রের আলোও নিভে গেছে। এই বিক্ষত খড়ের বোঝা, ক্ষয় বুকে নিয়েই কবির ঘুম পায়। জীবনের মধ্যেই মৃত্যু এমনি নিহিত। ফাল্গুনের সন্ধ্যার রাত্রি-আকাশে শুয়ে মরণকে অনুভব করছেন কবি। কবির মনেই মৃত্যু, অথচ শ্রমক্লান্ত হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া, যে-সাধারণ মানুষের প্রতীক, ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে ঘাস খেয়ে যায়, তার কোনো ব্যথা নেই। প্রকৃতিতে প্রাণীতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। অথচ কবির অনুভূতিতে নিরাশা ও প্রশ্নাকুলতা : 'কোথাও উদ্যম নাই, কোথাও আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাবো?' এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বপ্রকৃতি দিয়েছে যে-নিজের অন্তরের মধ্যে গিয়ে মানুষ শান্তি পেতে পারে, অথবা প্রকৃতির মধ্যে একান্ত হয়ে শান্তি, অথবা শস্য-উৎপাদনের মধ্যে যে-শ্রম, তাতেই মানুষের মুক্তি। এমনিভাবে কবিতার সমাপ্তি এসেছে ক্ষয়কে ছাড়িয়ে জীবনের চলার প্রতীকে ও ইঙ্গিতে। পেছনে সাপের খোলশ, নালা খলখল অন্ধকার অথচ শান্তি, চোখের সামনে সোনালি খড়ের বোঝা নিয়ে গরুর গাড়ি চলে যায়—অনন্ত শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস, এর মৃত্যু নেই : 'যদিও মরেছে ঢের গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ,—তবুও তার মৃত্যু নাই মুখে।' এই ক্ষয় ও মৃত্যুময় জীবনের অনন্ত যাত্রার ইতিহাসে মানষের জয়ই অনুভূতির যুক্তির পারম্পর্যে ঐক্য লাভ করেছে নিবিড় সংহতিতে। 'সাতটি তারার তিমির' নামকরণে মালার্মের একটি শব্দগুচ্ছের ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। এবং এই নামের মধ্যেই তাঁর কাব্যপরিণাম এবং বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত। সাতটি তারার আলো যেমন, তেমনি আলোর সঙ্গে তার পাশে তিমির। এই আলোআঁধার যেন দুটি দড়ির মতো পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে, সিঁড়ির মতো, যেমন ডি. এন্. এ. এবং আর. এন্. এ. থাকে জিনের মধ্যে এবং দুয়ের মধ্যে দিয়ে প্রোটিন গড়ে ওঠে, জীবনানন্দের শেষের যুগের কবিতার আশাবাদেও এই রকম অন্ধকার আলোর সঙ্গে জড়িত : 'মকরক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন।' রাত ও তারা একসঙ্গে অন্বিত। অন্ধকারহীন সহজ আলো তরল আশাবাদ, যা রবীন্দ্রকাব্যে আছে, তা জীবনানন্দে দেখা যায় না। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ-চিত্র তার এই সব চিত্রকল্পে :

> নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
> সজন নির্জন হয়ে থেকে
> ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
> উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে;
> অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
> বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
> এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;
> এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব : আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

ভাষায় এই দুর্বোধ্য ও কঠিনতা এবং জটিলতা। তাঁর চেতনার জটিল ঘনিষ্ঠ রূপকেই ব্যক্ত করছে, ভাষার মধ্যেই কবির চারিত্র্য ও চৈতন্যের জটিলতা, অন্ধকারও আলোর অন্তর্গাঢ় সংমিশ্রণ দেখা যাচ্ছে এখানে।

এখানে তিনি ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিকে, অথবা ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টিকে তাঁর চেতনায় জড়িয়ে নিয়েছেন, ব্যক্তিকে সমষ্টির মধ্যে, সময়ে, কালে ও ইতিহাসে সংহত করে জাতির ও কালের ধারাকে ধরতে চাইছেন :

'কেবলই ব্যক্তির—ব্যক্তির মৃত্যু শেষ করে দিয়ে আজ
আমরাও মরে গেছি সব'—
দলিলে না ম'রে তবু এরকম মৃত্যু অনুভব
করে তারা হৃদয়হীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ ক'রে দিতে চেয়ে যতোদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লায়মান হয়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের
অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

এই ব্যাপ্ত ইতিহাসের কথা বলেছেন, এই ব্যাপ্ত ইতিহাস দেশের জন্যে জাতির জন্যে সমষ্টিগত মানুষের বীরসংগ্রাম, বীরসংগ্রামের মধ্যেই রৌদ্রমাখা অন্ধকারে মানুষের দীপ্তি জেগে ওঠে। ইয়েট্‌সের ইমেজের অনুসরণেই জীবনানন্দ তাঁর চেতনার রূপ ব্যক্ত করেছেন 'সূর্যপ্রতিম' কবিতায়, যেখানে মৃত্যু ও করুণা একই সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে প্রতিভাত হওয়া যায়, সাঁকো ঘর বাড়ির সৃষ্টি হয় : 'মৃত্যু আর করুণার দুটো তরোয়াল আড়াআড়ি/ গড়ে ভেঙে নিতে চায় এই সব সাঁকো ঘর বাড়ি; / নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।' তিনি আশা ও আলোর কথা বললেও পৃথিবীর বালি রক্ত কালিমার, অন্ধকার গণিকার জন্যে ফাঁদ, প্রেমিকার জন্যে ফাঁকি এড়াতে পারেন নি, ফলে কোন্‌টা প্রধান হয়ে ওঠে অনুভূতিতে অনুমানে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, বুঝতে হয় 'তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।' এ অন্তরের অন্তর্গাঢ় দীপ্তি, এই দীপ্তি দিয়েই ব্যক্তির সমাজের জীবনের রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে গ্রিসে অলিভ বন 'উদ্‌ভাসিত করে দিতে হয়।' তাঁর রচনারীতি মালার্মের ইঙ্গিতের অনুষঙ্গে প্রতীক জাগিয়ে মায়া তৈরি করে, সৌন্দর্য না বলে, গ্রিসের অলিভ বন ব্যবহার কবেন, সমূদ্রের জায়গায় স্পন্দিত তরঙ্গ বসান, বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ না করে শুধু সন তারিখ বসান : সর্বজনীন ধারণা ও প্রতীক তৈরি করবার যে-পদ্ধতি ও চেষ্টা মালার্মের ছিলো, জীবনানন্দ 'কবিতার কথায়' তাকে উল্লেখ করেছেন নিজের ভাষায় : 'পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায়—'

এই ব্যাপ্ত ইতিহাসের চেতনাই 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : নিববধিকাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।' তিনি নিজেও বলেছিলেন : 'কবিতার অস্থি'র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা এবং মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' অস্থির ও স্থিরের সমন্বয়েই শাশ্বত দীপ্তির উদ্‌ভব। ইতিহাসের গতি এই অস্থিরতায়, শাশ্বত বোধ কালে। 'উত্তরপ্রবেশ', 'সময়ের কাছে', 'সূর্যপ্রতিম', 'দীপ্তি', 'মকরক্রান্তির রাতে', 'জনান্তিক', সৌর করোজ্জ্বল', 'মানুষের মৃত্যু হলে', 'হে হৃদয়'—প্রভৃতি কবিতায় জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনার প্রকাশ স্পষ্ট। বিমূর্ত ইতিহাসচেতনা একটি পাখির ও নারীব প্রতীকে ইঙ্গিতময়, কবি নিজেই বলেছেন : 'আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন।' এই ইতিহাসচেতনার একটি রূপ 'বিশুদ্ধ মুহূর্ত।' 'শতাব্দীর যে-কোনো / নটীর ঘরে/ নীলিমার থেকে কিছু নীচে / বিশুদ্ধ মুহূর্ত তার ঘুমের মতোন।' অথবা 'দীপ্তি', 'কেউ নেই—স্তব্ধতায়; তবুও হৃদয়ে দীপ্তি আছে' : 'চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ

কখনো ভোরের জনান্তিকে চোখে থেকে যায় আরো এক আভা' : 'আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর / হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিশ / হয়ে তুমি রয়ে গেছ।'

এই ইতিহাসচেতনাতেই তাঁর মনে হয়েছে তিনি আড়াই হাজার শতাব্দীর বয়েসী, সমস্ত বিশ্বের আড়াই হাজার বছরের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাঁর মধ্যে কখনো মনে হয়েছে তিনি নিজেই জনসাধারণ, আবার শোষিত মানুষের মতো মনে করেছেন তিনি উচ্ছিষ্ট। এই কাল বা ইতিহাসচেতনায় যে-নারীকে তিনি পেয়েছেন তাতে হেমন্তপ্রকৃতির ঝরাপালকের ক্ষয় শেষ হয়ে যেমন ফসলের উজ্জ্বলতা দেখা দিয়েছে, তেমনি হারানো নারীর ও হারানো প্রেমের যন্ত্রণা ও ক্ষত ভুলেছেন, যেমন ভুলেছিলেন দান্তে বিয়াত্রিচেকে নতুন করে পেয়ে, পেত্রার্কা পেয়েছিলেন লরার মধ্যে। এখানে কাব্যের মধ্যে কল্পনার ও রঙের চেয়ে চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই বেশি প্রকট হয়েছে। তাঁর ইতিহাসচেতনায় প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য শরীরে রক্তের মতো মিশে গেছে : 'হেমন্তের / অপরাহ্ণে পৃথিবীর মাঠের দিকে সহসা তাকালে/কোথাও শনের বনে—হলুদ রঙের খড়ে—চাষার আঙুলে/ গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের/অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুনে নেমে আসে;/প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে/ কী যেন সৌর ব্যবহারে এসে লেগে থাকে।' তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অবিরল ধারা : ...'তাদের পায়ের রেখার পথ/কাটে তারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান/সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে—দেখে; ... হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন/পিতাদের হাত থেকে ফিরে - ফিরতির মতো অন্তহীন/ সন্ততির সন্ততির হাতে/ কাজ করে চলে গেছে কতোদিন।' আর এসেছে ছোট বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড়, যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বুকে রেড়ির তেলের আলোর মতো মৃদু আশাবাদ নিয়ে পৃথিবীর পরাজিত মানুষের অংশীদার মাত্র। মানুষের পরাজয়ে নিজেদের জয়ের চেয়ে দীনতাকে বড়ো মনে করতো। হয়তো রামমোহনের কথা জীবনানন্দের স্মরণে ছিলো। এঁদের পাশে আরেক ধরনের মধ্যবিত্ত ছিলো, যাদের কাছে জয়পরাজয় সমান, তাদের সাধনার সফলতা মৃত্যুর পরই আসবে। পৃথিবীতে হেরে গেলেও কোনো ক্ষোভ নেই। জীবনানন্দ এদের ঘৃণা ও বিদ্রূপ করেছেন। আর এই সব উপাদান আরো জটিল হয়ে উঠেছে প্রেমের মধ্যে এই রহস্যময় বোধে : ...'ভাঙা চাঁদে / অর্ধসত্যে অর্ধনৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে ;' মধ্যবিত্ত ছাড়া মানুষের জীবনের মধ্যে ভীরু প্রাণও ছিলো : 'তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মত জীবিত।' তিনি জ্ঞানে ও মনীষায় জেনেছিলেন, আমাদের প্রবীণেরা আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে : 'আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধ সত্য বলে গেছে অর্ধমিথ্যার?' তিনি জেনেছেন মানবজীবনের সফলতা নক্ষত্রের দূরে রয়ে গেছে, রুক্ষ পৃথিবীতে জ্ঞান এখনো আসে নি সময়ের ব্যাপ্তির মতো। অতীতের এই জ্ঞান নিয়ে যখন বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকান, দেখতে পান :

> চারিদিক থেকে ঘিরে কেবলি বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
> রয়ে গেছে। নিজেকে কেবলি আত্মক্রীড়া করি; নীড়
> গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
> মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়
> পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যু শব্দ এসে
> ভয়াবহ ডাইনির মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই;

লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্ম শব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দু হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।

যাঁরা লীন হতে চান তাঁদের উত্তরেই লিখেছেন : 'এখনো পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে / ঘুরে যায়।' এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে তখন ইতিহাসচেতনায় প্রকাশ করেছেন পাখির প্রতীকে ; 'মকরসংক্রান্তির রাতে' কবিতাতেও এই চিত্রকল্প : 'কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে/নক্ষত্রে থেকে আরো নক্ষত্রে রাতে / আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে/আরো বড়ো বিষয়ের হাতে/সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে/কী এক গভীর সুসময়!' এই পাখি সাগর ও সূর্যের স্পর্শ নিয়ে মানুষের অনুভূতিতে হৃদয়ের প্রতীক হয় জ্যোতির পথের নিশানা নিয়ে। এতেই ইতিহাসের আলো ও অর্ঘ রচিত হয়, 'জনমানসের অনির্বচনীয় সঙ্কোচ' দেখা দেয়। কিন্তু সেই স্তর এখনো আসে নি, তবে বর্তমান ও অতীতের যোগে এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নিভিয়ে-জ্বালিয়ে ভবিষ্যতে উত্তরণ করতে হবে মানুষের জন্যে, এর মধ্যে প্রীতি ও স্বর্গ আছে; গতির থেকেও আছে প্রগতি। এই প্রগতিই স্থিরতর। স্থির বলেই এই প্রগতি দীন, প্রমাণ কঠিন। প্রেমিকের সঙ্গে ভালোবাসা যুক্ত হতে হবে। তাহলেই সময় বা ইতিহাস থেকে লব্ধ বহির্মুখ চেতনার দান নিয়ে অন্তর্দীপ্ত হবার সময় উপস্থিত হবে আমাদের। এতেই রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যের উপলব্ধি আসবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'সত্য যে কঠিন, / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—সে কখনো করে না বঞ্চনা।' 'সত্যেরে সে পায় / আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে। 'সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিশ' সকলের ; অধিগত হলে প্রাণ জানলার ফাঁক দিয়ে চোখের মতোন / অনিমেষ হয়ে থাকে নক্ষত্রে আকাশে তাকালে।' এই সত্যে ও অন্তর্দীপ্ত হবার উপলব্ধিতে জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথের কাছেই প্রেরণা পেয়েছেন, ব্রাহ্মধর্মের মন্ত্রের মধ্যে এতোকাল যা-ছিলো লুকিয়ে অন্ধকার গর্ভে রত্নের মতো। এর অনুসরণেই ইতিহাস ও প্রগতিসম্বন্ধে তাঁর চেতনা মার্কসের মতো হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের অনুষঙ্গে : 'হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে/কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছ উৎসবে।' সেখানেই তিনি শেলি'র মতো আলোকের পাখিকে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে পেয়ে, অথচ নতুন করে সূর্যবন্দনা ও তার প্রার্থনা করেছেন :

নব-নব মৃত্যু শব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;
জয় অস্ত সূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়। (সময়ের কাছে)

ক্লান্ত নিঃসঙ্গ, অস্থির, প্রেমে ও জীবনে ক্ষতবিক্ষত কবি বিমর্ষ বিষণ্ণতা ও বিশ্বাস-হীনতাজাত গ্লানি ও অবসাদের জমাট অন্ধকার সমুদ্র ও ভয়ের ও উদ্বেগের সংসার পেরিয়ে তিনি এক নতুন আলোকের জগতে এসে পৌঁছেছেন :

তবু
কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্বলে ওঠে রোদে!

উদয় সমাপ্ত হয়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হয়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে (তবু)

ব্যক্তির থেকে সমষ্টি, সমষ্টি থেকে বিশ্বব্যাপ্ত ইতিহাস ও মানবচেতনা বড়ো হয়ে উঠেছে : 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়; অতীতেব থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।' অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয়, তাই নাবিক ও যাত্রীর রূপকল্প বারবার ফিরে এসেছে এখানে : 'হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে, অকূলে/মানুষের পটভূমি হয়তো-বা শাশ্বত যাত্রীর।' এখানেও রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁর হাত ধরেছেন। এই যাত্রাপথে মানষকে অতীতের মনীষীর জ্ঞান, প্রকৃতির ভালোবাসা, ইয়েট্সের মতো ঘুরনো সিঁড়ির সভ্যতা, বিজ্ঞানের অবিষ্কার নিয়ে নীলিমার গায়ে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থে'র মতো এক মহীয়সী ও তার শিশুকে দেখতে হবে। বুঝতে হবে, সৃষ্টি অন্ধ শক্তির আবর্তন নয়, তার তাৎপর্য ও অর্থ আছে, শুধু কথা নয়, তাকে কাজ করতে হবে। বর্তমান এখনো বিপন্ন রক্তে-ভরা। শ্রমের বিনিময়ে ফসলের পরিবর্তে মানুষের শরীরের ওপর পুঁজিবাদীরা গোলা-বাড়ি উঁচু করে রাখে নিয়তির অন্ধকারে। এই সব গ্লানি জেনেও সমস্ত কিছুকে কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা করে হৃদয়কে আশায় উজ্জ্বল করে রাখতে হবে : 'না হলে এ ছাড়া/ কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।' মানুষের 'মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়;।'

ভেবে অবাক হতে হয় বাংলার ভারতের ও বিশ্বের বর্তমান ও অতীত ইতিহাসের আলো কতোখানি তিনি নিজের মধ্যে নিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে মানুষের চরিত্রের ও অনুভবের, বাংলার জীবনের, প্রকৃতির গাছগাছালি পাখি কীটপতঙ্গ পশু প্রাণীর জীবন কতোখানি নিখুঁত পর্যবেক্ষণে আয়ত্ত করেছিলেন। যে-কবি মৃত সারসের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন, তাঁর আত্মাকে অন্ধকারে লালিত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁর সূর্যপ্রার্থনা দান্তের নরক থেকে স্বর্গে উত্তরণের মতোই বিস্ময়কর :

আমি তবু বলি :
এখন যে-কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস,
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

তাই তিমির হননের গানই তাঁর এখনকার গান : এই কবিতার প্রথমেই শতাব্দীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছেন, আত্ম-পরিচয়ে জানিয়েছেন হ্রদে নদীর ঢেউ-এ সমুদ্রের জলে মানষের সঙ্গে দ-দণ্ড জলের মতো মিশে জীবনের আলোড়ন জেনেছিলেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতোই এই পৃথিবীর লেপ্টানো বাস্তবতার থেকে ঊর্ধ্বে অন্য এক

আকাশের মতো চোখ নিয়ে হেসে-খেলে দিন কাটিয়েছেন। স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি ছিলো না বলে ভালোবাসা ছিলো অগাধ। তাঁর মধ্য দিয়ে সাধারণ বাঙালি জীবনেরই প্রকাশ এ-সবে। কিন্তু আজকের জীবনে সে-সব মৃতের চোখের মতো। তাই চারিদিকে অন্ধকার, হেমন্তের কুয়াশা। সূর্যালোক নেই জেনেও সূর্যালোক মনোরম বলে হাসি পায়: কারণ সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র সাধারণ নিজেদের বিষাদের চেয়েও চেয়ে দেখে, ক্ষুধার্ত উপোসী ভিখিরিরা কালো কালো ছায়ার মতো; 'লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে / মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিশেব ডিঙিয়ে / নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে / নর্দমায় নেমে ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে—নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমোতে বা ম'রে যেতে জানে।' একদিকে এই সব ভিখিরিরা, অন্যদিকে মধ্যবিত্তমদির জগৎ, যাদের এই সব বেদনা নেই, ব্যক্তিগত অন্তহীন বেদনার পথে এরা শুধ কষ্ট পায়। সমাজের এই বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত যখন সূর্যালোককে প্রজ্ঞাময় বলে, তখন হাসিই উঠে আসে। কেননা, মধ্যবিত্তেরা তো জীবিত বা মৃত রমণীর কথা ভাবতে গিয়ে অন্ধকারে মহানগরীর মৃগনাভিকেই ভালোবাসে। এ-যেন জীবনানন্দের নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। এ-সব সত্ত্বেও দেশের সকলের প্রতিভূ হয়ে বলেছেন : মানুষ তিমিরবিলাসী নয়, তিমিরবিনাশী হতে চায়। এবং শেষ নিশ্চয়তার প্রতিষ্ঠা নিজের কাছে ও অন্যের কাছে : 'আমরা তো তিমিরবিনাশী।' এরকম পরিবর্তন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েও লক্ষণীয়। এই সমাজবাস্তবতা, বাস্তবের কুৎসিত জীবনের নরক অন্ধকার 'সাতটি তারার তিমিরে'র আরো অনেক কবিতায় ধরা পড়েছে, সেই সঙ্গে স্বপ্ন, অবচেতন, অস্বাভাবিকতা, রাগ, ক্রোধ, ব্যঙ্গ, ধিক্কার, তিক্ততা, আক্রোশ, প্রেমের ব্যর্থতা। 'রাত্রি', 'লঘ মহূর্ত', 'নাবিকী' প্রভৃতি আলোচনার যোগ্য। এই তিমিরবিনাশী হয়েই, 'বেলা অবেলা কালবেলা' মনের কুসংস্কার অন্ধকার পেরিয়ে, দুই দিকে দুই কালো ঢেউ-এর মাঝখানে তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধ মহূর্তের ক্ষণিক আলোয় জীবনানন্দ স্নাত হয়েছেন, এই আলো ইতিহাসচেতনার পরপারে। এই আলোরই প্রভাবে কবির আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী হয়ে ওঠে, নবীন সমাজের সংগীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের ভাষা অনাদি আলোর ভালোবাসায় সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে শ্যামল নীল ব্যথা হতে চায়। এই সংগীতেই তিনি জেগে উঠেছেন অনাদির সূর্য নীলিমায়, যেখানে পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর ধ্বনিত হয় :

আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

এ যেন আনন্দের উচ্ছ্বাস বর্ষার নদীর স্রোতের মতো উদ্বারিত হয়ে উঠেছে ভাষায় চিত্রে সংগীতে। নারীর ভালোবাসাই এখানে জন্ম-জন্মান্তরের অনাদি আলোর ভালোবাসায় রূপান্তরিত, সেই ভালোবাসাতেই তাঁর জাগরণ। এলিঅটের ও মিল্টনের কিছু আভাস থাকলেও জীবনানন্দের অনুভূতির পরিণামের সাব্লিমেশন বাংলাকাব্যে বিস্ময়কর। উজ্জ্বল আলোর স্রোতে সব কিছুকে ধরে আছেন তিনি, যেখানে ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে অন্তর্দীপ্তি এক হয়ে আছে; অন্তর্দীপ্তির সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত প্রত্যয়' এখানেই কিছুটা মিলে যায়।

জীবনানন্দের কবিতা অন্য কবির কবিতার চেয়ে কেন বিশেষভাবে পাঠককে আঁকড়ে ধরে রাখে, তাঁর কাব্যভাষা ও ভাষাভঙ্গির মধ্যেই এই রহস্য নিহিত আছে। এই ভাষায়ই তাঁর কল্পনা চিন্তা অনুভূতি ইনটুইশন স্বপ্ন অবচেতন অতিচেতন নিশ্চেতন—

এককথায় সমগ্র অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতাজাত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবির সংজ্ঞার্থেই এই সত্য নিহিত, রোম্যান্টিকদের মতো কল্পনাকেই তিনি প্রথমে স্থান দিয়েছেন, কল্পনার ভেতরে বসিয়েছেন চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে, সেই ইতিহাসকে আধুনিক জগতের সমস্ত কাব্যপ্রকরণ ও সারবত্তাকে : 'কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক জগতের নব-নব কাব্য বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে।' তার সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে মিলিয়ে নিলে তাঁর কাব্য কীভাবে জটিল রহস্যে জাদুময় হয়ে ওঠে সেই সত্য অনাবৃত হয় : 'কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক-এক সময় যেন থেকে যায়,—একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতোন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়ে, এবং ধীরে-ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।' এ যেন শেলি'র অভিজ্ঞতাই নতুন করে অভিজ্ঞতায় পেয়ে প্রকাশ করেছেন জীবনানন্দ। জীবনানন্দের কবিতার অনুভূতির মূলে প্রবেশ করলে দেখা যায়, তাতে তীব্র জ্বালা ও দাহ নেই, আলো আছে, তার গন্ধ আছে, তার রূপ আছে, কিন্তু জাদু ও মায়াময়: 'সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে / নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো জাদুবলে।' মালার্মের কাব্যরীতিও তাঁর রচনাপদ্ধতির মধ্যে ঢুকে গেছে : 'পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে এক নতুন জলের কল্পনা করা যায়—তাহলে পৃথিবীর এই দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন দ্বীপের কল্পনা করা যায়—তাহলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য।' কবিতা তাঁর নিজের ব্যক্তিসমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে জড়িত থেকে বাইরের ও নিজের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন, এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই নতুন সৃষ্টির বেদনা ও আনন্দ থেকে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, যে-কোনো আধুনিক কবির এইটেই লক্ষণ : 'কিন্তু কল্পনা-মনীষার সাহায্যে যেন কোনো মহান্—কোনো আদিম জননীর নিকট—যেন কোনো অদিতির নিকট প্রশ্ন, বারংবার প্রশ্নের বেদনা, প্রশ্নের তুচ্ছতা, বারংবার প্রতি যুগের স্তরে-স্তরে যেন কোনো নতুন সৃষ্টিবেদনা ও আনন্দ, অবশেষে একদিন সমস্ত চরাচরের ভিতর সকলের জন্যে কোনো সঙ্গতির সৌন্দর্য পাওয়া যাবে বলে।' এদিক থেকে দেখলে আধুনিকতার সমস্ত প্রশ্নই জীবনানন্দ তাঁর নিজের অনুভবে, নিজের মতো করে তুলেছেন, উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন, তাই ইতিহাস ও কালচেতনা তাঁর কাব্যের ভেতরে-বাইরে এমনভাবে মিশে আছে।

জীবনানন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর কাব্যে রোম্যান্টিক নির্জনতা, নিসর্গপ্রীতি, ইতিহাস ও সমাজচেতনা, নিশ্চেতনা, প্রতীকধর্মিতা, সুররেয়ালিজম্—এই সব কাব্যরীতির স্পর্শ আছে। কিন্তু সমস্ত কাব্য আগাগোড়া ভালোভাবে আস্বাদ করলে বোঝা যায় যে তাঁর কাব্যে চিত্রধর্মিতা, যা চিত্রকল্পবাদীদের কবিতায় সুস্পষ্ট, ইম্‌প্রেশনের পরিবর্তমান আলোছায়ার মায়া লাগিয়ে নিরন্তর প্রতীকী হয়ে উঠতে চেষ্টা করে বোদ্‌লেয়ারের অনুসরণে, যার ইঙ্গিত হয়তো ইয়েট্‌সের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। প্রতীকতা শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য গোপনে সুরের রহস্যে চলে যায়, ছন্দের সরের চেয়েও জীবনানন্দ অর্থের ও

বেদনার সুরের রঙ ও গন্ধ জ্বালাতে চেয়েছেন : 'মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে / শুনেছি একটি কুষ্ঠ কলঙ্কিত নারী/কেমন আশ্চর্য গান গায়;/বোবা পাগল মিন্‌সে এক অপরূপ বেহালা বাজায়।' মনে হয়, সুররেয়ালিজমের স্তর বেয়ে চলেছে বর্তমান সভ্যতার সমাজের নরনারী; মহীনের ঘোড়াও সেই বোধের : 'মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্ত্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;/প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া—যেন এখনও ঘাসের লোভে চরে/পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।' 'এ-মেয়েটি হাঁস ছিলো একদিন হয়তো-বা, এখন হয়েছে হাঁস-হাঁস।' নিশ্চেতনা বা একস্‌প্রেশনিজমের ছোঁয়া এই সব চিত্রকল্পে ভেসে ওঠে : 'সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে।' অথবা 'তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।' প্রকৃতির কবিতার মতোই এর অপূর্ব নিবিড় ব্যথাময় কোমল বোধ : 'রাত্রি হয়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতো স্নিগ্ধ হয়ে আছে এই মহিলার মন।' এ যেন ইয়েনেস্কোর নাটকের অ্যাব্‌সার্ড দৃশ্য দেখছি এ- কালের জীবনের চিত্রে : 'চারিদিককার অট্টহাসির ভেতর একটা বিরাট তিমির মৃত দেহ নিয়ে/অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠলো যেন।' বিশ্বের ভৌগোলিক ব্যাপ্তির বোধ জাগাতে এলিঅটের রীতি অনেকাংশেই গ্রহণ করেছেন তিনি : 'পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে / নিজেকে মেলাতে গিয়ে ব্যাবিলন লণ্ডন/ দিল্লি কলকাতা নক্‌টার্নে / অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে মহান তৃতীয় অঙ্কে:' ইতিহাস ও সমাজচেতনা 'মহাপৃথিবী' থেকেই শুরু হয়েছে 'সুচেতনা' কবিতা থেকে, সমাজচেতনার বোধ জীবনানন্দে প্রথম থেকেই, 'শকুন' কবিতাটিই তার দৃষ্টান্ত; সুচেতনা হয়ে, 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় বিস্তারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালের রাত্রির ভীষণতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুগ সমাজ ও কালের অস্থির নোংরা রূপ, সাম্রাজ্যবাদী নাৎসি ও ফ্যাসিবাদী শক্তির করাল দংষ্ট্রা, বাংলার দুর্ভিক্ষ মহামারী মন্বন্তর, মিশনারির সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ তৈরি করে আফ্রিকা এশিয়ার মানষকে কীভাবে কলষিত করে দিয়েছে তার রূপ, শোষিত মনুষ্যত্বের বিকৃত চেহারা, পারিবারিক ও ব্যক্তিচেতনায় তার প্রভাবে আঁধার ছবি, একদিকে যেমন দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে একে অস্বীকার করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার কথা বলেছেন, স্বপ্নে ভেসে উঠেছে বিশ্বজাগতিক ও আন্তর্জাগতিক মহামিলনের বিশ্ববোধ। সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের ধর্মীয় ও ইতিহাসবোধ : 'চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টি থ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি/ যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ / চিনে-চিনে হয়তো-বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে/প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান/হয়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।' তাঁর একমাত্র প্রিয় ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, কিন্তু এই অক্ষরবৃত্তের মধ্যেই বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি ও শব্দবিন্যাসে ছন্দের ও সুরের মৌলিক আবিষ্কার করেছেন জীবনানন্দ, মাত্রাবৃত্তের চেষ্টা 'ঝরা পালকে' খুব সার্থক নয়, গদ্য কবিতাতেও, যেমন 'বিড়ালে' 'নগ্ন নির্জন হাতে', 'হাওয়ার রাতে', চিত্রকল্প ও ছন্দস্পন্দে যে-সুর সৃষ্টি করেছেন, তা কখনোই প্রথাগত ও প্রচলিত নয়। যদিও পুরোপুরি গদ্যের ঋজু রূপ তাঁর কবিতায় নেই, কাব্যিক ও পুরনো শব্দ, বিস্তারিত ক্রিয়াপদ মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ব্যবহার করে গেছেন; কিন্তু যেভাবে

বিজ্ঞানের শব্দকে দেশি তদ্‌ভব কথ্যকে এবং ইংরেজি ও বিদেশি শব্দকে তাঁর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে সুরের মায়ায় ব্যবহার করেছেন, তাতে আধুনিক চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে: 'মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি নাচিতেছে টারানটোলা রহস্যের।' বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। 'বিয়োবার' 'বোঁচকা' শব্দ ব্যবহারের সাহস তাঁরই ছিলো। অনুপ্রাস, অন্ত্যমিল, মধ্যমিল দিয়ে চিত্রকে প্রতীকের সুরে মায়াময় করে তোলেন।

অনেক আগেই বলেছি, ইয়েট্‌সের আত্মিক রূপ জীবনানন্দে প্রতিফলিত, তবে ভারতীয় বা প্রাচ্যকে যেভাবে অবগুণ্ঠিত রহস্যের মনে করেছেন ইয়েট্‌স্, বরং তার প্রতিবাদ করেছেন জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে। বুদ্ধ সম্পর্কে একেবারে উল্টো মনোভাব ও উপলব্ধিই প্রকাশ করেছেন জীবনানন্দ : 'একদিন বুদ্ধকে সে চেয়েছিলো বলে ভেবেছিলো।' বুদ্ধ এখানে শাশ্বত জীবন ও বোধের আদর্শ। তবু ইয়েট্‌সের প্রতীক ও তাঁর টেক্‌নিকের প্রয়োগ জীবনানন্দে ছেয়ে আছে : 'অগণন, লোক মরে যায়; / এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয়।' ইয়েট্‌স্ যেমন পিথাগোরাস ক্যালিম্যাকাস প্লেটোর কথা বলেন, এখানে সেই রীতিতেই এম্পিডোক্লেস এসেছে। এম্পিডোক্লেস বলেন : বস্তুর প্রতিটি উৎপত্তির অর্থই হলো আদি বস্তুর সংযোগ এবং ধ্বংস মানে বস্তুগুলির সংযোগ থেকে বিচ্ছেদ। আদি বস্তু হলো জল-বায়ু-মাটি-আগুন। বস্তুর মধ্যেই উৎপত্তিহীন অবিনশ্বর অপরিবর্তন আছে, এগুলি শাশ্বত সত্তা, স্থানে গতির মধ্যেই বস্তুর বহুমুখিতা ও পরিবর্তনশীলতা, এই গতির গুণেই বস্তু পরস্পরের সম্পর্কে মিশে যায়। বস্তু ও গতি দিয়েই তিনি জগৎকে দেখেছেন, গতিহীন বস্তু স্থির। বিচ্ছিন্ন বৈশ্বিক শক্তিরূপে এই বস্তুকে ও গতিকে দেখেছেন তিনি। তবে বস্তু ও গতিকে একালের বিজ্ঞানের মতো একাত্ম দেখেন নি, দেখেছেন বিচ্ছিন্নরূপে। বস্তু যখন অন্য বস্তুর সঙ্গে সংযোগে মেলে, তখন একটি শরীরের প্রসারণশীল অংশ অন্য বস্তুর শরীরের লোমকূপে বা ফাঁকে নিবিষ্ট হয়। বস্তুর সম্পর্কে শক্তি গড়ে ওঠে দুই বস্তুর মধ্যে লোমকূপে ও বস্তু থেকে নির্গত বিন্দুর ওপর। এগুলি বস্তুর পরিমাণগত দিককে নির্দিষ্ট করে, তেমনি গুণগত দিক নির্ভর করে বস্তুর সংযোগের বিভিন্নতার ওপর। জীবনানন্দ বস্তু ও গতির চিরন্তন সত্যের মধ্যেই জগতের নিত্যতা দেখেছেন যেমন একদিকে, তেমনি বস্তু থেকে নির্গত এমন কিছু আছে যা অন্য বস্তুর লোমকূপে ঢুকে সংযোগজাত মিলনকে সার্থক করে তোলে এই পৃথিবীতে, এই সংযোগজাত মিলনেই জগতের সার্থকতা এই বস্তুময় পৃথিবীতে। আধুনিক বিজ্ঞান এম্পিডোক্লেসের কাছেই শিক্ষা পেয়েছে।

পাশ্চাত্য চিন্তার সুস্পষ্টরূপ দেখেছিলেন ইয়েট্‌স্ পিথাগোরাসে; পিথাগোরাস সংখ্যা দিয়েই তাঁর জগৎ ও দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। সংখ্যা হচ্ছে বস্তু, সংখ্যার মধ্যেই শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য, এই শৃঙ্খলাই জগতের বস্তুতে প্রকাশমান। এই সংখ্যা আদর্শ ও বস্তুগত। এই কারণেই সমস্ত জগৎ শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যে বিন্যস্ত একটি সমগ্র যাতে সব বিরোধ বিষমতা বিশৃঙ্খলা সংহত হয়ে যায় ঐক্যে। একটি কেন্দ্রীয় আগুন থেকে তাপ আলো জীবন নির্গত হচ্ছে। এই আগুনের কেন্দ্রেই পৃথিবী ঘুরছে, এই সব মিলেই ঐক্য। সংখ্যার মধ্য দিয়েই বস্তুর পরিমাণগত সম্পর্ক; বিস্তার আয়তন রূপ দূরত্ব যোগ সব মিলে

যায়। তার ফলেই জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা। সংখ্যার মধ্যে সম ও বিষম আছে, এই সম ও বিষমের যোগেই ঐক্য সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে নিহিত, আকাশে নক্ষত্রে সংগীতে জ্যোতিষে নীতিতে প্রকৃতিতে। এই ঐক্য পাশ্চাত্যের ও ইয়েট্সের ধ্যেয়। এই সঙ্গেই পিথাগোরাসের অভিজ্ঞতা, ধারণা ইয়েট্স্‌কে প্ররোচিত করেছে। পিথাগোরাসের ধারণায় রহস্যবিদ্যা ও অর্ফিক মায়া আছে, যুক্তির বাইরে ইয়েট্স্‌ সেই রহস্যেই আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতীয় বোধ এই প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্যের সঙ্গে আরো এক বিরাট শক্তির প্রেরণা উপলব্ধি করে যোগে। জীবনানন্দে তার ইঙ্গিত আছে। ইয়েট্স্‌ সারা জীবন যেমন ধর্মীয় গুহ্যতন্ত্রে আচার-রীতি-প্রথা বিশ্বাসে-সংস্কারে অভিভূত থাকতে চেয়েছেন সম্মোহনের জন্যে, প্রায় সবগুলির উল্লেখই জীবনানন্দের একটি কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় :

> ওই পারে মৃত্যুর তালা
> ত্রিবেদী কি খোলে নাই? তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদি কাবালা
> ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্মমরণের থেকে শুরু ক'রে
> হেগেল ও মার্ক্স্‌ : তার ডান আর বাম কান ধরে
> দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো; এমন সময়
> দু-পকেটে হাত রেখে নিরাময়
> জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম;
> প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হলো একটি টোটেম :

তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদি কাবালা ঈশার শবোত্থান সবই ইয়েট্স-বাহিত।

জীবনানন্দের কাব্যের রসাস্বাদন এই প্রবন্ধে করা গেলো না, কেননা ফর্মের মধ্যে ঢুকে গতিরেখায় একটি চিত্রে হয়ে-ওঠাই কবিতার মতো কাব্যের রসাস্বাদন, তাতে প্রতিটি কবিতার বিশিষ্ট ফর্মে একাত্ম হতে হয়। এখানে তা সম্ভব হয়নি স্থানাভাবে। কিন্তু জীবনানন্দের বোধের আধুনিকতা থেকে বাংলা কবিতা কতোটা এগিয়েছে, ভাষার কেরামতি ও স্মার্ট সপ্রতিভতা ও সংবাদপত্রের স্টান্ট্‌ ছাড়া, এখন তা বিচার্য।

রচনাকাল: ১৯৮৬

জীবনানন্দের কবিতার যোগসূত্র ও অস্তিত্ববাদ

আমার নিজের মতে 'অবসরের গান' জীবনানন্দের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা, কেননা জীবনানন্দের কবিতার সমগ্র বৈশিষ্ট্য, ভাষাধ্বনিচিত্রকল্পের ব্যক্তিত্ব, উধাও হয়ে-যাওয়া রূপের গন্ধের জন্যে হৃদয়ের আকুল বিবশতা, এই যুগের প্যাঁচা ও ইঁদুরের সংসারে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা, হৃদয়ের গভীরে অনাস্বাদিত অনুভূতি, পৃথিবীর প্রতি পুরনো পিপাসার গান, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বলবার মধ্যেও একটা ক্ষীণ কাহিনীবিন্যাস, এবং এই বিন্যাসকে কেন্দ্র করে পল্ ক্লি'র ছবির মতো সুরের ধূপের সুরভিগন্ধে সব যেন একাকার হয়ে আছে। মাঝে-মাঝে উত্তপ্ত কবিতা দেখে লোভ হয় বলতে এই বুঝি কবিতা। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা যদি স্মরণে রাখি, তাহলে দেখবো সেই কবিতাই আমাদের মনের মধ্যে গাঢ় হয়ে আছে পৃথিবীর আদিম স্তরের অনুভূতির মতো, যে-কবিতা বাইরের জগতের সব কিছু টেনে এনে হৃদয়ের গহন অন্ধকারে স্বপ্নের আদিম রঙে পরিপূর্ণ সামগ্রিকতার এক নির্যাস বার করে। সেই মদই তীব্র এবং পুষ্টিকর, যে-মদ ফল থেকে বারংবার নির্যাস নির্গত করে সতেজ তীব্রতায় আমাদের চৈতন্যকে ঝাঁঝিয়ে রাখে, অবশ করে দেয়, গন্ধে মুগ্ধ করে, রঙের উচ্ছলতায় সোনালি কল্পনা জাগিয়ে রাখে। কাহিনীকাব্যের মধ্যেও নির্যাসিত এই অনুভূতির তীব্রতা সমগ্রভাবে চেপে ধরে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র শেষ সর্গে ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলাকে চিতায় উঠিয়ে দেবার পরে রাবণের বিলাপ-মুহূর্তে সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে আমাদের মনে সর্বজনীন হতাশা ও ব্যর্থতা এনে দেয় এবং এই গহন অন্ধকারে বেদনার উজ্জ্বল রূপকে ঢেকে রাখবার জন্যে কর্কশ মুখোশ দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু কবিতা সেই নিভৃত প্রদেশের স্তব্ধগতির তরঙ্গে নিঃশব্দ সংগীতের মতো আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতার সামঞ্জস্যে অধিষ্ঠিত করে দেয়, অধিষ্ঠিত না করলেও সেই দিকে টেনে নিয়ে যায়' যে-কবি যতো বেশি সেই গভীরে অন্ধকার প্রদেশে শব্দের আলো জ্বালিয়ে আমাদের চৈতন্যকে সমগ্র অনভূতির পরিপূর্ণতায় নিয়ে গেছেন, তাঁর শ্রেষ্ঠতা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। আমার মনে হয়, এই কারণেই হয়তো, পৃথিবীর লিরিক, রোম্যান্টিক, প্রতীক, চিত্রকল্পধর্মী, সুররেয়ালিস্ত্ কবিতা অন্য শ্রেণীর কবিতার চেয়ে আমাদের মনে বিশেষভাবে দেগে বসেছে, মিল্টন্ শব্দের আড়ম্বরের অন্তরালে নিভৃত অরণ্যের গভীর গোপন জলের বিশুদ্ধ অন্ধকার যখন মুহূর্তে দুলিয়ে দিয়ে যান, সেইখানেই তাঁর কাব্য আমাদের জড়িয়ে ধরে, এবং সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যেও এই রহস্য অন্ধকার আমাদের মুগ্ধ করে। যা আছে, তার রূপে ও ধ্বনিতে কোনো কাব্যে নেই; যা-আছে তাকে নিয়ে, যা-নেই তার মধ্যে স্নান করানোর মধ্যে কবির কবিত্ব। জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায় : 'দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—/আমাদের ডেকে লয়, তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা, অবসন্ন হাত।' নদীর স্রোতমানতা, জল শব্দে রূপান্তরিত হয়ে ঘ্রাণে পর্যবসিত হয়েছে, এই ঘ্রাণ থেকে চৈতন্যের অবসাদ, অর্থাৎ সব কিছুকে গ্রহণ করবার সংহতি আমাদের ক্লান্তিকে দূর করে দেয়। অন্যান্য কবির চেয়ে জীবনানন্দ শ্রেষ্ঠ এই কারণেই।

'মাঠের গল্প' কবিতায় 'মেঠো চাঁদ' অংশটি লক্ষণীয় এর সঙ্কেতের জন্যে। মেঠো চাঁদের মাঠ ও চাঁদের মধ্যে যে আনন্দ উল্লাস শান্তি রয়েছে, মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে ডাকছে, পরিবেশের বিরোধী ছবির সমাহারে তা নষ্ট হয়ে গেছে মনে হয়, ডাইনে ও বাঁয়ে অর্থাৎ চতুর্দিকে অবক্ষয়ের ছবি, পোড়ো-জমি-খড়-নাড়া-মাঠের ফাটল। এবং এলিঅটিয় 'পড়ো জমি'র সাদৃশ্যই আসছে এখানে, কিন্তু তার সঙ্গেই রয়েছে শিশিরের জল, যেন সমস্ত ধ্বংসের ওপরে অশ্রুবিন্দু। আর ওপরে মেঠো চাঁদ, কিন্তু এখানে এই ছবির দৃশ্যতা পাল্টে গেছে, চাঁদ কাস্তের মতো বাঁকা ও চোখা, কাস্তের সঙ্গে মাঠের এবং মাঠের শস্যের অনুষঙ্গ আসছে। এই কথাই চাঁদের সংলাপে ব্যক্ত। কবিকে সম্ভাষণ করে চাঁদ বলছে এই 'পোড়া জমি'র মাঝখানে দাঁড়িয়ে একা থাকবার চেয়ে ফলানো শস্য কাস্তে দিয়ে তুলে নেওয়া অনেক ভালো। কিন্তু কবি উল্টোভাবে একই প্রশ্ন করেছেন চাঁদকে, চলমান সময়ের স্রোতে পুরনো রঙিন পৃথিবীর মতো সে কেন দাঁড়িয়ে আছে একা একা। বুড়ি পৃথিবীর মতো নিঃশব্দ চাঁদের সঙ্গে কবি নিজেকে যে সম্পৃক্ত করতে পারবেন না। ঐশ্বর্য আনন্দ এসে চলে গেছে, কিন্তু তবু সে একা, আর তার চারপাশে ধ্বংসের ছবি। এই ধ্বংসের ছবির মাঝখানেই নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে কবি একাকী।

প্যাঁচা জীবনানন্দের কাব্যে উল্লেখযোগ্য; প্রাচীন, জীর্ণ, স্থবির, অন্ধকার-অতীত কাল ও মানুষ বোঝাতে প্যাঁচা বারংবার তাঁর কাব্যে এসেছে, এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে। কখনো প্যাঁচা এসেছে জৈব শক্তি নিয়ে।

'মেঠো চাঁদ' অংশে শস্য ছিলো মাঠে, কিন্তু কবি তা ঘরে তোলেন নি নিস্পৃহতায়। এই মাঠ শূন্য, শস্য ঘরে তোলা হয়েছে, হেমন্তের মাঠে অশ্রুর মতো শিশিরের জল, হেমন্ত একদিকে শস্য উপহার দেয়, অন্যদিকে মাঠকে রিক্ত করে দেয় এবং শীতের প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করে, সেখানে প্রকৃতি মৃত। শিশিরের জলের পরেই মানুষের মতো নদীর শ্বাস হিমে স্তব্ধ হয়ে আসে, জলের সঙ্গে প্রকৃতির মৃত বাঁশপাতা, মরা ঘাস, আকাশের তারা, বরফের মতো চাঁদ, পৃথিবী ঘুমন্ত শান্তিতে বিরাজ করছে না, নিদ্রা এবং অনিদ্রার মাঝখানে ঝিমুচ্ছে। অনিদ্র চোখে পৃথিবীর এই রূপকে দেখছে অঘ্রানের রাতে এক প্যাঁচা। নিত্যকালের সাক্ষী সে। চাষা জীবনানন্দের কাছে প্রথম দিকে শস্যহরণকারী লোভী, এর মধ্যে প্রচলিত ধারণার সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আসে না। এবং এই দৃশ্যই বারংবার পুনরাবৃত্ত করেছেন, ধ্বংসের ও ক্ষয়ের ছবির ব্যাপ্তি সর্বজনীনতা ও নিত্যত্ব বোঝাতে একই চিত্রকে প্রকাশ করেছেন। এই অনিদ্র প্যাঁচার সঙ্গে চাঁদের সংযোগ স্থাপিত হলো কালের ধারণায়। দুই-ই নিঃসঙ্গ। অথচ কারো সঙ্গে যোগ স্থাপিত হচ্ছে না।

এই প্যাঁচাই আজকের যুগের জীর্ণ মানুষ। এর পর বহু বছর কেটে গেছে। চাঁদ আর তারা ঘরে গেলো, মানুষ মারা গেছে, ইঁদুর ও প্যাঁচার মতো প্রাণীরা ধানক্ষেতও নষ্ট করে গেছে, সময়ের অনন্ত স্রোতে বয়ে গেছে, তবু কবি একাকী জেগে। বাইরের সময় দ্রুত বেগে বয়ে চলেছে, নক্ষত্রে বেগের চেয়ে সময় আরো দ্রুত। কিন্তু এ জীবনের অভিজ্ঞতায় পঁচিশ বছরের শেষ নেই। তবু এমনি এক হেমন্তের ক্ষয়ে-যাওয়া প্রকৃতির মধ্যে পুরনো দৃশ্য দেখছেন কবি, আরো বিবর্ণ পাণ্ডুর, অবক্ষয়ী, মৃত্যুর মতো, এই মৃত্যুর জগতে ইঁদুর ও প্যাঁচারা শুধু জীবিত, মাঠে মাঠে খুদ খেয়ে বেঁচে আছে। এমনি করেই জীবনের

অভিজ্ঞতার শেষ। সমস্ত দৃশ্য ধরে আছে সঙ্কেতের ছবির মধ্যে : 'তারপর একদিন/আবার হলদে তৃণ/ভরে আছে মাঠে,/পাতায়, শুকনো ডাঁটে/ভাসিছে কুয়াশা/দিকে-দিকে, চড়ুইয়ের ভাঙা বাসা/শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর/ পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড় কড়;/শসাফুল —দু'একটা নষ্ট শাদা শসা/মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুকনো মাকড়শা/লতায়-পাতায়'; প্রত্যেকটি শব্দেই ইন্দ্রিয়চেতনায় সঙ্কেতে ধ্বনি ও সুরে অর্থবহ এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর, অবক্ষয়ের প্রতীক। কবি এই ধ্বংসের মধ্যে জেগে আছেন একাকী।

একা চাঁদ, একা প্যাঁচা, এবং তারি সঙ্গে কবি একাকী জেগে, তাঁর পাশে ধ্বংসের ছবি ছড়ানো-ছিটানো, মৃত্যুর পাণ্ডুরতা বাতাসে ভাসমান, আকাশে বরফের মতো চাঁদ, অঘ্রানের নদী হিমে স্তব্ধ।

আবার কবি কার্ত্তিকের মাঠের চাঁদ দেখেছেন। এতো ধ্বংসের ভেতরও পাহাড়ের মতো মেঘের মধ্যে চাঁদকে দেখে হৃদয়ে আবেগ জেগে ওঠে। এই মৃত পৃথিবীর মধ্যেই চাঁদ যেন মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু চাঁদের চারপাশে আজ মনে হচ্ছে ছেঁড়া মেঘ ত্রস্ত ছেলের মতো পালিযে গেছে, নক্ষত্র জ্বলে গেছে আকাশে, এই দগ্ধ আকাশের বুকে মেঘহীন নিঃসঙ্গ চাঁদ শোভা পাচ্ছে। এই চাঁদ, অতীতের স্মৃতি, আনন্দ, বেদনা ও বাসনার প্রতীক। তাই এই চাঁদ অতীতেই ছিল, কিন্তু আজকে নেই, কোনো কালে আসবেও না, এই হারানোর ব্যাপ্তি 'আ' এবং 'র' স্বরে দীর্ঘায়ত হয়ে উঠেছে: 'তারপর হাতছাড়া হয়ে হারায়ে ফুরায়ে গেছে।' এই না-পাওয়া স্মৃতির অপ্রাপণীয় কান্নাই চাঁদ যেন কার্ত্তিকের শেষরাত্রে কবিকে ব্যথায় ব্যাকুল করে দিচ্ছে আজ। এই হারানো প্রেম, হারানো স্মৃতি, তারি স্বাদ চাঁদ নিয়ে আসছে আমাদের মধ্যে। এই স্মৃতিকে প্রেমকে পাওয়া যাবে না এই কারণে যে পৃথিবীর মাঠ নিড়োনো হয়েছে, হৃদয়ের শস্য চাষা কেটে নিয়ে গেছে! শস্যহীন মাঠের মতো এই হৃদয় রিক্ত ধূসর। এই রিক্ততার মধ্যেও আকাঙ্ক্ষার স্বাদ লেগে থাকে— 'অনেক তবও থাকে বাকি—' এই 'তবু'টুকু আছে বলেই জীবন জেগে আছে। কিন্তু একথা বর্তমান পৃথিবী জানে না, জানে না বলেই রিক্ত ধূসরতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সত্য শুধ কবির কাছে ধরা পড়ে, কবির কাছে ধরা পড়ে বলেই চাঁদের সত্য এই পৃথিবীতে।

এই ক্ষীণ গোপন বাসনার ও আনন্দের স্বাদের মধ্যেই জীবনানন্দের কবিতার জীবনের আলো আমাদের মনে জাদুর মোহ তৈরি করে। কিন্তু এই স্মৃতিরও মৃত্যু ঘটে। তাই পঞ্চমীর চাঁদ যখন মরে যায় তখন আর বেঁচে থাকবার কোনো সার্থকতা থাকে না। অর্থহীন জীবন থেকে মৃত্যু উঠে আসে শান্তির মতো। লাসকাটা ঘরে এই মৃত্যুরই ইতিহাস বিধৃত।

লাসকাটা ঘরে যে-লোকটা শুয়ে আছে, তার অর্থকীর্তি সচ্ছলতা প্রেম আশা, সংসার গৃহসুখ সবই ছিলো, তথাপি সে আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যা করবার কারণ লুকিয়ে আছে তার সত্তার নিভৃত প্রদেশে। জীবনানন্দ প্রশ্ন করেছেন, জ্যোৎস্নায় কোন্ ভূত দেখে তার মরবাব সাধ উপস্থিত হয়েছে। এই 'ভূত' হলো 'বোধ'।

উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা এই বোধেরই নামান্তর। এই বোধ মানুষকে অশান্ত করে রাখে নিয়ত, তার কানে-কানে মন্ত্র বলে পৃথিবীতে জানাই হলো গাঢ় বেদনা। এই বেদনা থেকে মুক্তি হচ্ছে মৃত্যু। এখানেই জৈব প্রেরণা ও চৈতন্যের বিরোধ।

অন্য দৃশ্যের প্রেক্ষাপট এই মানুষের কাহিনীকে বিস্তৃত করেছে। কালের সাক্ষীর মতো প্যাঁচা জেগে আছে, প্রকৃতির তুচ্ছ প্রাণীও প্রভাতের ইশারায় ও উষ্ণ অনুরাগে দুই মুহূর্তে জীবনের ভিক্ষা মাগে। অন্ধকারে মশা জীবনকে ভালোবাসে। অন্ধকারের সঙ্গে মশার যোগ ঘনিষ্ঠ, কিন্তু মানুষের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করেছে মশারি, মশারি মানুষের তৈরি, তাই অন্ধকারের সঙ্গে মশারির বিরোধ। রক্তক্লেদময় জীবন থেকে প্রাণেরই জন্যে সোনালি রৌদ্রের ঢেউ-এ মাছি উড়ে যায়। কীটপতঙ্গে চারিদিকেই জৈব জীবনের আনন্দ, এমনকি দুরন্ত শিশুও যখন ফড়িঙ্‌কে বিঁধে মারে, ফড়িঙ্‌ প্রাণের জন্যে লড়াই করে। কিন্তু এই সব জীবনের সঙ্গে মানুষের কোনো সংযোগ নেই, ফড়িঙের দোয়েলের জীবন থেকে মানুষ পৃথক তার অস্তিত্ব ও চৈতন্যের প্রশ্নে। তাই তার দুঃখও বিরাট; পৃথিবী শান্ত করতে পারে না।

এই মৃত্যুতে প্রকৃতি কি বাধা দেয় নি অর্থাৎ জোনাকির ভিড় ও সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকের মধ্যে প্রকৃতিজগতের জীবনের মিলন কি এই আত্মহত্যাকারী লোকটিকে নিবৃত্ত করে নি, মৃত্যু থেকে ভালোবাসতে শেখায় নি! প্রকৃতি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ প্রাণীর সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

আবার প্যাঁচা এসেছে, থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অভিজ্ঞতায় জীর্ণ কালেরই মতো মানুষের ও প্রকৃতির সাক্ষী। জীর্ণ ও প্রাচীন হলেও বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা তার শেষ হয় নি। চাঁদ ডুবে-যাওয়ার পর অন্ধকারের জন্যেই সে আহার্য সংগ্রহ করে। আনন্দে উল্লসিত হয়। জীবনের এই তুমুল গূঢ় সংবাদ আত্ম-হত্যাকারী কি জানতে পারে নি খ্রিস্টের বাণীর মতো! লক্ষণীয়, রবীন্দ্রকাব্যের চাঁদের উপস্থিতিতে জোয়ারের উচ্ছ্বাস জাগে, (ও চাঁদ, চোখের জলে লাগল জোয়ার) আর এখানে বন্যার জল চাঁদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মিলনের থেকে এখানে মৃত্যুই প্রতীকিত। বুড়ি চাঁদ বেনোজলে ভেসে যাওয়ার মধ্যে চিরপরিচিত বাংলা শব্দই নূতন অর্থে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। বেনোজল অর্থাৎ নোংরা জলের উচ্ছ্বাসে কাম্য বস্তুও শেষ হয়ে যায়। কাম্য বস্তু শেষ হয়ে গেলেও বাঁচার তাগিদ কীটপতঙ্গ অনুভব করতে পারে, কিন্তু মানুষ করতে পারে না। তার জীবনের স্বাদ ভিন্ন। সে কালিগুলার মতো চাঁদ চায়। কিন্তু চাঁদ ডুবে গেছে অন্ধকার ফাল্গুনী রাত্রে।

এই কারণেই চতুর্দিকে জীবনের স্বাদ, হেমন্তের বিকেলে প্রাণময় জীবনস্পন্দিত গন্ধের ঘ্রাণ থাকলেও কোনো এক অস্থির বোধের তাড়নায় মানুষ তার জীবনকে অসহ্য বোধ করে : 'থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে' মৃত্যুকে বরণ করে। ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের একটা সাদৃশ্য বারংবার জীবনানন্দ খুঁজেছেন অসহায়তার সাদৃশ্যে।

আবার পুরনো বক্তব্যের জের টেনেছেন। দ্বিতীয় স্তবকের কথাগুলিই অন্য উপায়ে বলেছেন এখানে, বোঝাতে চেয়েছেন যে-মানুষের জীবনে নারীর প্রণয় বিবাহিত জীবনের স্বাদ, বধূর দেহের ও জীবনের মধু, দারিদ্র্যমুক্ত ঐশ্বর্য—এসব কিছু নয়। তাহলে কিসের প্রেরণায় সে আত্মহত্যা করেছে, জীবনের প্রতি বিরক্তি কেন, ক্লান্তি কেন? এর উত্তর দিয়েছেন প্রায় গদ্যেরই মতো : 'জানি—তবু জানি/নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;/অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের

অন্তর্গত রক্তের ভিতরে /খেলা করে;/আমাদের ক্লান্ত করে,/ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;' এই ক্লান্তি থেকে মক্তির জন্যেই মৃত্য বরণ করে মানুষ। এই ক্লান্তিই জীবনের চারিদিকে, সার্ত্রের নায়ক যা অনুভব করে, বোদ্‌লেয়র বহু আগে বলেছেন: Une oasis d'horreur dans un desert d'ennui (Le Voyage.)

পুনরায় প্যাঁচাকে টেনে এনেছেন। এবার প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট আলাদা। বিপন্ন বিস্ময়ে মানুষ জীবনের ক্লান্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিজের মৃত্যু নিয়ে আসে। কিন্তু প্রকৃতির জগতে বাঁচার তাগিদই বেশি। জীবনানন্দ এটাই নিত্য দেখে আসছেন। চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে প্যাঁচা আহার্যের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে ওঠে অশ্বত্থের ডালে বসে।

শেষ স্তবকে 'আমি' সাধারণ মানুষ, প্রাণী কীটপতঙ্গের সঙ্গে মিশে গেছে। এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। বুড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের স্মৃতি এবং কল্পনা আর থাকবে না, কালো রঙ বেনোজলে তাকে ভাসিয়ে দেবেন। কীটপতঙ্গ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মতোই জীবনের ভাঁড়ার মানুষ শূন্য করে দেবে। জীবনের ভাঁড়ার অর্থাৎ খাদ্য যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে বেঁচে থাকবার সার্থকতা শূন্যতারই নামান্তর। এখানেও 'চাঁদ' শব্দটি সমস্ত কবিতাকে ধরে আছে। চাঁদের মৃত্যু হয়তো মানুষটিরও মৃত্যুকে সম্ভাবায়িত করেছে। এই চাঁদ আবার ক্ষীণ জেগে উঠেছে 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যে, 'চাঁদ আসে একলাটি' (উত্তরপ্রবেশ) এই কারণেই বলেছেন আবার : 'তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই, তব/গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তমি/আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছো।' (জনান্তিকে) কিন্তু রবীন্দ্র-উচ্ছ্বাস নয়, উদ্‌ভাস নয়, বড়ো বেদনার বিষাক্ত ফুল।

এই 'বিপন্ন বিস্ময়' ও 'বোধ' একই বস্তু মনে হয়। এই বোধের জন্যে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব, সকল মানষের মধ্যে থেকেও এই বোধের অস্তিত্ব ও সচেতনতার জন্যে ব্যক্তিমানুষ একাকী থাকতে বাধ্য। এই বোধ কবিপ্রতিভা বা কাব্যসৃষ্টি নয়, কারণ কবি-প্রতিভা জগতের সব কিছু গ্রহণ করে, বর্জন করে না, সকলকে নিয়েই সে স্বরাট্। এবং এই একাকিত্ব সৃষ্টি করেছে ব্যক্তির ও সমাজের অসুখ। ওই অসুখের রূপই প্রকাশ পেয়েছে 'বোধ' কবিতায় শেষ ক'টি পঙ্‌ক্তির মধ্যে : 'চোখে কালো শিরার অসখ/কানে যেই বধিরতা আছে,/যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে / নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়োর ছাঁচে/যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে/—সেই সব।' হৃদয়ে এই সব সমাজের অসখ ফলেছে বলেই সচেতন মানুষ একাকী, একাকী নিঃসঙ্গ মানুষের মনে 'বোধ' জন্ম নেয়, হয়তো অভিজ্ঞতা ভালো হলে এই রকম ঘটতো না। এই বোধের স্পষ্ট কোনো রূপ নেই :

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমি প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ

পাবে নাকি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনদিন!

এই বোধ কি অস্তিত্ববাদী দর্শনের হাইডেগের-কথিত ভীষণতা (dread) বা সার্ত্রের angoisse; এই বোধ কখনোই মৃত্যুবোধ নয়, কারণ মৃত্যুর মধ্যে একটা শান্তি আছে, সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে এখানে। কিন্তু ভীষণতা প্রথমত একটা অস্থির চঞ্চল অস্তিত্ব, অনির্দেশ্যতা ও অনির্দিষ্টতা এর বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই মানুষকে এই বোধ বিভ্রান্ত করে অথচ সচেতন করে।

হাইডেগেরের মতে এই ভীষণতার কোনো বস্তু ও কার্যকারণ নেই। ভয়ের মতো বস্তুসাপেক্ষ ব্যাপার নয়। তাই এ বিভ্রান্তিকর ও সহজেই সাধারণভাবে একে দমন করা যায় প্রাত্যহিক অভ্যাসের দাসত্বে। এর কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। কোনো সচেতন ব্যক্তির সম্পর্কে জগতের সম্বন্ধ শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। প্রত্যেক বস্তুই অর্থহীন হয়ে ওঠে। এই অর্থহীনতা ও শূন্যতার দ্বারাই জগৎকে মুক্তভাবে দেখা যায়, কোনো সীমা এর মধ্যে নেই। অর্থাৎ বস্তুর সঙ্গে এর সম্পর্ক না থাকবার জন্যেই এর সাহায্যে জাগতিক বস্তু স্পষ্ট লক্ষ করা যায়।

সুতরাং, এই ভীষণতা জগতের যে-কোনো-বন্ধনের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দেয়, একটা একাকী নির্জনতায় নিয়ে যায়, এবং এই একাকিত্ব আমাদের মুখোমুখি করায় আমাদের এই প্রশ্নে : 'আমি, না আমি।' সুতরাং ভীষণতা মানুষের মুক্তির রূপ উদ্বোধিত করে। উদ্বোধিত করে বলেই প্রচলিত ব্যবহারের জগতের অর্থ ও সম্পর্ক তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠে এবং নিজের অস্তিত্বে গ্রহণ করবার প্রশ্ন আসে, হয়ে-ওঠার প্রশ্ন ওঠে। সংযোগে এই ভীষণতার অভিজ্ঞতা হলো শূন্যতার। শূন্যতা হলো জগৎ বোঝবার। এবং বুঝে নিজের মতো হয়ে-উঠবার।

কিন্তু এই ভীষণতা মৃত্যুকে কখনো গ্রহণ করে না, স্বীকার করে। মৃত্যুর মধ্যে আছি, মৃত্যুর দিকেই এগোচ্ছি, তথাপি এই বিরোধী জগতের সঙ্গে আমি সংগ্রাম করতে সমর্থ হচ্ছি, এতেই আপনার সচেতন অস্তিত্ব সার্থকতর হয়ে উঠেছে নিরন্তর। এই নির্বাচন থেকেই যায়।

জীবনানন্দের এই বোধ সর্বাংশে ভীষণতা বা angoisse এর সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু জগৎকে জীবনকে সামগ্রিক ও মক্তরূপে বোঝবার জন্যে এই শূন্যতার উপলব্ধি তিনি এবং কবিতার নায়ক করেছেন। এই শূন্যতার উপলব্ধির মধ্যে জগতের সমস্ত কিছু প্রচলিত অর্থে তাৎপর্যহীন হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাৎপর্যহীন জগতের মুখোমুখি হয়ে অস্তিত্বকে স্বীকার করে ব্যক্তিত্বকে হয়ে-ওঠার যে সংগ্রামীবোধ অস্তিত্ববাদী দর্শনে আছে, জীবনানন্দের তা নেই। এবং এই ভীষণতা মৃত্যুকে গ্রহণ করে না, এবং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সংগ্রামের শক্তি জোগায়, এখানে মনুষ্যত্বের সার্থকতা। জীবনানন্দ এই শূন্যতাবোধের সাহায্যে জগতের অর্থহীন রূপকে দেখেছেন, কিন্তু অর্থহীন জগতের ভেতরে সংগ্রাম করবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন নি, বরং মৃত্যুকেই অবধারিত বলে,

শান্তির আশ্রয় হিশেবে স্বীকার করেছেন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের ভাষায় বলা যায়, পালিয়ে গেছেন। এখানেই উনামুনোর সঙ্গে জীবনানন্দের পার্থক্য। অথচ দুজনেই শূন্যতার উপলব্ধিতে জগতের নগ্নমূর্তি দেখতে সমর্থ হয়েছেন। বিপন্ন বিস্ময়ের 'বিপন্ন' কথাটির মধ্যে ভীষণতার অনুষঙ্গ কিছুটা আছে।

কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যে ক্লান্তি ও অর্থহীনতা থেকে মুক্তির উপায় মৃত্যু কি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত ও সত্য বলে পরিগণিত? 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে 'উত্তরপ্রবেশ' কবিতাটি এই সত্যের বিরোধিতা করে। ক্লান্তি মৃত্যু একাকিত্ব স্বীকার করে নিয়েও মানুষের হৃদয়ের অগোচর ভোরের আকাশে অরুণোদয়ের মতো প্রকাশ পায়। উত্তর এখানে পশ্চাৎ বা পরে, অর্থাৎ সব কিছু সত্ত্বেও চেতনার লোকে মানবতার রোল প্রকাশ করে। এই সান্ত্বনায় জীবনানন্দ প্রসারিত হয়েছেন:

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হ'য়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে;
অনন্ত সূর্যেব অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়,
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

বড় বেদনা ও মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এই জ্যোতির্ময় আলোকে আসতে চাইছেন। একি আকাঙ্ক্ষা না প্রাপ্তি! আমার মনে হয়, এ আকাঙ্ক্ষাই, বেঁচে থাকবার ইচ্ছা। আসলে জীবনানন্দের মনের গহনে যে-বোধের শূন্যতা তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে, তা থেকে পালিয়ে যাবার জন্যেই নির্জন প্রকৃতির গন্ধে ও রঙে, ইতিহাস ও সমাজচেতনায় বিস্তারে, অতি দূরের রোম্যান্সের রহস্যে আশ্রয় খুঁজেছেন। কিন্তু তাঁর অবচেতন মনে এই বোধ সক্রিয় ছিলো মৃত্যু পর্যন্ত; এটিই তাঁর কাব্যজীবনে উপলব্ধির কেন্দ্রবিন্দু, এর থেকে অন্য জোতিঃরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছে। সবগুলি বস্তু ও অনুভূতিকে এই কেন্দ্রের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে দেখলেই তাঁর কবিতার বিচার পূর্ণাঙ্গ হয়। এবং এদিক থেকে জীবনানন্দ একান্ত আধুনিক ও নাগরিক। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম বিভ্রান্ত নাগরিক মানুষের এক পরম উপলব্ধি, গ্রাম্য মানুষের পল্লিপ্রীতি নয়। নজরুল ও জীবনানন্দ একই সালে জন্মেছেন, কিন্তু মানসিকতায় একজন বিশিষ্ট গ্রাম্য বালকের ভূমিকা নিয়েছেন, আর জীবনানন্দ আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নকে চিরকালের জন্যে উদ্‌ঘাটিত করেছেন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে।

জীবনানন্দের আর এক পরিচয় ধ্বনিচিত্রেসুরে প্রতীকে ও ইন্দ্রিয়ের সমাহারজনিত বেদনার রঙে। এবং সেই পরিচয়েই তাঁর কবিসত্তা পূর্ণতর হয়ে ওঠে, জীবনানন্দের কাব্যে অনুভূতির জটিলতা ও বিরোধ তীব্র, একই সঙ্গে প্রকাশিত। এই কারণেই কাব্যের রূপগঠনে ও অর্থের ব্যবহারে তিনি দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্যতা কোনো অবাঞ্ছিত অশ্লীলতা নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা।

জীবনানন্দের কবিতায় ‘যোনিচক্র’ ও ‘ইতিহাসযান’

‘আমরাও দেখছি—এবং এই আশ্চর্য চলৎপ্রতিভাময়ী পটভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে আধুনিক কবিমন; সেই মনের থেকে উত্তীর্ণ ছন্দের দ্যোতনায় সৃষ্ট হয় যা তাই কবিতা। যে-কোনো সময়ের যে-কোনো জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে সে আধার সক্রিয় কবিমন—কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।’ (কবিতার আত্মা ও শরীর)।

‘...কিন্তু সেই বড়ো সুর যে-পয়ারে ব্যক্ত হয়েছে, পয়ার ছন্দ যে বাংলাকবিতার প্রাণ ও আত্মা (আজ পর্যন্ত) অন্য কোনো ছন্দ যে-পয়ারের এই শীর্ষদেশী মাহাত্ম্য ও গহনতার স্থান নিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রধান কবিদের রচনায় তা স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে—উপরের বারোটি লাইনেও।’ (কবিতার আত্মা ও শরীর)

‘এখনকার বাংলা কবিতায় যতিপ্রান্তিক ছন্দের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে কিনা সন্দেহ। ... কবিতার মর্মবাণী ফোটাতে গিয়ে বিশেষ সংহতির পরিচয় দিলেও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁরা ছন্দের প্রবহমানতাকেই ঢের বেশি পছন্দ করেন—মুক্তক পয়ার মুক্তক স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত মুক্তকেও লেখেন।’ (কবিতার আত্মা ও শরীর)

‘আধুনিক কালের প্রাণের কথা একদিক দিয়ে যেমন সংহতি সন্ধান করছে, অন্যদিক দিয়ে তেমনি তথাকথিত আপেক্ষিককালের প্রত্যাকের মতো সমাজ ও জীবনের আধুনিক বন্দিদশার সীমা লঙ্ঘন করে অমেয়তার অন্তঃকরণে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে। ফলে ছন্দের দোটানার ভিতরে পড়ে কখনো কবিকে গদ্য ও পদ্যছন্দে প্রায় খবরের কাগজের লিডার লিখতে দেখা যাচ্ছে, কখনো-বা ২২ বা ২৬ মাত্রার পয়ারে কিংবা প্রবহমানতার পঙ্‌ক্তি পরম্পরার ভিতর দিয়ে যেন সে পৌঁছচ্ছে নির্মুক্ত সমুদ্রে।’ (ঐ)

‘কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার; কবিতার অস্থি-র ভিতর থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক : কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।’ (উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য)

ইতিহাসচেতনা ও সময় যেমন বিষয়কে উদ্বেলিত করেছে, তেমনি সেই উদ্বেলতা চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র-মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে চেষ্টা করেছে জীবনানন্দের কবিতায়, পয়ার ছন্দের মুক্তক প্রবহমানতার অসম অমেয়তায়। জীবনানন্দের কবিতার আঙ্গিক বিচারে এই তিনটি উপাদান সম্যক উপলব্ধি করলেই তাঁর কবিতার মর্ম প্রতিভাত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জীবনানন্দ একটি কবিতায় গগ্যাঁর নাম করেছেন, কিন্তু গগ্যাঁর ছবির সঙ্গে তাঁর কাব্যের আপাত কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গগ্যাঁ জীবনের এমন এক স্বপ্ন

আদিমতায় রঙের প্রাচর্যে নির্জন প্রদেশে শান্ত ধ্যানের গভীরতা খুঁজেছিলেন এবং পেয়েছিলেন, জীবনানন্দের কোনো কবিতায় তা লক্ষ করা যায় না। এমনকি তাঁর প্রশান্ত, ঈষৎস্নিগ্ধ কবিতার মধ্যেও বেদনা ও ব্যথার দ্বন্দ্ব রয়েছে। বিশুদ্ধ রঙের ব্যঞ্জনা, অলংকরণের সঙ্গে গভীরতা ও পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে-আসা নিবিড় প্রভাব— প্রকৃতির আদিম ও আদি শক্তির অভ্যন্তরে মিস্টিক রহস্য, সংগীতের প্রবহমানতা ও গন্ধ—সব মিলে একটা সৃষ্টির প্রশ্নকে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের দৃশ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। তিনি দ্বন্দ্বমুখর জীবন থেকে পালিয়ে গেছেন, স্বপ্ন তৈরি করেছেন, আর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন রঙের সাঙ্কেতিকতায়। কারণ রঙের জাদুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যুক্তি নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দ জীবন থেকে সরে যান নি কখনো এবং রঙের প্রাচুর্যের সঙ্কেত আছে, তবে বেশি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু স্থিরবিন্দুতে পৌঁছোতে চেয়েছেন কখনো।

ভ্যান গখ্ বা গগ্যাঁ আধুনিক শিল্পজগতে অবিস্মরণীয়, কিন্তু এঁরা দুজনেই প্রভাবিত হয়েছেন কিছু ইম্‌প্রেশনধর্মী চিত্রশিল্পে। চিত্রে ইম্‌প্রেশনধর্মিতা বস্তুব আলোছায়ার খেলা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতির ও চোখের মাঝখানে চিত্রীরা আতস কাচ ধরে রেখেছেন, তার ফলে বহু বিচিত্র দৃশ্য আলোর পরিবর্তমানতায় নানাভাবে ধরা পড়েছে সময়ের পরিণামে। যে-সৌন্দর্যের ভেতরে ঢুকতে পারি না, শুধু বাইরে বসে তার আসা-যাওয়া দেখছি, এটিই হলো তার বৈশিষ্ট্য। এই কথাই মোনে বলেছিলেন যে রঙিন আলোর রশ্মি তাঁর চোখে এসে পড়েছে, তাকেই ক্যান্‌ভাসে রঙের বিন্দুতে রূপ দিচ্ছেন। বস্তুকে যথাযথ ধরবার জন্যে মোনে তাঁর শাদা ক্যান্‌ভাসকে বিচিত্র রঙের তুলির আঘাতে ভর্তি করতে চেয়েছিলেন, ফলে শাদা রঙ রঙের ঔজ্জ্বল্যকে আরো বাড়িয়ে দিলো, রঙের কোনো মিশ্রণ ঘটাতে চাইলেন না প্যালেটে বা ক্যান্‌ভাসে, কালোর প্রতি বিরূপতা হাল্‌কা আভাস নিয়ে এলো। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে তুলির আঘাতে বস্তুর প্রকৃত টেক্‌চারকে এনে এর চিত্রধর্মিতাকে স্পষ্ট করে তোলা, অথচ চিত্রবস্তুর মধ্যে রচনাগত রূপাবয়ব নেই। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষতার তীব্র দাবিতে ধারণাকে পরিহার করে চোখকেই সর্বেশ্বর করে তুলেছিলেন উজ্জ্বল রঙেব আদর্শবাদিতায়। গগ্যাঁ এবং ভ্যান গখ্ রঙের আদর্শ মেনে বস্তুর গভীরে, ধারণা ও সঙ্কেতের নিবিড়তায় আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। ভ্যান্ গখের ক্যান্‌ভাসে স্থানের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে গতির মূল্য তাঁর হৃদয়ের তালে দরন্ত হয়ে উঠেছে। ছবির স্পর্শগুণ কখনো জাপানি ছবির সূক্ষ্ম অলংকরণের ব্যবহারে, কখনো বাস্তুর রূপ পরিহার করে মূল স্বরূপ অবলম্বন করে এনেছেন। ছবির সঙ্গে মিলিয়েছেন গানকে। কিন্তু সূর্য ও আলো, এই দুটি তাঁর কাম্য, তাই উজ্জ্বল রঙের সংগতি ও আনন্দ সূর্যের আলোর মতোই তাঁর ছবিতে ছড়িয়ে পড়েছে প্রভাঁসের প্রকৃতির মতো। সবুজ যে কতোরকম হতে পারে, পীতের গাঢ় থেকে আভাস কতো সূক্ষ্মতা আনতে পারে, নীলের মহিমা কতো, লাল-বেগনি-পিঙ্ক কী ঐশ্বর্য নিয়ে আসতে পারে আমাদের মনের ভেতরে, তারই মনস্তাত্ত্বিক রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু এঁদের স্পষ্ট ছবির সঙ্গে কোনো যোগই নেই জীবনানন্দের কাব্যের, জীবনানন্দের কাব্য শব্দের রূপান্তরণের, অন্তস্তল সংগীতের কান্নায়, ভাবনা ও ছবির নিয়ত সংগ্রামের, কখনো অচেতন স্বপ্নের বাস্তবতা ও কামনার কোলাহলের, নরকের বীভৎসতার সঙ্গে স্বর্গের দ্যতির, সদূর বাসনার ও গতির স্রোতের। সতরাং লিরিকধর্মিতা, সূক্ষ্ম

হৃদয়াবেগকে যা প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট করে তোলে, পরাবাস্তবতা, যা অবচেতনকে স্বপ্নের আদিমতায় স্বজ্ঞার আলোকে পূর্ণতা দেয়, এবং একস্‌প্রেশনিজম্‌ বা প্রকাশধর্মিতা, যা হৃদয়ের গোপন সত্যকেই প্রকাশ করে ব্যক্তিভাবনায়—এসবই তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

সুররেয়ালিস্ত্‌ ছবি সাধারণ ছবির মতো ঐক্য গড়ে তোলে না, স্বপ্নের জাদুর মতো চিত্রের উৎকল্পনা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে, দৃশ্যবস্তু ভেঙে গলে একাকার হয়ে যায় অবচেতনের মর্জিতে, অসংলগ্ন আকস্মিকতা ভিড় করতে থাকে, এক বস্তুর সঙ্গে আর এক বস্তুর খণ্ডযোগ ঘটে, বস্তু ও বস্তুর অভ্যন্তরের আদিম ও তাৎপর্যরূপ একাকার হয়ে যায়, মর্জি-অনুযায়ী দৃশ্য ও ছবি ছোটো বড়ো হয়ে ওঠে, স্বয়ংক্রিয় বলে একসঙ্গে বিরোধী ছবির সমন্বয় ঘটে— কিন্তু সব মিলে আমাদের কল্পনার মধ্যে ঐক্য আসে, বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না, ছবিব বিন্যাসে ও অনুষঙ্গে এর সার্থকতা গড়ে ওঠে, সামগ্রিকতা আসে, এবং আমাদের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে তোলে। শিল্প যে বাস্তবের প্রতিরূপ নয়, অবচেতনের গভীরতায় তাৎপর্যময়, এই চেতনাই আধুনিক শিল্পে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত। সে-ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে পৃথিবীর বস্তুর সাদৃশ্যে, সে শুধু সাদৃশ্যই; আভাকে নিয়ে কল্পনার ব্যক্তিগত জগৎ বা রিয়্যালিটি গড়ে ওঠে, এখানেই এর সার্থকতা।

এবং ইতিহাসচেতনা জীবনানন্দ এলিঅটের থেকেই পেয়েছিলেন। ইতিহাসের মধ্যে প্রবহমানতা আর কালের মধ্যে খণ্ডিত বর্তমানের চেতনা; ইতিহাসে মানুষের চিরকালের সর্বজনীন সত্য, তা আশা আকাঙ্ক্ষায় ভালোবাসায় বেদনায় উজ্জ্বল, তার সঙ্গে একালের দ্বন্দ্ব। ইতিহাস অসীমতারই নামান্তর, এই নিয়েই মানুষ : 'বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব/স্বস্তি চায়; হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও।' (দেশ কাল সন্ততি, বেলা অবেলা কালবেলা) 'মানব ক্ষয়িত হয়না জাতি ব্যক্তির ক্ষয়ে' (ঐ, যতদিন পৃথিবীতে) মানুষ নিরন্তর ভুল করছে, অন্ধকার রহস্যে ডুবে যাচ্ছে, জীবনের কালো-রঙা মানে হয়তো তার শেষ হয় না। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তবু তার শেষ হয় না বাসনার আনন্দ, তাই জীবনানন্দ বলেন : 'অন্ধকারে সব-চেয়ে স্মরণ ভালো : যে প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।' নারীর মধ্যেই এই ইতিহাসকে মূর্ত দেখেছেন জীবনানন্দ।

ডানে বাঁয়ে ওপরে নীচে সময়ের
জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষিসূর্যের
ডানার উড্ডীন কলরোল ;
আগুনের মহান্‌ পরিধি গান করে উঠছে (সময়ের তীরে)

বর্তমান জীবনানন্দের কাছে জ্বলন্ত তিমির, কিছু জ্বলন্ত তিমির থেকে সূর্যের কলরোল শোনা যাচ্ছে, এই কলরোলই আগুনের পরিধিতে পরিণত, কিন্তু এ-আগুন গান করে ওঠে। দান্তের মতোই এই বোধ, দান্তের অনুসরণে এলিঅট লিখেছিলেন : And the fire and the rose are one. গোলাপই জীবনানন্দের কাছে গান হয়ে উঠেছে। এলিঅট একটু আগেই বলেছেন : The moment of the rose and the moments of the yew-tree Are of equal duration. A people without history. Is not redeemed from time, for history is a pattern Of timeless moments.

এই মানুষ ও ইতিহাস নিয়েই সর্বজনীনতা। এই মানষের মধ্যেই জড়িয়ে আছে প্রকৃতি। প্রকৃতি শুধু বাইরের বস্তু নয়, যে-শক্তি প্রকৃতি সৃষ্টি করছে, সেই শক্তি মানুষকেও সৃষ্টি করছে, আবার সেই শক্তি গ্রহতারা নক্ষত্র সূর্যলোকও সৃষ্টি করছে একইভাবে, এই মানুষের মধ্যে যখন শক্তির এই বিচিত্র লীলা অনুভব ও উপলব্ধির একাত্মতায় ধরা পড়ে ঐক্যানুভূতির গভীরতায়, তখন একই শক্তির অখণ্ড অনুভূতি আমাদের উপনিষদের ব্রহ্মোপলব্ধির ভেতরে নিয়ে যায়, তখন 'হ্যাঁ-না' এক হয়ে যায়, গতি-স্থিতি মিলে যায়, আগুন ও গোলাপ একই শক্তির প্রকাশ বলে মনে হয়। এবং যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবি বিশ্বের ভেতরে এই অদ্বয় অনুভবে গভীর ও মহৎ হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা এই বোধকেই সঞ্জীবিত করেছে, সংস্কারমুক্ত এই বিশ্বজনীন ধর্মীয় চেতনা তাঁকে অন্ধকারের গভীরে স্থির হতে প্রেরণা দিয়েছে। এই বোধ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই এসেছে; ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্রাহ্ম, উপনিষদের বোধ তাঁকে এই চেতনায় নিয়ে গেছে। তবু রবীন্দ্রনাথের চেতনার সঙ্গে পার্থক্য ফটে ওঠে প্রকাশের ভঙ্গিতে, জটিলতার আবহ ও অনুষঙ্গে, গভীরতর সংহতি ও চিত্রস্তনিত ধ্বনিতে, বিরোধী ভাবের একত্র সমাহারে। প্রকৃতির এই বোধ গতিমান স্থিরতায়, কিন্তু যখন কাল ও ইতিহাসের মধ্যে আসতে হয়, তখন মুহূর্তের নদীর তরঙ্গের পারম্পর্য আমাদের মানতেই হয়, বর্তমানের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎ জড়িত এবং দ্বন্দ্ব নিয়ত। জীবনানন্দ যখন কালচেতনার কথা বলেন, বর্তমান কালকেই ধরেন তিনি, যেহেতু তাঁর রোম্যান্টিক ও মিস্টিক সত্তার মধ্যে অদ্বয় বোধ রয়েছে, সেই হেতু, বর্তমানকে তিনি জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না, পারেন না বলেই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের দ্বন্দ্ব বাধে; কেননা অতীত তো স্মৃতি হয়ে নির্যাসটুকু দিচ্ছে, নির্যাসের মধ্যে সংস্কার ও বস্তুমুক্ত হৃদয়ের সর্বজনীন জলের প্রতিভা কাজ করছে, তাই স্মৃতির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বর্তমানের বিরোধ, আবার অতীতে যেহেতু এই বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে কল্পনা করেন, সেই হেতু কবিকে ভাবতে হয়, ভবিষ্যতেও এরই আবির্ভাব ঘটবে, আগুনের মহান্ পরিধি থেকে গান জেগে উঠবে, এই আশাবাদিতায় কবির চিত্ত পর্যবসিত। এমনি করে ইতিহাসের অতীত এবং আগামীকালের ইতিহাস একই সূত্রে গ্রথিত কবির কামনায়, কিন্তু দুই তীরের মাঝখানে বর্তমান সমুদ্রের গর্জনে ভীষণ, এই ভীষণতার ভয়ংকরতা থেকে যখন মুক্তি পাননা জীবনানন্দ, তখন 'বোধ' এসে হাতে হাত রাখে, তাঁর মুখোমুখি হয় আর কখনো অশান্তির শূন্যতায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আত্মহত্যা তো কামুর ভাষায় বলা যায়, পালিয়ে যাওয়া জীবন থেকে। আমি যে-মানষ, তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়ই তো আছে আমার যন্ত্রণার উপলব্ধির মাহাত্ম্যে; আমার আভিজাত্য, আমার গৌরব, আমার স্বাতন্ত্র্য, আমার এই যন্ত্রণাকে ও বিরোধকে রক্তের মধ্যে মিলিয়ে নেওয়ায়; এ যদি না হতো তাহলে মানুষের ও মানবের মৃত্যু হতো অনেককাল আগেই। সুতরাং আমার নিজের মধ্যেই বিরোধ আছে, বর্তমান ও অতীতের বিরোধ শুধু বাইরে বা বস্তুর ভাবে ও কালের ঘটনা-পরম্পরায় নয়, আমার রক্তের মধ্যে যে-চেতনার ফুল ফোটে, তা রক্তের বিরোধী। যে-নারী আমাকে জন্ম দিয়েছে, তার দেহগত অনুভব প্রকৃতির জীবজগৎ ও নিসর্গশক্তির সঙ্গে এক, তার সঙ্গে চেতনার কোনো যোগ নেই, জন্মসূত্রে তাকেই আমি এখানে অধিকার করেছি, এই অধিকারসূত্রেই পৃথিবীর প্রকৃতির সঙ্গে আদ্যাশক্তির মতো আমার অদ্বয়ানুভূতির যোগ ঘটে; কিন্তু মানুষ আরেক

শক্তিতে এই আদ্যাশক্তিকেও পরাজিত করতে চায়, তার জ্ঞানে, তার চৈতন্যে। পৃথিবীতে খুব কম কবিই আছেন, যিনি এই চেতনা বা জ্ঞান এবং জীবজগতের আদ্যাশক্তিকে পাশাপাশি বসিয়ে যুগলমূর্তিতে ধ্যান করতে পেরেছেন। দান্তে আগুন বলতে ঐ চৈতন্যকেই বোঝাচ্ছেন, আর গোলাপ হচ্ছে প্রকৃতি। এলিঅট তাকেই এক করে দিতে চেয়েছেন ধ্যানে। আগুন এমনি জ্বলে না, তাকে জ্বালাতে হয় কর্মপ্রচেষ্টায় ও জ্ঞানে, প্রকৃতির ভেতরে যে-আগুন আছে, সে আমাদের এমনি উপকার করতে আসে না, তাই চেষ্টিত আগুনের সঙ্গে চয়িত গোলাপের যোগ আমার চেতনারই মিলন। এ-ইতিহাস সমগ্র মানবজীবনের ইতিহাস, পূর্ণতার ইতিহাস। কিন্তু এই পূর্ণতা পৃথিবীতে ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! তাই বোদ্‌লেয়ারের মতো বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। যে-নারীকে আদ্যাশক্তির মতো আমার হৃদয়ের গভীরে অদ্বয় অনুভূতিতে গ্রহণ করি দেহমিলনের কিছুমাত্র পরমক্ষণে, পরমুহূর্তে চেতনায় সে বিচ্ছিন্ন; মিলনটা জৈব, এই জৈব মিলনেই পৃথিবীর ও প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ ঘটে। তান্ত্রিক দেহসাধনার এ-ছাড়া কোনো মানে আমার কাছে স্পষ্ট নয়। নারীকে সাধনার অঙ্গ করে স্বীকার করে নেবার মধ্যে এই বোধই সক্রিয়। কবির তরফ থেকে অন্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পণ্ডিতির নামান্তর মাত্র। রোম্যান্টিক কাব্যে, এতো যে ঘন বেদনায়, নারী ও প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে মুগ্ধতার অবশ বিহ্বলতা সৃষ্টি করে, তার মধ্যে এই অদ্বয় অনুভূতির গভীরতা নিহিত। জীবনানন্দও এ-সম্বন্ধে সচেতন; অন্য ভাষায় বলেছেন গদ্যে :

'মহৎ কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপারে নিয়ে নিবিড় নয় কেবলমাত্র, কিন্তু এই দুই জিনিশ মিলে এক হয়ে গেছে সেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হতে পারে যে মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিশ।'

এই ঐক্য আগুন ও গানের মতোই। এই বিশুদ্ধ কবিতাই জীবনানন্দের কাঙ্ক্ষিত। 'অন্ধকার থেকে', (বেলা অবেলা কালবেলা) কবিতায় জীবনানন্দের কাব্যের সমগ্র জীবনদর্শন ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে হয় :

প্রত্যেক মানুষই জন্মের আগে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম থাকে, মাতার দেহরক্তে প্রকৃতিই ঘুমিয়ে আছে, পৃথিবীতে জন্ম সেই ঘুম থেকে জেগে-ওঠা, তাই বিচ্ছেদের বেদনা মানুষকে অহরহ কাঁদায়, বিষণ্ণ করে তোলে, সে ফিরে যেতে চায় সেই আদিম প্রকৃতির প্রশান্ত ঘুমে, এখানে নারীই সেই অবলম্বন, অবলম্বন হলেও ব্যক্তির পার্থক্য ব্যক্তিত্বে প্রকাশ, কেননা সে তো জন্মদাত্রী নয়, তাই ব্যক্তিত্বের বিরোধ তীব্র হলে সেই আদিমতায় আর পৌঁছনো যায় না; না পৌঁছোলেই শূন্যতা, কিন্তু এই শূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে পারে মানুষ জ্ঞানে, যদিও জ্ঞান বিষণ্ণলোকী, তবু শুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হলে মানবপ্রেম উৎসারিত হয়, মানবপ্রেম এলেই 'নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি' হবে। যদিও এই শুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ জীবনানন্দের লেখায় অস্পষ্ট, তবু অনুমান করি, পরোক্ষ এবং বাঁকা পথে রবীন্দ্রনাথের 'মানষের ধর্মে'র বোধই বিশুদ্ধ জ্ঞানের অবলম্বনের পথে সাহায্য করেছে তাঁকে। পরে 'ইতিহাসযান' কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে এ-বোধ আরো সুস্পষ্ট হবে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এইভাবে : 'স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার ফলে প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে, যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই মানুষ পৃথিবীতে ব্যক্ত বা মূর্ত মানুষ নয়, এ-মানুষ আত্মা বা ব্রহ্মেরই নামান্তর। প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরেই এই আত্মা বা ব্রহ্ম রয়েছে, তবে স্বার্থেজড়িত ব্যক্তিগত মানুষ এই আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু ত্যাগের তপস্যায় যে-মুহূর্তে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে, সেই মুহূর্তে সকলের মধ্যেই আত্মার প্রকাশ দেখতে পায়, কারণ সে বহিরাবরণ ভেদ করতে পারে। এই আত্মাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানবের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানষের মধ্যে, তার প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন।

সতরাং, রবীন্দ্রনাথের 'মানষের ধর্মে'র মানুষ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছ নয়। পরের পঙ্‌ক্তিতেই বলেছেন : 'সেই মানুষের উপলব্ধিকেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।' সেই মানুষের উপলব্ধি মানে ব্রহ্মের উপলব্ধি, আর : 'মানুষ আপনজীবসীমায় বদ্ধ যে সে জৈব ও ব্যক্তিগত মানুষ, এই ব্যক্তিগত মানুষই ত্যাগের তপস্যায় মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়, মানুষ শব্দের ব্যক্তিগত অভিধা মানব শব্দের সর্বজনীন ও সর্বকালীন অনুভবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।' মানুষকে মানব হতে গেলে তার জ্ঞান আবশ্যিক, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপলব্ধিকেই এই জ্ঞান মনে করতেন। কালের ও যুগের দাবিতে এই ব্রহ্মকেই তিনি মানব বলেছেন : 'সেই মানব সেই দেবতা, যে একঃ যিনি এক, কেননা ভারতবর্ষে এই ব্রহ্মকেই তো নানা নামে পূজা করেছে।' এ-যুগে রবীন্দ্রনাথ তাকেই মানব নাম দিয়ে পূজা করতে চাইছেন। এই ব্রহ্মোপলব্ধির জ্ঞান ব্রাহ্মধর্মে রয়েছে. ব্রহ্মের স্বরূপকে জানাই বলে ব্রহ্মজ্ঞান : তিনি সত্যজ্ঞানআনন্দস্বরূপ, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, তিনি শান্ত শিব এবং অদ্বিতীয়। যে-মানুষ নিজের হৃদয়ে ব্রহ্মের এই স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সে মহাত্মা এবং সে মানবে উত্তীর্ণ হয়, এবং প্রত্যেক মানুষ যেহেতু ব্রহ্মের থেকে উদ্ভূত, সেই হেতু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম রয়েছে, সুতরাং যে-মহাত্মা নিজের হৃদয়ে ব্রহ্মের ঐ স্বরূপ অনুভব করে, পরের বা অন্য মানুষের মধ্যেও তারই প্রকাশ দেখতে পায়। এমনি করে পারস্পরিক যোগ ঘটে।

ব্রহ্মোপলব্ধির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো শুভ বুদ্ধির ধ্যান। প্রতিটি মানুষই যদি ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে ব্রহ্মের গুণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিহিত। শতগ্লানি পঙ্ক লাঞ্ছনা থাকলেও মানুষের অন্তরস্থিত ব্রহ্ম মরে না কখনো, সুতরাং পাপ ও জড়বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন মানুষকে হত্যা করা ব্রহ্মকে বা মানবেরই হত্যা বলে বিবেচিত। হেগেলের 'অ্যাব্‌সলিউটে'র চিন্তাভাবনার মতো রবীন্দ্রনাথও ভাবতেন, ব্রহ্মরূপী মানব নিয়ত মানুষের অভ্যন্তরে আসছেন; প্রেমে ও ভালোবাসায় এই আকর্ষণের জন্যেই সে চিরকাল জড়ত্বে আবৃত থাকে না, আত্মপ্রকাশের প্রয়াসে ও চেষ্টায় তাকে জীবসীমা উত্তীর্ণ হতেই হয়। এই নিয়ত শুভবুদ্ধিই মানুষকে মানব করে তুলেছে। হেগেলের 'অ্যাব্‌সলিউট' যেমন নীচে আসে, তেমনি সীমারূপী মানুষও তার কাছে তারই

আকর্ষণে এগোচ্ছে। সুতরাং ব্রহ্মশক্তি নিহিত যেমন মানুষের মধ্যে, তেমনি এই জ্ঞানের সাহায্যে তাঁর আকর্ষণকেও সে অনুভব করে বলেই সে এগিয়ে যায়। এই অগ্রগতিই রবীন্দ্রনাথ মানুষের ইতিহাসে ও ব্যক্তিজীবনে দেখেছেন, এখানেই হেগেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য, এবং আধুনিক যুগোপযোগী। কারণ, এই বোধ উপনিষদের সোহংতত্ত্বে নেই বলে মনে হয়।

ব্রহ্ম অস্বীকার্য হলেও ব্রহ্মের স্বরূপকে গুণ হিশেবে গণ্য করলে এ-যুগে মানবের চিরকালীন সর্বজনীন বোধ উপলব্ধির ধ্যানে অনায়াসে আসতে পারে। যে-লোক নিজের অন্তরে এই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত উপলব্ধি করে, সে তখন বিশ্বের মধ্যে ঐক্য ও অদ্বয় অনুভূতি পায়। এই জ্ঞানের জন্যে তপস্যা দরকার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জৈব মিলনে যেমনি অদ্বয় অনুভূতি পাওয়া যায় বিশ্বশক্তির সঙ্গে, তেমনি জৈব মিলন ব্যতিরেকেও তপস্যালব্ধ জ্ঞানে তাকে পাওয়া যায়। দুটির একই লক্ষ্য। জৈব মিলনে বাধা অনেক, কিন্তু তপস্যালব্ধ জ্ঞানে সেই বাধা অপসারিত। হয়তো কখনো দুয়েরই প্রয়োজন। জীবনানন্দ যখন জ্ঞানের কথা বলেন, তখন এই জাতীয় বোধ ছাড়া আমার অন্য কিছু মনে হয় না। এই জ্ঞানের পথেই মানুষ ইতিহাসের স্রোতে ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে, নব নীলিমা সৃষ্টি করছে। এখানেও সেই অপ্রতিরোধ্য হেগেল।

'অন্ধকার থেকে' কবিতার প্রথমেই মানুষের সৃষ্টির কথা বলেছেন :

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এই পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভেতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয় —
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান্ সাগর,
কী করে এ প্রকৃতিতে — পৃথিবীতে, আহা,
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব, — অনুভব করেছি সকলই।

সূর্য জ্বলে—কল্লোলে সাগরজল কোথাও দিগন্তে আছে, তাই
শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধুতীর।

এই জীবসৃষ্টির আনন্দ, যে-মুহূর্তে শিশু জন্ম নেয়, সেই মুহূর্তে শিশুর বিস্ময় জগৎকে ঘিরে ধরে। সিন্ধুর তীর আর শরীরের সিন্ধুর তীর এক হয়ে যায়। কিন্তু চেতনার মধ্যেই বিচ্ছেদের বেদনা ও ব্যথা :

এই সব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন
জেগে ব্যথা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে
সঞ্চারিত করে গেছে আশা আর আশা;
সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে,
সফল লোভের চেয়ে সৎ হয়ে না কি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

বিচ্ছেদের ব্যথাকে আশায় পূর্ণ করেছেন জ্ঞানে। এই জ্ঞানই আশা দিয়েছে, এই জ্ঞানই ইতিহাসচেতনা, তাই অতীতে ইতিহাসের ঘটনা স্মরণ করেছেন, দেখেছেন ইতিহাসের মধ্যে

দিয়ে চিরকালীন মানব কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে :

ইতিহাস-ধুলো-বিষ উৎসারিত ক'রে নব নবতর মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ করে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশনির্দেশী!

হয়তো এখনো তাই—তবু
রাত্রি শেষ হলে রোজ পতঙ্গ-পালক-পাতা শিশির-নিঃসৃত শুভ্র ভোরে
আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান ক'রে
অনেক দ্বেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।

এই ইতিহাসের পটভূমিতে আজকের কথা ভাবছেন, কেননা আজকের যগ গ্লানিকলঙ্কিত এবং প্রত্যেক মানুষই তাই। রক্তনদীর পারে কঙ্কাল, প্রেমের প্রেরণা নেই, শুধু শ্বাসের নির্ঝর আর পণ্যজাত শরীরের মৃত্যু-ম্লান পণ্য, প্রেম নেই বলেই সবই আজ পণ্য বলে মনে হয়, ভালোবাসাও পণ্য : 'তবও হয়তো আজ তোমরা উড্ডীন নব সূর্যের উদ্দেশে।' এই আশা ছিলো না বলেই মৃত্যু তখন এসেছিলো, 'বোধ' এসেছিলো, এই আশা যেন বাঁচিয়েছে, তেমনি সে ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, বাঁচার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকে বিশ্বাস নিয়ে। এই কথাই শেষ স্তবকে নিজের ভাষায় বলেছেন :

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানবজীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়—জানি; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানবপ্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে!
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।

এই জ্ঞানের আলোতেই তিনি মানবপ্রেম দেখেছেন অথবা মানবপ্রেমই জ্ঞান, যে-মানবপ্রেম অথবা জ্ঞানের মধ্যে শান্তি শিব ও অদ্বিতীয় রয়েছে, রয়েছে আনন্দ ও অমৃত।

জীবনানন্দের কবিতায় জীবলোকের অদ্বয় ভালোবাসা বিচ্ছেদে পণ্যজাত শরীরের পণ্য ভালোবাসা এবং পণ্য ভালোবাসার নটীর প্রেমের থেকে সফল মানবপ্রেমের নবনীলিমা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, যে-ভাষা জীবনানন্দের নিজের, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য; কারণ অনুভূতি তীব্রতায় মিশে গেছে। এই তিনটি স্তরের বোধের কথা একই সঙ্গে বহু কবিতায় জীবনানন্দ ব্যক্ত করেছেন, 'মৃত্যু স্বপ্ন সঙ্কল্প' তাদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনানন্দও বিশ্বাস করতেন মানবের হৃদয়ের ভেতরে কিছু ধ্যান কিছু স্বপ্নচ্ছটা প্রতিভার মতো থেকেই যায়, তার সাহায্যে সে একদিন জেগে ওঠে বলেই 'ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিখা' দেখতে পায়। আর এই অখণ্ড কালস্রোতের মধ্যে ধ্যান এবং মানবপ্রেমকেই দেখে; ইতিহাস তাঁর কাছে এই অখণ্ড কালস্রোত :

নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।

যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে।

'ইতিহাসযান' কবিতাটি এই সত্যকেই প্রকাশ করছে, 'যান' শব্দটির মধ্যে গতির চিরন্তন স্রোত দ্যোতিত। তবু এই কবিতাটি বিশেষ কয়েকটি কারণে আলোচনার যোগ্য মনে হয়। প্রথমত, কবিতাটির প্রথম দুটি চরণে আকাশ মাঠ রৌদ্রের এই নিসর্গপ্রকৃতি, অন্যদিকে নক্ষত্রের সৌরলোকের ছবি আছে, এই দুটো মিলে বিশ্বলোকের সৃষ্টি, এই সৃষ্টির মধ্যেই শৈশবের জীবন। পরে এই জীবন অতীত হয়ে গেছে, অতীত হয়ে গেলেও 'মহীয়ান' ও 'করুণ' রূপে এই বিশ্বলোকই কবির চোখে ধরা দিয়েছে, 'প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে/কি যেন কিসের সৌর ব্যবহারে এসে লেগে থাকে।' এই বিশ্বলোকের জীবময় পৃথিবীতেই মানুষ কর্মের সাহায্যে জীবনকে সুস্থ করতে চেয়েছে প্রথম কৃষিসভ্যতায় :

মানুষেরা এই সব পথে এসে চ'লে গেছে,—ফিরে
ফিরে আসে;—তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে তারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কি অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে— দেখে;

কর্মময় জীবনের এই রূপ অতীতে ও বর্তমানে দেখেছেন, এই কর্মময় জীবনের পার্শেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীরূপের পরিচয় তুলে ধরেছেন :

অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিল কেউ-কেউ ;
ছোট বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড় ; —
সেইখানে বই পড়া হতো কিছু— লেখা হত;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ির আলোর মতো কী যেন কেমন এক আশাবাদ ছিল
তাহাদের চোখেমুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায়;
সংসারে সমাজে দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড়;
অথবা বিজয়-পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের
এ-পিঠ ও-পিঠ শুধু; —সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

এই দুটি শ্রেণীর মানুষ নিয়েই সভ্যতা ছিলো, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যেহেতু কর্মে নির্ভর করতো না জীবিকার জন্যে, তাই পরলোকের জন্যে আশায় স্থির থাকতো, পৃথিবীতে হেরে গেলেও কোনো ক্ষোভ থাকতো না। এই সঙ্গেই প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় এদের নিবিড় নৃত্যের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এগুলি আজ নেই, এদের সন্ততিরা আজ ভীরুর মতো জীবিত। জাতীয় জীবনে অন্ধ নিঃসক্ত অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও সত্যের নিজের অধিকারেই সে প্রতিষ্ঠিত হবে। সত্য অধিগত হলে প্রাণ নক্ষত্রের দিকে নিয়ত তাকাবে : 'জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে চায়।' আর এই সততাকে মানুষ চাইলেও সে পায় না, পায় হয়তো অর্ধসত্য, নক্ষত্রের রাতের মতোন সফলতা মানুষের দূরবীনে

রয়ে গেছে, জ্যোতির্গ্রন্থে, জীবনের জন্যে আজও নেই। সত্যই হচ্ছে জ্ঞান, এখানেই জীবনানন্দ জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট কথা বলেছেন :

—জ্ঞান বড় দূর পৃথিবীর
রুক্ষ গন্ধে; আমাদের জন্যে দূর—দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই,—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।

এই জ্ঞান হচ্ছে জীবনানন্দের কাছে সময়ের ব্যাপ্তির, সময়কে ধরে আছে জীবজগৎ ও প্রকৃতি, সুতরাং বৃহৎবাচিক ব্রহ্মই সময়ের ব্যাপ্তির মধ্যে কাজ করছে, কিন্তু একালের মানুষ যৌন যৌথ মালিন্যে জড়িত। তাই সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ এসে ভয়াবহ ডাইনির মতো নাচে, ভয়ে লুকোই গুহায়; ব্রহ্মে লীন হওয়া, লুকিয়ে যাওয়াই পৃথিবীর থেকে, সেই কথাই বলেছেন :

লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্ম শব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দু হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনও লুপ্ত হইনি তো।

রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বচরাচরে প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় নিজের হৃদয়কে সম্প্রসারিত করে দিতে চেয়েছেন : 'এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে ঘুরে যায়।' সকল উৎসই গতি, মানুষের হৃদয়ের পাখি জ্যোতির পথের থেকে সাগরের সূর্যের স্পর্শে 'প্রমথী দীপ্তি' লাভ করে, তাই ইতিহাসের আলোর অর্ঘ্য চারিদিকে ছড়ানো; এই গতি থেকেই প্রগতির জন্ম, প্রগতির মানুষ মানব হয় এবং প্রেমিক হয়ে ওঠে অন্তর্দীপ্ত হয়ে। ইতিহাস এই গতি, গতি থেকে প্রগতি, প্রগতির ভেতর থাকে মানবপ্রেম :

...তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনও আসে নি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বার বার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয়, আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে ; তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি থাকে স্থিরতর;
সে অনেক প্রতারণাপ্রতিভার সেতুলোক পার
হল বলে স্থির; —হতে হবে বলে দীন, প্রমাণ, কঠিন;
তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে ...;

এই মানবপ্রেমই বঙ্কিমের ঈশ্বরভক্তি, এই মানবপ্রেমেই অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধিতে মহাত্মারাও জীবনউৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে। জীবনানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মের উপলব্ধি না থাকলেও তাঁর আইডিয়ার নির্যাস আছে, আর আছে হেগেলীয় বিবর্তনের গতিবাদ, যে-গতি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রগতির পথে এগোয়।

জীবনানন্দের কাছে ইতিহাসচেতনা—এই বিশ্বাস, যা ভবিষ্যতের দিকে এগোয়, কিন্তু যা আছে তা মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতার বোধ, বোধের অপরদিকেই আছে জীবপ্রকৃতিতে মিলিয়ে যাবার বাসনা, এই বাসনা কখনো দূর স্বপ্নে পর্যবসিত হয়েছে।

'ঝরা পালকে'ই ইতিহাসচেতনা 'পিরামিড' কবিতায় ধরা পড়েছিলো, কিন্তু পিরামিড অতীতে স্থির, কবি তাকে বর্তমানের প্রাণ দিয়ে সঞ্জীবিত করতে চাইছেন, কিন্তু সম্ভব হয় নি। 'বনলতা সেন' কবিতায় অতীত বর্তমানে এসে মিশেছে, বর্তমানে ক্লান্ত প্রাণ অতীতের স্বপ্নের সঙ্গে মিলে বর্তমানে দুদণ্ড শান্তি পেতে চেয়েছে, সন্ধ্যার অন্ধকারে যেখানে স্বপ্নের আদিমতা কথা কয়, কিন্তু ভবিষ্যতের কোনো কথা নেই, আছে 'সাতটি তারার তিমির' থেকে। তবে জীবনানন্দ এর মধ্যে অনেক মৃত্যুর উপলব্ধি পেরিয়ে এসেছেন, তাই পৌঁছেছেন তিনকালের অখণ্ডতায়।

'ঝরা পালকে' 'সেদিন এ-ধরণীর' কবিতায় মর্ত্যপ্রীতি ব্যক্ত, কিন্তু এই মর্ত্যপ্রীতি শুধু সুন্দর জিনিশের সমাহার নয়, সৃষ্টির অখণ্ডরূপ ভালোমন্দ একসঙ্গে মিশে গেছে; হেমন্তের ভিজে ঘাস, জোনাকির ঝাড়, আলেয়ার লাল মাঠ, শ্মশানের খেয়াঘাট, কঙ্কালের রাশি, দাউ দাউ চিতা, পিতামহ, পিতা, মৃত গোক্ষুরার ফণা, যোনিচক্র, স্মৃতি—তাঁর মনে কাজ করছে। এই অখণ্ডতাই পরে জীবনমৃত্যুকে এক করে দিয়েছে, কারণ অখণ্ড সময়স্রোতের জীবনমৃত্যু দটি পদার্থ মাত্র এবং একটির সঙ্গে মানষের হৃদয়ে ও শরীরে কাজ করছে, একেই জীবনানন্দ নারীর কথায় ও রূপে অনুভব করেছেন! 'তুমি কথা বল—আমি জীবনমৃত্যুর শব্দ শুনি।' এ ইতিহাসচেতনা থেকে এসেছে। 'ঝরা পালকে' এ-ছাড়া আছে রিক্ততার ছবি, যা বর্তমানের রূপকে প্রকট করে : 'সাপিনীর মত বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ/ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, হিম স্তন—হিম রোমকূপ।'

কবিতার ভাববস্তুকে এতো বিস্তারিত করবার উদ্দেশ্য কবিতার রূপকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা। বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন রূপ ও রীতি গ্রহণ করা হয়েছে! 'ঝরা পালকে' একটি বক্তব্য ও অনুভূতি এককভাবে ইঙ্গিতে ও পরে বিস্তৃত হয়েছে, এবং দুটি অনুভব পর পর এসেছে। 'পিরামিড' কবিতায় স্তব্ধ জড়তা জুড়ে আছে প্রথম দিকে, শেষে শুধু প্রাণ সঞ্জীবিত করবার প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু পরে ইতিহাসে গতির বিপুল বেগ, উত্থানপতন ও সংঘর্ষ, উত্তালতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর স্রোতের মতো বিস্তীর্ণ তরঙ্গের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহে প্রকাশ করেছেন; 'ইতিহাসযান' কবিতার শেষ বাক্যটি সতেরো পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত, বিস্তারিত। সতেরো পঙ্‌ক্তির বাক্যের স্রোতে কতো বিরোধী বিপরীতমখী ঢেউ উঠছে নামছে, কিন্তু ইতিহাসের স্রোতের নিয়ত গতির বেগে এগিয়ে যাচ্ছে! এবং আর যেখানে স্তব্ধ বেদনায় আনন্দের নাচ জ্যোৎস্নার প্রান্তরে দুলে উঠছে বাতাসের মর্ম মর্মরে, সেখানেও গূঢ় গভীর জটিলতা ও বিরোধী চেতনা ও ছবি আমাদের সজাগ ও মুগ্ধ করে অখণ্ডতার প্রবাহে; যেখানে স্থবির যুবা তরুণীকে নিজের জিনিশ করছে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, সেখানেও এরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে : 'অর্ধ সত্যে অর্ধ নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে।' যেহেতু এ-জীবনে যতো সত্যই আমরা পাই-না কেন, অখণ্ড সত্য তো পাইনা, কারণ মৃত্যুর পর মৃত্যুর উপলব্ধি জীবনে কতোখানি ধরা পড়ে এর অর্ধ সত্যের জন্যে, আমাদের আনন্দের নৃত্যও অর্ধ এবং মৃত্যুও অর্ধেক, অথচ জীবনে এই সবগুলিই একবৃন্তে ফটে আছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের পার্থক্য, ঘন নিবিড়তায় সংহতিতে ঐক্য ও

সংঘর্ষে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ‘শ্রাবণ ঘন গহন মোহে/নিশার মত নীরব হে/সবার দিঠি এড়ায়ে এলে’; শ্রাবণের নীরব নিশার কোনো ক্রিয়াময় ছবির স্পষ্টতা নেই; ‘নীরব’ই প্রধান। জীবনানন্দ বলেছেন : ‘সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে’; সন্ধ্যার নীরবতার সঙ্গে শিশিরের শব্দ মিশে গেছে, তেমনি সন্ধ্যায় একটি ঘটনাও জড়িত। আর পার্থিব জগতে কোনো ব্যাপারই স্তব্ধতার এককে মিশে থাকে না, নীরবতার মধ্যেও ধ্বনি আমাদের চৈতন্যকে জাগ্রত করে, পূর্ণ করে। এই বোধেই জীবনানন্দের কবিতা সার্থক। এগুলি সবই এসেছে ভাবনার ও চিন্তার পথ ধরে। এ-ছাড়া সংগীতের সুর ও রঙ্ তো আছেই। ঘটনাবহুলতা তাঁর কয়েকটি কবিতায় আছে, কিন্তু ভাবনা বা অনভূতির ক্রমাগ্রসরতা পরিণামমুখী হয়ে ওঠে বিরোধ মিলিয়ে।

ভাষাদর্শন ও জীবনানন্দের ভাষা

কাব্যের আলোচনায় ভাষা ও শব্দ একটি প্রধান স্থান। ভাষা বা শব্দই বাক্য, বাক্য থেকেই কাব্য। সংখ্যা-পরিমাণে শব্দের কোনো আলো জ্বলে না। একজন কবি একই শব্দ বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু ওই একই শব্দ বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্নার্থক, বাক্যই ভিন্ন। এই ভিন্ন অর্থ না বুঝে একজন কবিকে এই বলে বিশিষ্ট করা যায় না যে ইনি তাঁর সমগ্রকাব্যে এতোগুলো শব্দ বারংবার ব্যবহার করেছেন। ওই একই শব্দের বিভিন্ন দ্যুতি দিয়ে কবি একটি শিখা জ্বালিয়ে দেখতে চান তাঁর অভীষ্ট বস্তুকে। কোনো কথা দিয়েই কোনো কিছুকে স্পষ্ট যথাযথ বোঝানো যায় না, অন্তত কবিরা বোঝাতে পারেন না; তাই অন্ধকারে আলো জ্বালাতে হয় শব্দের পাথরের চকমকি ঠুকে।

ভাষায় অনেক রকম প্রশ্ন জড়িয়ে আছে; আমাদের দেশে শব্দের, ভাষার, বাক্যের বিভিন্ন শক্তি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা বলেন শব্দের অর্থই চিরন্তন, এই অর্থ বাক্যের মধ্যে পাল্টায় না, বাক্যে শুধ বিন্যস্ত হয়ে ওই অর্থেরই বিস্তার ঘটায়—এই মনোভাব জীবনের ক্ষেত্রে সত্য নয়, জীবনের ক্ষেত্রে সত্য নয় বলে কাব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। সংবেদনায় আমরা যেমন প্রতি মুহূর্তে পাল্টাচ্ছি, এগোচ্ছি, চলছি, হাঁটছি, বাক্যের মধ্যে শব্দও এমনিভাবে পাল্টায়, সব কিছুকে সম্পর্কে বাঁধে, কিছু ছেড়ে কিছু গ্রহণ করে। এই পরিবর্তনময় সম্পর্কের মধ্যে, বাক্যের একটা ঐক্য গড়ে ওঠে। এই ঐক্যের মধ্যে শব্দের নিশ্চিত অভিধা অনুভবে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাসনা আকাঙ্ক্ষা এই অনুষঙ্গকে অনেক দূরে নিয়ে যায়, নূতন তাৎপর্য এনে দেয়। এগুলি ঘটবার পেছনে একটি দার্শনিক চিরন্তন রহস্য কাজ করে। শব্দ দিয়ে আমরা বস্তুকে, প্রকৃতিকে, বহির্জগৎকে পেতে চাই, বহির্জগৎ প্রকৃতির ছলনার মতো বিদ্যুৎ ঝলকের হাসি হেসে উঠে চলে যায়, শূন্যে মিলোয়, এই সব যাওয়া, শূন্যে মেলানো প্রকৃতিকে আমরা বুকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধতে চাই, বাঁধতে গিয়ে আমরা নিজেদের একটা জগৎ তৈরি করি আমাদের চিন্তাভাবনায় ও যুক্তিতে। এই চিন্তাভাবনা ও যুক্তির মধ্যে স্মৃতি-আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ অতীত-ভবিষ্যৎ, সেই সঙ্গে বর্তমান কাজ করে। আমি যখন শব্দ বা বাক্য তৈরি করি, তখন এই প্রক্রিয়া চলে, আমার শব্দ বা বাক্য যখন কেউ শোনে, তার মধ্যেও এই একই প্রক্রিয়া চলে। দুই প্রক্রিয়া দুজন মানুষ অনুযায়ী ভিন্নপথে চললেও যুক্তিতে একটা ঐক্য গড়ে তুলতে চায়, এই 'কন্‌সেপ্ট' পুরোপুরি এক হয় না, কেননা কন্‌সেপ্ট বা মনের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবনা অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে। তবু মানুষেরই ভাবনা, সেই ভাবনা মানুষেরই ঐক্য। এমনিভাবে শব্দে বা বাক্যে একটি কন্‌সেপ্টজাত ঐক্য সাধারণীকৃত হয়ে ওঠে। এই ঐক্য বিশ্বমানবের চৈতন্যের। তবু ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটা কাল্পনিক।

এই ঐক্য এবং ঐক্যহীনতা দুটো একই সঙ্গে বাক্যের অর্থের মধ্যে কাজ করে। একটা ঐক্য মনের মধ্যে আছে বলেই বাক্য শুনে বা পড়েই বুঝতে পারি তৎক্ষণাৎ, বুঝতে গিয়ে দেখি যে-ঐক্য আমার মধ্যে আছে, তা ঠিক নয়, তবু ঐ ঐক্যের সূত্রেই পরিবর্তনের চঞ্চলতাকে নিজের মধ্যে সাজিয়ে নিতে চাই। এই স্থিরতা ও অস্থিরতা অদ্ভুতভাবে বাক্যের

মধ্যে পদের সমন্বয়ে কাজ করে। শব্দও জন্মায়, থাকে, হয়ে-ওঠা থেকে হওয়াতে আসে, বাড়ে, পরিণামী হয়ে ওঠে, পরিণামের পর ক্ষয়, ক্ষয়ের পর ধ্বংস, ধ্বংসের পরেও আর এক ধ্বংস আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে, এই পরিণামী ধ্বংসকে আমরা দেখতে চাই না, যেমন আমার প্রিয়ার মৃত্যুর পর তার মুখ অগ্নিসংযোগে পঞ্চভূতে মিশে যেতে দেখতে চাই না, কিন্তু এই পরিবর্তন অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে-রূপ গড়ে উঠেছিলো, সেইরূপ নেই বলে এ পরিবর্তনে আমরা আর এগোতে চাই না, মানুষের বুদ্ধির এই সীমা জীবনকে ধরে আছে, কিন্তু জীবনের মধ্যে এই সত্য আরো দূরে নিয়ে যায়। এমনি চলতে গিয়ে কিছুকে পাই, কিছু ভেঙে যায়, কিন্তু ওই কিছু ভাঙা নিয়েই অনন্ত জীবনের স্রোত চলেছে, ভাষার মধ্যেও এই লীলা।

আমার নিজের বিশ্বাস, এই লীলাকে স্পষ্ট ভালোভাবে ব্যাখ্যা ও অনুভব করা যায় বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সম্পর্কে। অনন্ত পরিবর্তনের চঞ্চলতা ক্রিয়ার মধ্যে আছে। এই চঞ্চলতার সক্রিয়তা সবকিছু নাড়িয়ে দেয়, আর বিশেষ্য তাকে ধরে স্থির থাকতে চায়, নতুবা স্থির বিশেষ্যকে ক্রিয়া নাড়িয়ে দিয়ে নিয়ত এগোয়। এই বিশেষ্য-ক্রিয়ার সম্পর্কের মধ্যে স্থির ও অস্থিরতার লীলা চলেছে। বিশেষ্য চিত্রে ও ধারণায় স্থির এবং সঙ্কেতবহ। ছবি ও ধারণা কখন মিশে যায় বোঝা যায় না। বোঝা যায় না বলেই সঙ্কেতের মধ্যে কিছু চঞ্চলতা কাজ করে। কিন্তু তাহলেও বিশেষ্য স্থির। এবং এই বিশেষ্য উদ্দেশ্য ও বিধেয় ক্রিয়ার দ্বারা চালিত হয়। এই অর্থে বিশেষণকে বিশেষ্যেরই একটি অংশরূপে ধরতে হয়।

‘প্রতীত্যসমুৎপাদে’র চিন্তা ও একালের ‘ফেনোমেনোলজি’কে অদ্ভুতভাবে ক্রিয়ার উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। অনন্ত অনুভবময় বেদ্য মুহূর্ত পরিবর্তনের স্রোতে এগোয়, তাকে বাঁধতে চাই, পারি না, জোর করে বাঁধি যুক্তিতে, কার্যকারণে বিন্যস্ত করি, কার্যকারণে বাঁধতে গিয়ে সময়কে হারাই, অথচ সময়ের স্রোত ক্রিয়ার মধ্যে থাকে। ক্রিয়ার মধ্যে নানা উপাদান জড়িয়ে আছে, চেষ্টা-ব্যাপার-ক্রিয়া, তার ফলে ক্রিয়াকে দেখে কখনো মনে হয় যে সে বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করছে, কখনো নিজেই ঘটছে, কখনো বস্তু নিয়ন্ত্রিত করছে ক্রিয়াকে, আসলে সেখানে ক্রিয়াই চলছে। হওয়াটা একটা ঘটনা ও ক্রিয়া থাকাটাও একটা ক্রিয়া, এবং নিয়ত পরিবর্তমান সময়ে নির্দিষ্ট। তাই ধাতুর দুটো দিক : ক্রিয়াবচন ও ভাববচন।

এই ক্রিয়ার সাহায্যেই বাক্যের মধ্যে পদের সম্পর্ক ও সচলতা ও সময়ের চঞ্চলতা অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। ক্রিয়া চলতে চলতে কিছুর মধ্যে সামান্যক্ষণের জন্য থামে, কিন্তু থামার মধ্যেও তার কাজ চলতে থাকে। আমরা খাই, তারপরই খাওয়া, খাওয়ার পরই খাবার হয়, এবং খাবারের মধ্যেও স্মৃতিতে আমরা কিছু খেতে থাকি।

২

একালে ভাষাদর্শনের আলোচনা একটা ফ্যাশন, এই ফ্যাশনকে তাড়িত করেছে গণিত। যেন গণিতের মধ্যে ভাষাকে বন্ধ করা যায়; গণিত আনবার মূল লক্ষ্য হলো বিষয়কে গৌরবান্বিত করে তোলা ও সর্বসাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা, কিন্তু গণিতের বিন্দুর জ্ঞান যার আছে সে জানে ব্যাপারটা কতোখানি কাল্পনিক। ‘মহাভাষ্য’ ‘বাক্যপদীয়’ ‘শব্দশক্তিপ্রকাশিকা’-র তুলনায় একালের ভাষা ও দর্শন একান্তই

ফিকে বলে মনে হয়। মুশকিল হচ্ছে, এগুলি আমরা ভালো করে বুঝতে চাই না, আর যাঁরা জানেন, তাঁরাও ঠিক ভাল করে বোঝাতে পারেন না।

সম্প্রতি ভাষায় মোটামুটি তিনটি দিক আলোচিত হয : কার্যকারিতা গঠন ও রূপান্তর। কার্যকারিতার মধ্যে প্রকাশ আবেদন ও নির্দেশনা থাকে। বক্তা শ্রোতা ও বিষয়ই প্রকাশ আবেদন ও নির্দেশনাকে একসঙ্গে গ্রথিত করে। সংযোগ রীতি ও বাণী এমনিভাবেই চলে। আমরা আবেগের বিস্ময়ে কিছ প্রকাশ করতে চাই, কখনো নির্দেশ দিই, কখনো ঘটনাকে উপস্থাপিত করি, শব্দের সঙ্কেত শুনি, ভাষা থেকেও ভাষার বাইরে কিছু থাকে যা বক্তা ও শ্রোতার ধ্বনির মধ্যে প্রকাশ পায়, আর থাকে কবিতার ধ্বনিময় ব্যঞ্জনা। এই সমস্ত কার্যকারিতাই ভাষার মধ্যে থাকে। ভাষার গঠনের মধ্যে আছে সাধারণভাবে ব্যাবহারিক দিক। প্রত্যক্ষতার মধ্যেই গঠনের বৈশিষ্ট্য। এখানে মনের ব্যাপার কিছু নেই, উচ্চারণের ওপরেই সব নির্ভরশীল, উচ্চারণ ও উচ্চারণের শ্রেণীভাগ করাই এই রীতির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং উচ্চারণের ভাগ ও গোষ্ঠীবদ্ধ করবার ওপরই এর কৃতিত্ব। কিছু কিছু ধ্বনির সাম্য আছে উচ্চারণে, তাদের এক করতে হবে, এক করবার পর আবার তাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে হবে। এমনিভাবেই উপস্থাপনা ও বর্ণনা বস্তুগত হয়ে ওঠে, মনের ব্যাপারটা রহস্যময় করে তোলে না। শব্দার্থতত্ত্বেও এই ব্যাপারটা ঘটে, অর্থকে বাদ দিয়ে শুধ শব্দের ধ্বনির ওপর সমস্ত অর্থ ও মনোভাব নির্ভর করে। সুতরাং ধ্বনির ওপরই অর্থ নির্ভরশীল, এই কারণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা অনিবার্য।

রূপান্তরের ব্যাকরণ এসে ভাষাদর্শনকে অনেকটা ধাক্কা দিয়েছে। আমাদের দেশের অখণ্ড বাক্যার্থের ভাবনার সঙ্গে এই চিন্তার যথেষ্ট মিল। চোমস্কি বলেন : ভাষার মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্ব ও সংস্কৃতির ইতিহাস জড়িত। সুতরাং ভাষাকে ঐ সামগ্রিক পূর্ণতায় দেখতে হবে।

ভাষার মধ্যে তিনটি রূপাদর্শ ঠিক করেছেন তিনি : সমাপিকা ক্রিয়ার স্তর, বাক্যাংশ। এর দুটো দিক ব্যাকরণ অংশের সমস্ত কিছুকে চালিত করে। সমাপিকা ক্রিয়ার স্তর সঞ্চারিত করে সমস্ত কিছু। বাক্যাংশ স্তর বাক্যে শব্দ থেকে শব্দে রূপান্তরণের চেয়েও প্রতীকের কাজ করে; বাক্যের পদাংশ বিশেষ্য-ক্রিয়া পদস্থাপিত করে। পদবিন্যাসের সাহায্যে এর বিশ্লেষণ হয় গঠন-ভাষাতত্ত্বের রীতিতে। এবং এই দুটি পদ বাক্যের অনন্ত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে। অসীম সম্ভাবনা থাকলেও তা শুধু ব্যাকরণগত।

ধ্বনিপরম্পরায় বা পদবিন্যাসে ভাষার বাক্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারা যায় না। বাক্যগঠনের মধ্যে বড়ো ধরনের ইউনিট বা একক ধরতে হয়, এই একক অব্যবহিত উপাদান।

এর মধ্যে অনেক প্রক্রিয়া কাজ করে, সংযোজক অব্যয়, কর্তৃ-কর্মবাচ্য-সম্পর্ক প্রভৃতি। 'শ্যাম এবং যদু' অর্থে বিভিন্ন রকম, শ্যাম/এবং যদু, শ্যামএবং/যদু,যদু শ্যাম/এবং যদু, এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য? 'আমি মিলিকে ভালোবাসি', 'মিলি আমার দ্বারা ভালোবাসিত হয়'—এ দুটো বাক্য এক নয়, ব্যাকরণের চেয়েও শব্দার্থতত্ত্বে একে ব্যাখ্যা করতে হয়, আবার একে পরিপূর্ণভাবে শব্দগুচ্ছ দিয়েও প্রকাশ করতে পারা যায় না। এ সমস্যাকে দূর করতে পারা যায় বাক্যের এককে; সরল, ঘোষণাধর্মী ও কর্তৃবাচ্য বাক্যে।

অন্য বাক্যগুলি হলো রূপান্তরের। চোম্‌স্কি প্রায় ভারতীয় মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে প্রকৃত বাক্যে রূপান্তর কার্যকর হয় না, বিমূর্ত গঠনের ওপর রূপান্তর কার্যকর হয়। প্রতীকের ছোঁয়া থাকে বাক্যের মধ্যে। এই বিমূর্ত গঠন বা প্রতীক 'বাক্যপদীয়ে'র ভাষায় যৌক্তিক বিন্যাস।

ব্যাকরণের তিনটি অংশ। প্রথমটি পদগুচ্ছের গঠননীতি-পরম্পরা, তৃতীয়টি শব্দধ্বনি- পরম্পরা, প্রথম ও তৃতীয় অংশকে যুক্ত করে দ্বিতীয় অংশ, রূপান্তবণের নীতির পরম্পরা কাজ করে। এই নীতি অংশকে বিন্যস্ত করে, বাক্যের একককে যুক্ত বা বর্জন করে। পদগুচ্ছ এবং ধ্বনিসমষ্টি অর্থের অস্পষ্টতা আনতে বাধ্য। 'উড়ন্ত আকাশ' বিশেষণ + বিশেষ্য, কিন্তু 'উড়ন্ত' ক্রিয়া, পদগুচ্ছ ক্রিয়া থেকে রূপান্তরিত, এই ক্রিয়া 'আকাশ'কে রূপান্তরিত করেছে, একে ক্রিয়া ধরবো, না বিশেষণ ধরবো, দুটো একেবারে ভিন্ন, এইভাবে অস্পষ্টতা অনিবার্য। গাঠনিকভাষাতত্ত্ব এই অস্পষ্টতা দূর করতে পারে না বলেই রূপান্তরণ প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যেই বাক্যগঠনরীতি প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণায় শব্দার্থতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে মাত্র, বাক্যরীতি সৃষ্টি করে।

বাক্যের মধ্যে মূল ভিত্তি আছে, এই ভিত্তিস্তর বাক্যের বহুবিধ ভিত্তিস্তরকে চালিত করে, এই বহুবিধ গঠনগত বর্ণনা এবং পদচিহ্ন অনুষঙ্গের মতো জড়িত আছে। ভিত্তিস্তরে পদচিহ্নগুলিকে মৌলিক এককরূপে ধরা যায়। এই মৌলিক একক বা ইউনিট থেকেই গূঢ় গঠন তৈরি হয়। বাক্যের উপাদান আবার 'রূপান্তরধর্মী' গৌণ উপাদানকে ধরে আছে। এই রূপান্তরধর্মী গৌণ উপাদানগুলি ওপরের গঠনকে চালিত ও সঞ্জীবিত করে, ওপরের ও গূঢ় গঠনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। গূঢ় বা গভীর গঠন হচ্ছে শব্দার্থতত্ত্ব, উপাদানের বস্তু ; শব্দার্থতত্ত্ব এগুলিকে ব্যাখ্যা করে, ওপরের গঠন হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্বের উপাদানের বস্তু; ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা নির্দেশিত করে। ভেতরে শব্দার্থতত্ত্ব, ওপরে ধ্বনিতত্ত্ব-গঠন, এই দুটি গঠনকে যোগ করছে বা চালিত করছে বলা যায় ভিত্তিস্তর, সম্পর্ক তৈরি করছে দুয়ের মধ্যে, এর নিয়ন্তা ব্যাকরণের প্রভাব। এই সম্পর্ক গড়ে তোলে, ব্যাকরণের ব্যাক্যগঠনের উপাদান, তার ফলেই বাক্য নতুন গড়ে ওঠে। ভেতরের শব্দার্থতত্ত্ব-গঠন এমনি বিমূর্ত, রূপহীন; কিন্তু সম্পর্কের নাড়ায় ধ্বনিকে প্রকাশ করে রূপময় বিভায়। এমনিভাবে ভেতরের স্থিরতা বাইরের চঞ্চলতায় পরিবর্তিত হয়ে রূপ লাভ করে, অরূপের জগৎ থেকে রূপের জগতে উঠে আসে।

আর যেটিকে ভিত্তিস্তর বলা হয়েছে, তার মধ্যে আভিধানিক শব্দ ও ক্যাটিগরিক্যাল গৌণ উপাদান আছে। ক্যাটিগরিক্যাল গৌণ উপাদান বলতে বোঝায় কতগুলি নিয়ম। এই নিয়মগুলি ব্যাকরণের সম্পর্কের নিশ্চিত নিয়মের সংজ্ঞার্থ দেয়, এবং ব্যাকরণের সম্পর্কই শব্দার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যাকে নির্ধারিত করে। অন্তর্নিহিত বিমূর্ত উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করে; এই নিহিত উপাদানগুলিই বাক্যের পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে। আর অভিধানের মধ্যে আছে শব্দ; ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব দুটোই এর মধ্যে আছে।

তাই রূপান্তরধর্মী ব্যাকরণে কর্মকর্তৃবাচ্যকে বাক্যের রূপান্তরে জোর দেওয়া হয়; দ্বিতীয়ত জোর দেওয়া হয় ওপরের ও নীচের গঠনের ওপর, সেগুলিকে প্রায় একই রকম দেখতে। আপাতত মনে হয় শব্দ অর্থে প্রায় একই, শব্দার্থতত্ত্বের বিচারে গভীর গঠন

বিশ্লেষণ করলে এর পৃথক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারা যায়। অর্থের ওপরই বিষয় নির্ভর করে, তার পরিবর্তনই বাক্যে রূপময় হয়ে ওঠে।

এই পরিবর্তন শব্দের ও অর্থের নূতন ব্যাখ্যাও করেও, যদিও মনে হয়, করে না। এবং বাক্যের মধ্যে যে-পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তন সবক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ বাক্যে বিশেষভাবে শব্দ ও অর্থের পরিবর্তন সম্ভাবিত করে। অভাবাত্মক, কর্মবাচ্য, ঘোষণাধর্মী প্রভৃতি বাক্যকে ভাবাত্মক কর্তৃবাচ্য প্রশ্নবোধক বাক্যের রূপান্তর হিশেবে গণ্য করা যায় না। এসব বাক্যের মধ্যে যে-পদচিহ্ন আছে তারা বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণের মতো কাজ করে, রূপান্তরকে সমর্থ করে। সুতরাং ভিত্তিস্তরের উপাদানের মধ্যে একটা আধা-পরিবর্তনধর্মী নিয়ম আছে।

একটি উদাহরণে একে প্রকাশ করা যায় : 'আমি মিলিকে বই পড়াবো।' 'আমি' বাক্যের কর্তা, মনে হয়, 'আমি' এই কর্তা সমস্ত বাক্যটির পদগুলি চালিত করে, 'ক্রিয়াবচন ধাতু' কাজ করছে; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় বাক্যের অর্থ অন্যবিধ হয়ে উঠেছে। 'মিলি' কর্ম, 'বই পড়ানোর' কর্ম, এর সঙ্গেও তার যোগ বেশি। বই পড়ছে মিলি, সুতরাং সে যুক্ত হচ্ছে এখানে বিষয়ে, কর্তায়। এমনিভাবে দেখা যায় ব্যাকরণের দিক থেকে যে-গঠন জন্মাচ্ছে তা নেহাতই গঠনগত, ব্যাকরণের গঠনগত রূপের অন্তরালে ব্যাকরণগত ক্রিয়া অন্তর্শায়ী হয়ে আছে। ব্যাকরণগত ক্যাটিগ্যারি বা শ্রেণী হচ্ছে বিশেষ্য-ক্রিয়া প্রভৃতি। কার্যকারিতা হচ্ছে সম্বন্ধজাত, বিভিন্ন সম্পর্কে বাঁধছে সকলকে। এমনিভাবে শ্রেণী অর্থাৎ ক্যাটিগ্যারি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বাঁধছে, যুক্ত হয়ে বাক্য নতুন হয়ে ওঠে। 'কর্মের সম্পর্ক হচ্ছে ক্রিয়া + বিশেষ্য-পদরূপজাত ক্রিয়াপদের বিশেষ্যপদের সঙ্গে সমগ্র ক্রিয়াপদের ও প্রভৃতির সম্পর্কের মধ্যে এর সমগ্রতা'।[১]

সুতরাং বাক্যের মধ্যে শ্রেণী বা ক্যাটিগ্যারি ছাড়া মূল ব্যাপার হচ্ছে দুটো, সম্পর্ক ও কার্যকারিতা, 'রিলেশন ও ফাংশন'। এখন কার্যকারিতা সম্পর্ক বাঁধে, না, সম্পর্ক কার্যকারিতাকে বাঁধে, তা নির্ভর করে বাক্যের সামগ্রিকতার ওপর। তার ব্যাখ্যা 'বাক্যপদীয়ে' যতো চমৎকারভাবে আছে, চোম্‌স্কি তা দেখাতে পারেন নি। তবে বাক্যগঠনরীতিতে এই রীতিই অনুসৃত হয়েছে। এর পর গূঢ় গঠন, ওপরের গঠনের সংজ্ঞার্থ ও শ্রেণীভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করতে চেয়েছেন। ধ্বনিতত্ত্বের সাধারণগ্রাহ্য মতকে পরিহার করেছেন নূতন শব্দ নিয়ে, ফনোলজি ও ফোনেটিক এক নয়, যাকে ফোনেমিক বলা হয় তা-ও সাধারণভাবে নিশ্চয় নয়, পরিবর্তনধর্মী ও জটিল। উচ্চারিত শব্দের ধ্বনি যেভাবে উপস্থাপিত হয় তার জন্যে ধ্বনিচিহ্নের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দরকার, এই চিহ্ন বাক্যের ব্যাকরণগত গঠনের সম্পর্কে কোনো সংবাদ দিতো না, কিন্তু বাক্য যখন রূপান্তর করে, তখন ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা বাক্যের গঠনকে রূপান্তরিত করে, কিছু নতুন সংবাদ আনে। বাক্য ও শব্দগঠন মাত্র দুটি রূপকেই রূপান্তরিত করে এই ধ্বনিতত্ত্ব। এবং শব্দার্থতত্ত্বও এখানে নতুন রূপে ব্যাখ্যাত হয়, অভিধানের অর্থ ও উপলব্ধির অর্থ এই রূপান্তরে মিশে যায়। বাক্যের পদে বাক্যসম্পর্কিত অর্থ, শব্দার্থতত্ত্বগত এর বিশিষ্টার্থক ভিন্ন অর্থ—একই সঙ্গে দ্যোতিত হয়ে ওঠে।

---

[১] Object of is the relation between the N P of a V. P of the form V+NP and whole V P etc

চোম্‌স্কি খুব জোর দিয়ে বলেছেন : সূত্ররীতি তালিকা গঠন অবয়ব প্রভৃতি করে ভাষার ও বাক্যের অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনার চঞ্চল গতিকে রুদ্ধ করতে পারা যায় না। ভাষা ব্যবহারের পক্ষে বলে না, মনের সমর্থ শক্তিকে প্রকাশ করে। সুতরাং, একটি বাক্যের সমগ্রতা যখন বুঝি, তখন অনুষঙ্গ, পূর্বে শোনা শব্দের ধ্বনিসাম্য ও তার স্মৃতি এবং অর্থ কাজ করে না, আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক সামর্থ্যের সামগ্রিকতা প্রকাশ পায়। এই সামর্থ্য সহজাত মানুষের মধ্যে। এই কারণেই পৃথিবীর সমগ্র মানুষের কাছে সাধারণীকৃত হয়ে ওঠে।

জানি না, চোম্‌স্কি তার এই পরিবর্তনগত ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কাণ্টের জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন কিনা। বিচিত্রের মধ্যে সহজাত ও সাধারণীকরণ সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

এই ভাষাতত্ত্বে জ্ঞান বা জানাই বিশেষভাবে প্রধান হয়ে ওঠে। যে-ব্যক্তি ভাষা ব্যবহার করে, এবং যে-ব্যক্তি ভাষা শোনে ও বোঝে, দুয়েরই হৃদয়ে ভাষার মধ্যে দিয়ে এক প্রকার স্বজ্ঞা এবং নীরব জ্ঞানক্রিয়া চলে। ব্যাকরণই এটা সাহায্য করে, স্বজ্ঞা ও জ্ঞানক্রিয়া আছে বলে এই ভাষাতত্ত্বে সহজাত, সাধারণীকৃত সৃষ্টিধর্মিতা প্রভৃতির কথা এসেছে। কেননা এই শব্দগুলি ঠিক ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের মধ্যে আসে না। চোম্‌স্কির এই বক্তব্যের সঙ্গে পতঞ্জলির এই বাক্যটি পড়তে পারি : 'এষাম্ পদানাম্ সামান্যে বর্তমানানাম্ যৎ বিশেষে অবস্থানম্ স বাক্যার্থঃ। বাকার্থের মধ্যে সামান্য ও বিশেষ দুইই থাকে। পদগুচ্ছের বিশেষ অবস্থান থেকে বাক্যের মধ্যে পরিবর্তনের সাহায্যে সামান্য বর্তমানে প্রতীত হয়ে ওঠে। এ-সম্বন্ধে আমাদের টীকাকারদের ব্যাখ্যা অসামান্য। এখানে আমি তা বলতে চাই না।

৩

কবিরা নারীকে হৃদয় ও দেহ দিয়ে যতো না ভালোবাসে, শব্দকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

শব্দের মধ্যে নিশ্চয় কিছুটা বস্তুজগৎ আছে। বস্তুজগতের ধ্যান আমাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়, ধ্যানে অনুভূতিতে একটা পরিপূর্ণ স্পষ্ট বাস্তব জগৎ ও রূপ গড়ে ওঠে, এই বাস্তব জগৎ ও রূপ মিথের মতো জাদুতে দুলতে থাকে, এটা মিথ্যা পুরাণ কাহিনীর ঘটনা নয়, অনুভব ও চেতনার আনন্দময় সৃষ্টির মুক্তি। প্রত্যেকটি শব্দই তখন নতুন স্বতন্ত্র বিশিষ্ট জগৎ। বাক্যে জগতের এই সম্পর্ক।

রবীন্দ্রনাথের গানে এর সার্থক উদাহরণ, কবিতাতেও আছে, তবে সর্বত্র নয়। একালে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই শব্দের জগৎ এবং বাক্য, এই জগতের সম্পর্ক অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতার ভাষায় বাক্যে এবং বাক্যপরম্পরা ও বিন্যাসে; অর্থ দিয়ে একে বোঝা যায় না; ভাষার গতিপ্রকৃতি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দেখেই এর অর্থ বুঝতে হয়। ভাষা ব্যতিরেকে চিন্তা সম্ভব মনের মধ্যে নীরবে—এই কথা চোম্‌স্কি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। কিন্তু কবিতায় ভাষা ছাড়া অনুভব নেই, অনুভব ছাড়া ভাষা হয়ে-ওঠে না, অনুভবেই ভাষা আস্তে আস্তে মনের ভেতরে অদ্ভুত রঙিন খেলাঘর তৈরি করে, সারারাত জাগে, অবশ হয়ে যায়। সেই শব্দময় জগতের পরিপূর্ণতার মধ্যেই কবির সাধনার পরিপূর্ণতা। কবির ভাষার মধ্যেই তাঁর মনের সামর্থ্য সামগ্রিকভাবে ধরা পড়ে।

৪

'বাক্যপদীয়' অথবা চোম্‌স্কীয় রীতিতে যদি কবিতার বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে কিছু অর্থ ও আস্বাদনেই নবীনতা গ্রহণ করতে পারা যাবে। জীবনানন্দের কবিতার ভাষা স্পষ্ট নয়, অন্তত সুধীন্দ্রনাথ যে-অর্থে জীবনানন্দকে অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিতার ভাষার দার্ঢ্য লুকিয়ে আছে অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতায় ও ঘন সংহতিতে। জীবনানন্দ নিয়ত এগোন, এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান, থমকে দাঁড়ানো ক্ষণকালের মুহূর্তের, কিন্তু তাঁকে থামানো যায় না। এই রীতি তাঁর কবিতার প্রথম থেকেই ছিলো :

মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি—
অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু; নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে ;

এখানে তিনটি বাক্যে তিনটি ছবি, হেমন্তের 'বিদায়' 'কুহেলি' 'স্মৃতিব শ্মশান' এই বিষণ্ণ হতাশায় পটভূমিকায় নবোৎফুল্লা মাধবীর গান জাগছে : ক্রিয়াপদগুলি কিছু করছে না, শুধু হচ্ছে, এই কর্তাবিহীন ক্রিয়ায় একপ্রকার নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়, এই নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠাতেই সব ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় ;
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন-স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে,
এইখানে আমার নক্‌টার্ন।

মৃগীর রূপ ও চিতার বিস্ময় মিশে মৃগীর রূপের স্পষ্টতা হারিয়ে যায় রূপময় অধরা বিস্ময়ে, এবং চিত্তবৃত্তির সমস্ত বোধ সৌন্দর্যে মিশে যাচ্ছে, হয়ে-উঠতে উঠতে, মিশে যেতে-যেতে আমাদের মনের ক্রিয়া ও নীরব জ্ঞান কখন থেমে যায়, তাই শেষ বাক্যে আর কোনো 'হওয়া', 'থাকা', 'করা' কোনো ক্রিয়া নেই : 'এইখানে আমার নক্‌টার্ন'। সব মিলে রাত্রির দৃশ্য পূর্ণ হয়ে ওঠে, ব্যাপ্তমহিমায় নীরবতায় স্থির হতে চাই :

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

ধ্বনির ব্যঞ্জনা এর প্রথম অভিঘাত তৈরি করে, 'সব পাখি', 'সব নদী', 'অন্ধকার', 'মুখোমুখি' শব্দার্থের সঙ্কেত বিশিষ্টতা থেকে সামান্যে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাক্যের প্যাটার্ন আমাদের হারিয়ে দেয়, বাক্যার্থের পরিপূর্ণতা শুধু সামান্যের অনুভব তৈরি করছে না, অনুভব সামান্য হয়ে অসীমে যাচ্ছে। এই অসীমতার বোধই জীবনানন্দের কবিতার প্রাণ। সব পাখি ঘরে আসবার পর সব নদী আর ক্রিয়ার চালিত হচ্ছে না, নিজেই চলে আসছে, পাখির চলা ও নদীর চলা জীবনের সমগ্রতার মধ্যে শেষ হয়ে যায়, একটি বাক্যের মধ্যেই তিনটি বাক্য, 'আসা', 'যাওয়া' 'চলা' শেষে ফুরিয়ে গেলে শেষে থাকে অস্তিত্ব (থাকে)।

হতে হতে, থাকে, থাকবার পরই ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলো। চোখের সামনে বনলতা সেনের অস্তিত্ব বিরাট হয়ে আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। এই গূঢ় চঞ্চলতা কখন থেমে যায় আমাদের হৃদয়ে! জীবনানন্দের কবিতায় এই ক্রিয়াহীনতাজাত বিশেষ্যের বিশিষ্ট রূপ পরিণামে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে :

দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো
যে-নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো
কবে যেন—আজকে হারিয়ে গেছে সব;
ভুলে গেছি পটভূমি—ভুলে গেছি কে যে সেই নারী
চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়েছিল কীসব গভীর পল্লব;
যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোনো হরিতের—নব হরিতের
সংগীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
এ-জন্মের—আরো দূর জন্ম-জন্মান্তের মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি
আলোর ভালোবাসা

সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে
জ্বালিয়ে শ্যামল নীল ব্যথা হ'তে চায়।
আমি সেই মহাতরু—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়—
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ ক'রে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

জন্ম ও মৃত্যুর ঢেউ-এর চঞ্চলতা, এই দুয়ের মাঝখানে জীবনের ক্ষণিকের আলো, নারীর মতো মনকে নীল, রৌদ্রনীল শ্যামল করে তোলে, শ্যামল ও নীল হলে দান্তের মতো ফুল ও আগুন এখানে বৃক্ষ ও আগুনের মতো নাভোচারী হতে-হতে সংগীত হয়ে ওঠে, সংগীত হলেই মানুষের ভাষায় লীলা ও শরীর লুপ্ত হয়ে যায়, এর অসীমতার মধ্যেই জন্ম-জন্মান্তরের অনাদি আলোব ভালোবাসা যা উপনিষদের আলো পৃথিবীর আকাশের নীচে মানুষের বুকে শ্যামল নীল ব্যথা হতে চায়। মানুষের বুকে ব্যথা হয়ে-ওঠার জন্যেই জীবনের ক্ষণিকের আলোর নীলের উদ্‌ভাস, এই নীলের উদ্‌ভাস কেমনভাবে অসীমতার প্রাণের আলোয় শ্যামল নীল ব্যথা হয়, তারই প্রক্রিয়া ভাষায় ধ্বনিতে ব্যঞ্জনায় সঙ্কেতে বলেছেন জীবনানন্দ। এই অনুভব পৃথিবীর নয়, মানুষের, তাই ব্যথা শেষে আছে, মানুষই উপলব্ধি করে, বা মানুষের উপলব্ধিতেই অনাদি ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে। বৃক্ষ ও আগুন, এলিঅটের গোলাপ ও আগুনের মতো বিরোধী, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মতো পাশাপাশি, শরীর ও আত্মার মতো একান্ত। বৃক্ষের অস্তিত্বে থাকা ও হয়ে-ওঠা, পৃথিবীর প্রাণের সবুজ প্রতীকিত। এই পৃথিবীর মর্ত্যের বিশেষের হয়ে-ওঠার নির্বিশেষতা প্রকাশ পেয়েছে পরের বাক্যে।

শ্যামলনীল ব্যথা হয়ে-ওঠাকে মূর্ত করবার জন্যে শব্দধ্বনি অর্থকে কাজে লাগিয়েছেন চোদ্দটি পঙ্‌ক্তিতে। এই হয়ে-ওঠার শেষ নেই, ড্যাশগুলির মধ্যে দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে চাইছেন : 'মনে হয় যেন কোনো হরিতের—নব হরিতের সংগীতে'; হরিৎ বলতেই হয়ে-ওঠা আর এক হরিতের নবরূপ দেখছেন, এই নব হরিৎ সংগীত হয়ে উঠছে। সংগীতের অসীমতা অনাদি আলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, এমনি করে থামছে না কোথাও, হয়ে উঠছে, হচ্ছে, জাগাচ্ছে। কিন্তু কিছুই করছে না, করবার মধ্যে যে-কর্তৃত্ব, এই অনুভবে তা ধরা পড়ে না। আর জীবনানন্দ এ-যুগে কবি হিশেবে কর্তৃত্বে তিনি কী করতে পারতেন? করতে পারা সামাজিকের কর্তব্য; হয়ে-ওঠা 'হওয়া' সাধকের প্রেমিকের পাগলের লক্ষ্য, উপনিষদের ঋষি ঋত দৃষ্টিতে এমনি হয়ে ওঠেন। পরের বাক্যে এই হয়ে-ওঠার ব্যাপ্তিই প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণই মহাতরু, আর তুমি সেই প্রাণের আলো। প্রাণকে অনাদির সূর্য নীলিমায়, অর্থাৎ কোটি কোটি জন্মজন্মান্তরে প্রাণের আলো সেই ঔপনিষদিক বিশ্বশক্তি জাগিয়েছে, জাগিয়েছে বলেই সে শুধু হয়ে উঠেছে ঊর্ধ্বচারী হয়ে, ঊর্ধ্বচারিতার মধ্যে এক উদ্বর্তনের ইতিহাস আছে, সীমা অনবরত অসীমের দিকে উঠছে, সে অসীম নেমে এসেছিলো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সীমায়, সেই সীমাই ঊর্ধ্বচারী হয়ে ওঠে তাকে পাবার আশায় আকঙ্ক্ষায় ভালোবাসার স্বপ্নে। প্রাণ যখন প্রাণের আলোয় জাগে, তখনই সে নিত্য অবিনাশ স্বর শুনতে পায়, সেই অবিনাশ স্বর প্রেমের আলোর ভালোবাসা, বিশ্বপ্রাণের এই স্বর আনন্দের, এই স্বর আনন্দের ও আলোকের এবং এই স্বর আনন্দ থেকে জাত আলোকের, এবং এই আলোক সৃষ্টির বীজের অনাদি অন্ধকার গড়ে তোলে, সৃষ্টির অন্ধকারের মুগ্ধ বিহ্বলতায় এসে মেশে, এই স্বরের প্রভাবেই আনন্দ থেকে আলোক জাগছে, আলোক থেকে অন্ধকার জাগছে, এবং আনন্দ আলোক অন্ধকার সব মিলে একটি স্থানে বিহ্বলতা সৃষ্টি করছে, এই বিহ্বলতায় সব মিশে যায়, মিশে গেলে তৈরি করে 'অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।' শেষের বাক্যে কোনো সকর্মক বা অকর্মক ক্রিয়া নেই। একটি অসমাপিকা ক্রিয়া 'ক'রে' আছে, অসমাপিকা ক্রিয়া অধিকরণে 'বিহ্বলতায়' এসে ক্ষণিকের জন্যে বিরাম পায়। এই বিরামের মুহূর্তেই আর এক নতুন সৃষ্টিক্রিয়া আনন্দের আলোকের অন্ধকারে ত্বরান্বিত করে, এই সৃষ্টিক্রিয়ায় সমুদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে লাবণ্যসাগর, এই লাবণ্যসাগর স্থিরবিন্দুর মতো অনাদির শূন্যতায় নিরবয়ব নয়, কারণ অনুভবেই তো এই জগৎ, তাই তো শ্যামলনীল ব্যথা, শ্যামলনীল ব্যথা থেকে যে-লাবণ্যসাগর জাগে, অনুভবের ব্যথাতেই তা মর্মরিত হয়। এই মর্মর সবুজের অর্থাৎ প্রাণের। এই প্রাণের মর্মরিত লাবণ্যসাগরের অনুভবকেই প্রকাশ করেছেন হয়ে-ওঠার ব্যাপ্ততায়।

জীবনানন্দের মধ্যে এই ঔপনিষদিক বোধই হয়ে-ওঠার অবসানে মিলনের সর্বব্যাপী জাগরণকে সম্ভব করে তোলে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো আকস্মিক উদ্‌ভাসনে নয়, পৃথিবীর ও প্রাণের পাকে-পাকে, এবং এটা বাক্যার্থেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দের একটি কবিতা : 'কুড়ি বছর পরে' ও আনুষঙ্গিক

'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসঙ্কলনে নির্বাচিত করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে কবিতাটি সংশোধিত হয়েছিলো। এই সংশোধিত কবিতাটির মধ্যেই জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কবিতায় আধুনিকতার মুদ্রা চিহ্নিত বলে মনে করি।

এ-যুগ ব্যক্ত হয়েছে দুটি শব্দে, নির্জন খড়ের মাঠ, যেখানে শস্য তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৌষের সন্ধ্যা এবং শীতের সন্ধ্যা। যেখানে প্রকৃতির সজীবতা নষ্ট। এবং বিপরীতে ফুটে উঠেছে নরম নদীর নারী, নদী ও নারী এক হয়ে গেছে। এই নদী ও নারী ফুটিয়ে তুলেছে ফুল রিক্ত নি:স্বতা মধ্যে। কিন্তু এই ফুলও কুয়াশার। শীতের সন্ধ্যার কুয়াশাই ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। আবার এই নরম নদী ও নারী স্পষ্ট হচ্ছে পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো। সন্ধ্যার পর সময় এগোচ্ছে, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আকন্দ-ধুন্দুলে জোনাকি ভরে গেছে, অদ্ভুত ছবি : ফসলশূন্য মাঠ এবং তারই ওপরে চাঁদ—এ-যেন এলিঅটের এপিগ্রাম ও আয়রনি—ফসল ফলাবার কোনো সাধ নেই—এই রিক্ততা অনুর্বরতা যুগের চারধারে।

আমরা অর্থাৎ মানুষেরা, হেঁটেছি; দেখেছি; আবার এই আমরাই অন্ধকারে শীতরাত্রিকে ভালোবেসেছি এবং এই শীতরাত্রি দীর্ঘ ও অন্ধকারময়—রবীন্দ্রসূর্যালোকিত জগতের উল্টো। এ-যুগের মানুষের শীতের অন্ধকার রাত্রিই মুগ্ধ করে। খড়ের চালের ওপর পুরনো প্যাঁচার ডানা-ঝাপটানো অস্বস্তি যৌবনের নয়, বয়স্ক বৃদ্ধ প্যাঁচার ঘ্রাণ, যেন মৃত্যুর ঘ্রাণ—অন্ধকারের মধ্যেই সে হারিয়ে যায়। মানষ বুঝেছে, একালে তার ভাগ্য দিবালোকের নয়। শীতের অপরূপ রাত অন্ধকার ও ঠাণ্ডা—যেখানে প্রাণকে সঞ্জীবিত উজ্জীবিত করে না। অন্ধকারে রাত্রিতেই শূন্য মাঠে-মাঠে ডানা ভাসিয়ে আনন্দ পায়। গভীর আহ্লাদে ভরা—রাত্রিবেলা, শীতের অন্ধকারে, অশত্থের ডালে বক ডাকে—তার রাত্রিতে শান্তি নেই। এবং দ্বিতীয় স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে এ-যুগের সিদ্ধান্ত : 'আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক।' কুহক মানে ভেল্‌কি প্রতারণা মায়া। এই প্রতারণা ও মায়া নিভৃত অর্থাৎ গূঢ় নিহিত। প্রকৃতিচিত্রের মধ্যেই এই প্রতারণা এবং প্রকৃতিচিত্রই মানুষের ও যুগের জীবন, কিন্তু ধ্বনি ও সুরের সংগীতে প্রবহমান, বাইরের বাস্তবতা গানের সুরে ভেতরে এসে নতন রূপ পেয়েছে—গানের সুরের স্পর্শেই একদিকে মাদকতা, অন্যদিকে গভীরতা, যে-গভীরতায় হৃদয়ের অভিজ্ঞতা ও সততা পাঠককে স্পর্শ করে। 'কবি' কবিতায় জীবনানন্দ নিজের বৈশিষ্ট্য রূপক-উপমায় অদ্ভুতভাবে ব্যক্ত করেছেন : 'হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে/কারে আহা/কাঁদে হাহা পুবের বাতাস,/শ্মশানের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস।' শ্মশানের বকে পিপাসার শ্বাসেই জীবনানন্দ জীবিত। মানুষ দেখেছে বুনো হাঁস—মানুষই—আদিম সরল মানুষ শিকারের গুলির আঘাতের শব্দে এড়িয়ে গিয়ে দিগন্তের নম্রনীল জ্যোৎস্নার ভিতরে উড়ে যায়—পালিয়ে যায় স্বপ্নের দেশে মৃত্যুর কঠিন আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে। এই মৃত্যুভীত জীবন থেকে যে-সব মানুষ ভালোবেসে ধানের গুচ্ছে হাত রেখেছে—সজীবতা ও উর্বরতার স্পর্শ পেতে চেয়েছে, শান্ত জীবনের মতো ঘরে ফিরতে চেয়েছে—যেমন কাক

সন্ধ্যাকালে ঘরের—নীড়ের আকাঙ্ক্ষায় ঘরে ফেরে; ঘরে ফিরে শিশুর মুখের গন্ধ পায়; ঘাসে রোদ মাছরাঙা নক্ষত্র আকাশকে পায় জীবনে চিরায়ত অর্থে—কারণ জীবনের ক্ষেত্রে এগুলিই তো সত্য : 'আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারো মাস।' প্রকৃতির সত্যের মতো জীবনেও সত্য এই সব · 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হলুদ হয়ে যায়'—ঋতুর সত্যের যুগের রূপ ধরা পড়ে, হেমন্তের অঘ্রানের অন্ধকার, সবুজ পাতার হলুদ হয়ে যাওয়া—বিবর্ণ জীবন স্পষ্ট। এ শুধু ছবি মনে হয়। ছবির সঙ্গে সুব, সুরই ছবিকে মনে ও পৃথিবীতে নদীর জলের মতো তরলভাবে ছড়িয়ে দেয়—কিন্তু ছবির ভেতরেই জীবনানন্দের বক্তব্য বা উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। এজরা পাউণ্ড চিত্রকল্পের মধ্যে বুদ্ধি-আবেগমিশ্রিত জটিলতার গহন গভীরতা দেখতে চেয়েছিলেন; এবং কোনো কোনো শব্দ প্রতীকের মতো ব্যবহৃত। যেখানে ছবি অনুভূতি ও আইডিয়া একই সঙ্গে প্রকাশিত—সঙ্গে সুর—যা ভালেরির কাব্যের মূল সুর—প্রেরণা অর্থে 'চরণ' কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে। হিজল গাছেব আলোছায়ায় যেন জানলা তৈরি করেছে, সেখানে আলো আর বুলবুলি খেলা করছে। শীতের রাতে ইঁদুর বেশমের মতো বোমে খুদ মেখেছে—'ইঁদুর শীতের বাতে বেশমের রোমে মাখিয়েছে খুদ',—ওপরের দিক থেকে দেখলে অপূর্ব ছবি, যে-ছবির মধ্যে দৃশ্যগুণেব মতো স্পর্শগুণও আরো গভীরতায় নিয়ে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা কোনো মর্মান্তিক ক্ষয়ের রাজ্যে নিয়ে যায়, ইঁদুর আর খুদ শব্দ দুটির মধ্যেই প্রকাশ করেছেন কবি। যেমন এলিঅট করেছেন 'পড়ো জমি'তে। চালেব গন্ধ নয়, চালেব ধূসর গন্ধ। এই ধূসবতাই কবিব কাঙ্ক্ষিত, ধূসব গন্ধ তরঙ্গ হযে উঠেছে, চালের গন্ধ বললে স্পষ্ট হয় না, স্পষ্টতা এলো ধূসরতায়—সেটাই তরঙ্গ হযে উঠেছে, নির্জন মাছের চোখে—মাছ চাল খায় ঠিকই—কিন্তু এই চাল জীবনকেও খায়—ঘুমের ঘ্রাণে সন্ধ্যার আঁধারে পুকুরেব পাড়ে হাঁসেরা পড়ে থাকে—জীবনের স্পন্দন নেই, প্রজননেব ব্যস্ততা নেই—'র' ধ্বনির অনুপ্রাসের সংগীত পাঠকদেবও ঘম পাড়িয়ে দেয়—তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেয়েলি হাতের স্পর্শ। সংসার, জীবন, এবং নারীর মুগ্ধতা ও আদিমতা, সৃষ্টির নিহিত বেদনা।

চাবদিকে দেখছেন, মিনারের মতো সোনালি চিলকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায। আর নীচে বেতেব লতায চড়ুইয়ের ডিম শক্ত হয়। এই শক্ত হওয়া কি মরে যাওয়া আব সোনালি চিল মেঘে চলে যাওযা কি জীবন থেকে পালিযে যাওযা! কেননা চিলতো জীবনানন্দের প্রেমিক পুরুষ—এরি মধ্যে গভীর জীবন, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, নরম জলের গন্ধমাখা নদী, সেই আদি ও আদিমতম প্রাণেব তৃষ্ণা জলো গন্ধে এই প্রাণ পৃথিবীকে জড়াতে চায়, রবীন্দ্রনাথের সমুদ্র ও তীবের আলিঙ্গনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাব মতো—তাই এই নদী তীরটিকে মাখে—ছোঁয না—নারী ও পুরুষ মিলিত হলে যেমন মাখামাখি করে তেমনি মাখামাখি করে আছে নদী ও তীর—কিন্তু ববীন্দ্রনাথের মতো উচ্চকিত নয়; এবং এমনিভাবে ছবি আলতোভাবে এঁকেছেন জলরঙ দিয়ে—ভাষা এখানে বাহন নয়। সংগীত বলেই চেতনা ও অবচেতনাকে প্রকাশ করে—এই উপলব্ধিই বেদনা ও ব্যথা। জ্যোৎস্নায় খড়ের চালেব ছায়া উঠোনে পড়েছে—শাশ্বত বাংলাদেশের ছবি ঝিঁঝির শব্দকে গন্ধে রূপান্তরিত করেছেন। বৈশাখের প্রান্তরে সবুজ বাতাস—চিরন্তন বাংলার

বারোমাসের বিচিত্র রঙিন ছবি সুরে তুলে ধরেছেন; জীবনের গাঢ় আকাঙ্ক্ষা নোনার বুকের রসেই জীবনের স্বাদ বাড়ায়। শুধু বট নয়, বিশেষণে নিবিড় বট, পাতায় গভীর হয়ে বন তৈরি করে—সেই বটের নীচে লাল লাল ফল পড়ে আছে; নির্জন মাঠও নদীর সঙ্গে মেলে, নিজের মুখ দেখে, আর নীল আকাশ আরো নীল হয়ে ওঠে। এবং বেদনার ছোঁয়ার মতো নারীর চোখের মৃদু চাহনি বর্ষাদিনের ছায়ার আলোর মতো চকিতে একবার দুলিয়ে দিয়েছেন কবি : 'পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে।'

শুপুরি গাছের ছায়া বেয়ে সন্ধ্যা নামে, ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ভোর আসে প্রতিদিন—এ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুর। ফুলের মতো প্রভাত ফুটে ওঠে—এ যেমন পল্লিপ্রকৃতির অদ্ভুত ছবি হৃদয়ের গভীরে এসে স্বাভাবিক নিসর্গের অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞতার বেদনায় কল্পনাপ্রতিভার সততায় সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; তেমনি স্বপ্নের কল্পমায়াকে তুলে ধরেছেন কবি পরের স্তবকে : এই প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবনের পরেই আমাদের বেদনার আর্কিটাইপ, পৃথিবীর স্বপ্নের সেই অদেখা কন্যা এসে অন্ধকারে নদীদের কথা কয়—নদী ও নারী আবার এক হয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তব জীবন থেকে টেনে এনে বিচ্ছিন্ন করেই এক নতুন আলো দেখাতে চান, যেমন নারী, নিভৃত শরীরেই গোপন ফুল থাকে, প্রেমে ভালোবাসায় পুরুষ তাকে আবিষ্কার করে, বেষ্টিত সর্পের মাথায়ই ফণি থাকে—যেমন এলুয়ার তাঁর কবিতায় করতে চেয়েছেন।

এই স্বপ্নের নারীর দেহে বিকেলবেলার ধূসরতা, কিন্তু দৈনন্দিনতায় তাকে ছোঁয়া যায় না, তা থেকে বেরিয়ে এলেই তার স্থির আলো দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র, এমনকি অমিয় চক্রবর্তীও, এই চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিতে পারেন নি। ফলে বাস্তবতা দৈনন্দিনতা প্রাত্যহিকতা ও সংবাদপত্রমূলকতা তাঁদের কবিতাকে নষ্ট করেছে। তাই যুগের দাবি মেটালেও যুগ থেকে উঠে আসে নি। জীবনানন্দ পৃথিবীর কঙ্কাবতী অর্থাৎ সাধারণ নারীকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে তার ম্লান রূপের শরীর গড়ে তুলেছেন। এখানেই বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতীর সঙ্গে জীবনানন্দের কঙ্কাবতীর প্রভেদ—খুব সূক্ষ্মভাবে জীবনানন্দ বদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভার পার্থক্য দেখিয়েছেন 'কঙ্কাবতী' এই শব্দ ব্যবহার করে : বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' পৃথিবীরই রক্তেমাংসে জৈব রয়ে গেছে, প্যাশন তীব্র, স্পর্শের পরই উধাও, তাকে রূপান্তরিত করতে পারেন নি ধূপের শরীরে। এই ধূপের শরীরের মধ্যে রোম্যাণ্টিকতা চিরকালীন হয়ে বেদনায় শাশ্বত হয়ে যায়। চার থেকে সপ্তম স্তবক পর্যন্ত চিরন্তন প্রকৃতি এবং শাশ্বত স্বপ্ন রোম্যাণ্টিকতাকে হাল্‌কা রঙের ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন অবক্ষয় রিক্ততা নিঃস্বতার বিপরীতে—দুই বিপরীতে সমগ্রতা আসছে—এই সমগ্রতা যখন এক হয়ে যায় একটি শিখায়—তখনই নিটোল ফর্ম তৈরি হয়।

শেষ স্তবকে 'মৃত্যুর আগে' এই শব্দটিতে একটি দার্শনিক প্রত্যয় অকস্মাৎ দীপ্তি পেয়েছে—জন্মের আগে অন্ধকার, মৃত্যুর অন্ধকারের আগে সামান্য আলোয় এই বিচিত্র রঙিন গন্ধময় ছবি দেখে মুগ্ধ মুগ্ধভাব পেছনে আর কিছুই বুঝতে চাই না। মৃত্যুর আগে এই মুগ্ধতাই জেগে থাকে। এই মুগ্ধতাই আশ্চর্যবোধ নিয়ে আসে, 'আহা' শব্দে তারই রূপ : 'জানিনা কি আহা'; তারপরই তো মৃত্যু, এই মৃত্যু দেয়ালের মতো শক্ত কঠিন ও

ধূসর; ধূসর কঠিন দেয়ালে জীবনের 'রাঙা কামনা' আঘাত খায়, 'রাঙা কামনার' শব্দে মোহিতলালের অভিভব আছে লুকিয়ে। 'রাঙা কামনা' ও 'ধূসর মৃত্যুর দেয়াল'—দুটি স্পষ্ট রঙকে ব্যক্ত করেছেন জীবনানন্দ, দুটোরই মূল্য সমান, 'ধূসর' ও 'অন্ধকার' শব্দ দুটি জীবনানন্দের কাছে প্রতীকরূপে এসেছে, যেমন হেমন্ত, প্যাঁচা, চিল, ঘাস, কুয়াশা—এর মধ্যে দিয়েই তিনি জীবনের উপলব্ধিকে বোঝাতে চেয়েছেন। এরপরেই স্বপ্নের ছবির সুরের কথা বলা ছেড়ে দিয়ে জীবনানন্দবিরোধী জীবনানন্দ বক্তব্যের প্রকাশে হঠাৎ তৎপর হয়েছেন; হয়তো বড়ো কবিতায় হতেই হয় : 'একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল/যাহা নিরুত্তর শান্তি পায়'। অতীত পৃথিবীর স্বপ্ন সোনা ও শান্তি ছিলো—তার জন্যে কবির নস্টাল্‌জিয়া—তাকে আর ফিরে পাবে না বলে চিরন্তন ব্যথা যন্ত্রণা। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় যা আরো তীব্র। জীবনানন্দের বিশেষণ প্রয়োগে তাঁর কবিপ্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত, শান্তির আগে 'নিরুত্তর নিঃস্বার্থ আগুন'—শান্তির মধ্যে যদি কথা থাকে, উত্তর পাওয়া যায় না। সে-শান্তি প্রকৃত শান্তি নয়। স্বপ্ন সোনা ও শান্তি মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে—জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে এই স্বপ্ন সোনা ও শান্তির মায়া দরকার—এখানেই রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দে গোপনে গোপনে নিভৃত চারণা করেছেন। যার কথা জীবনানন্দ স্বীকার করেছেন প্রবন্ধে। এই মায়া অনির্বচনীয়, আনন্দবর্ধনের সূক্ষ্ম ধ্বনি। যদিও উৎপ্রেক্ষার 'যেন' সন্দেহ জাগায়, কিন্তু এই অনির্বচনীয় মায়া সুস্থির না হলে জীবনে কোনো মূল্য থাকে না। জীবনের এই অনির্বচনীয় মায়া ছাড়া কবি আর কিছুই বুঝতে চান না? 'কি বুঝিতে চাই আর?' রৌদ্র নিভে গেলে অর্থাৎ রাত্রি এলে নীড়ে-ফেরা পাখিদের শব্দ শুনেছেন। এই অন্ধকারে প্রান্তরের কুয়াশায় অর্থাৎ মৃত্যুতে কাক উড়ে গেছে। জীবনানন্দের কবিতায় 'কাক' প্রাণের এক নতুন দ্যোতনা নিয়ে এসেছে রবীন্দ্রবিরোধিতায়, পো-এর প্রভাব কিনা কে জানে! রবীন্দ্রনাথ কোথাও বলেছিলেন পাখিদের মধ্যে কাক দেখতে ও ব্যবহারে কৎসিত—জীবনানন্দ তাকেই কবিতায় নতুন রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রবিরোধিতা এখানেও। বিভিন্ন বিরোধের মধ্যে রিক্ততা নিঃস্বতা মৃত্যুর সঙ্গে প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে আশাকে জড়িয়ে, স্বপ্ন সোনা শান্তিকে মিলিয়ে। মৃত্যুর আগে জীবনকে সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে একটা সামগ্রিক ঐক্য দিয়েছেন কবিতায় কবি, এলিঅট কাব্যের ম্যানিফেস্টোর শেষে বলেছেন, বহুলোকেই সৎ অনুভূতির প্রকাশ চায় কবিতায় (যেমন রবীন্দ্রনাথ); অল্প সংখ্যক লোক টেক্‌নিকের উৎকর্ষকে ত্যাগ করে এবং খুব কম লোকেই জানে কখন তাৎপর্যময় ইমোশনের প্রকাশ ঘটে। যদিও ক্লাইভ বেলের অনুকরণেই এলিঅট বলেছেন। এই কবিতায় জীবনানন্দ এই তিনটিকেই একসঙ্গে মিলিয়ে অগ্নিময় একটি শিখা তৈরি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতায় প্রশংসনীয়তা যেমন দেখেছেন, তেমনি ভাষার ব্যবহারে জরবদস্তি লক্ষ করেছেন। এই জবরদস্তিকে মুদ্রাদোষ এবং মুদ্রাদোষজনিত ওস্তাদি বলে অভিহিত করেছেন। এবং সিদ্ধান্ত করেছেন : 'বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্বসম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয়, বরং উল্টো'! শব্দ ও অর্থের মিলনে অন্তর-আলোড়নের থেকে পদবিন্যাসে সব মিলে কবির অভিপ্রেত অর্থ ঔচিত্য ও জাদতে অতলনীয় সমগ্র কবিতায়—এখানেই বৈদগ্ধ্যভঙ্গি—শব্দের লক্ষণীয় রীতিবিন্যাস।

উপমা-নির্মাণে ও সহজ প্রকাশে যেমন কবিত্ব—রিচার্ড্‌সের ভাষায়, তেমনি নিজের ভাষাকে নিজের মতো তৈরি করবার জন্যে দুমড়ে-মুচড়ে উল্টেপাল্টে বিশেষ্যকে বিশেষণে, বিশেষণকে বিশেষ্যে, দেশি তদ্‌ভব তৎসমের সাংগীতিক বিন্যাসে, পদের ক্রমপরিবর্তন করে, অভীপ্সিত অর্থের জন্যে পরনো শব্দকে নূতন অর্থে, অপরিচিত শব্দকে নূতন চেতনায়, যতি-চিহ্ন ও ছেদ-চিহ্ন উল্টে দিয়ে—ড্যাশ-হাইফেন ব্যবহার করে—এক নূতন সৃষ্টির পর্যায়ে আনতেই হয়। ব্রাউনিঙ্‌ ও হপ্‌কিন্‌স কি এই কর্ম করেন নি! আগে র‍্যাঁবো। এমন কি প্রশ্নবোধকতাও নূতন অর্থ নিয়ে আসে। কখনো কখনো প্রচলিত ছন্দকে ভেঙে, ক্রমকে অস্বীকার করে, অকস্মাৎ প্রবহমানতা এনে, টানা চালকে আটকে দিয়ে—নিজের মতো নতুন রূপ তৈরি করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে যেটা মুদ্রাদোষ—জীবনানন্দের কাছে সেটা ভাষার বৈশিষ্ট্য। কবিতা শব্দ ও ভাষাতেই লেখা হয়—অন্তত মালার্মে বলতেন। যে-যুগে শান্তি সুদূর পরাহত, সেখানে শান্তি কোথায় থাকবে রচনায়—ইয়েট্‌স্‌ ও এলিঅটের কি সেই শান্তি আছে? এমনকি ইয়েট্‌স্‌-এও কি দেখা যায়! রবীন্দ্রনাথের ভিক্টোরিয় আদর্শ এখানে অচল! তাঁর কবিতায় কি শান্তি আছে সব সময়! আমার মনে হয়, হোমারের 'ইলিয়াদে'ও নেই, 'মহাভারতে'ও নেই, গ্রিক নাটকে তো নেইই। আর শেক্‌সপিয়রের কথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানেন, হৃদয়ের ও মনের ঝড় তাঁর নাটকে সর্বত্র। মুদ্রাদোষই জীবনানন্দকে স্বকীয়তা দিয়েছে। কেননা অন্তরের আলোড়ন থেকে পদের বিন্যাসে ও অন্য উপাদানের যোগে অভিপ্রেত অর্থ বস্তুকে ছাড়িয়ে গেছে।

আধুনিকতার নিরিখেই নিজের কবিতা জীবনানন্দ বিচার করতে চেয়েছেন। একালের আধুনিক কবিকে কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় : 'এ-কবিতা আধুনিক কিনা—এ-কবিতা কিনা, এ-কাব্যে কোনো স্বকীয়তা আছে কিনা —এ-কবিতায় বক্তব্য কী'—বক্তব্য নিয়ে কোনো সুধী পাঠক বিবৃত হন না। ভাষা ও শব্দ বাক্যপদীয়ের মধ্যে রূপান্তরিত হলে অথবা ব্যবহৃত শব্দের শক্তি—যার মধ্যে বস্তু ও জগতের ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধে গোপন নিহিত আলো উদ্‌ভাসিত হয়—যেমন পতির কাছে জায়া তার বুকের উজ্জ্বল বাস খুলে দিয়ে তার সৌন্দর্যকে দীপিত করে, তখন শব্দের ক্রিয়ায় শব্দ বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত হয়। শব্দের আকারে বুদ্ধির আকার মিশে গেলে বস্তু ও বক্তব্য আপনা হতেই অভিনব প্রকাশ পায়—এ যেমন প্রাচীন ভারতীয় মত, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সমালোচনায়ও দেখা যায় : শব্দে কবির ছন্দস্পন্দকে বলা হয়েছে মুক্ত গতি। এই ছন্দস্পন্দ বা রিদ্‌ম সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি দেয়; এবং কোনো বিষয় ছাড়া এই ছন্দস্পন্দ হয় না। বিষয়বস্তু যতো সমৃদ্ধ হবে, ছন্দস্পন্দের জয়ও ততো বিরাট হবে। অর্থাৎ ছন্দস্পন্দ, শব্দের ক্রিয়ার মধ্যে, পারস্পরিক সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধি ইচ্ছা অনুভব এক হয়ে যায়—এগুলির সঙ্গে বস্তুকে আলাদা করা দুঃসাধ্য; তখন শব্দ বা ভাষা ভাবের বাহনরূপে পৃথক বস্তু হয়ে থাকে না। রিদ্‌মের মধ্যে শব্দের ক্রিয়ায় বুদ্ধি পরিব্যাপ্ত হয়ে জগৎ ও বস্তুকে এক করে দেয়। এই বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছা ও অনুভূতিও যুক্ত হয়—এবং তিনটি ক্রিয়াশক্তি এক হলে আমাদের চেতন-অবচেতনকে এক করে দেয়—তখন বক্তব্য ওর মধ্যেই থাকে, তাকে শুধু উপলব্ধি করতে হয়। কবিতায় ভাষার এই ব্যাপারটা না বুঝলে কবিতা সংবাদপত্রের ভাষ্য হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জীবনানন্দের অভিযোগ এই যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতায় সমাজ ও ঐতিহ্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না—এই দুটি উপাদান আধুনিকতার মৌল স্বরূপ। এর জন্যেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং আধুনিকেরা তাই ভিন্ন পথে চলেছেন। দ্বিতীয়ত, আধুনিক কবিতায় সূক্ষ্ম সুরের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারণার সঙ্গে 'সংঘর্ষ' লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবোধ ও আধুনিক কবিতার জীবনবোধ এক নয়। তৃতীয়ত, প্রকাশের দিক থেকেও আলাদা। রবীন্দ্রকাব্যের অর্থগৌরব প্রধান, আধুনিক কবিতা নিহিত অর্থে সূক্ষ্ম হওয়ায় এর প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। চতুর্থত, আধুনিক কবিদের একদল আছেন সমাজব্যবস্থার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের মুখোশ টেনে ফেলবার জন্যে কল্পনা-প্রতিভার দাবি উপেক্ষা করে মননের আশ্রয় নিয়ে বিশুদ্ধ রসের অবতারণার বিরোধী; রবীন্দ্রনাথ সেখানে কাব্য লেখেন বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগে। বলা বাহুল্য, এই দলের সঙ্গে জীবনানন্দের কোনো যোগ নেই। পঞ্চমত, নতুন সময় নতুন দায়িত্ব ও দাবি নিয়ে এসেছে, তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণা না নিয়ে দীক্ষা ও প্রেরণা নিয়েছে মালার্মে, পল্‌ভেরলেন, রঁসার, ইয়েট্‌স ও এলিঅটের কাছে সদর্থক বা নঞর্থক মনন-বিচিত্রতার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, বিশেষ করে 'বলাকা'য়, আইডিয়ার নতুন উন্মেষ আছে—এই আইডিয়া বা ভাবনা-প্রতিভাকে সমসমায়িকেরা অস্বীকার করে, ভাবনার বদলে নূতন কল্পনার জন্যে এলিঅটকে গ্রহণ করে আধুনিকেরা, টেক্‌নিকের মধ্যেই প্রতিভা ও কল্পনা। ষষ্ঠত, অনেকের কাছে রবীন্দ্রনাথ 'আধ্যাত্ম সত্যে বিশ্বাসী' ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতীক। জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে ও পরে কম্যুনিস্টদের মধ্যে যে-ধারণা ছিলো তাকেই উল্লেখ করেছেন; নিজে এই মতে সায় দেন নি। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বাঙালি বুঝতেই চেষ্টা করেনি, তাই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত ব্যবহৃত হননি। সপ্তমত, এবার জীবনানন্দ আধুনিক কবিতার বিশিষ্টতার কথা বলেছেন নিজের রচনার নিরিখে। কবিতা কবির মনের সততা থেকে অভিজ্ঞতাকে জন্ম দেয়। জন্ম দেয় কল্পনা ও প্রতিভাকে; এই সততা অভিজ্ঞতা কল্পনা ও প্রতিভা একসঙ্গে মিশলে কোনো এক সত্যে বিশ্বাস জন্মে—এই সত্যের বিশ্বাসই কবিতাকে চিরস্থায়ী করে। তখন কবিতার মধ্যে ভালোমন্দ পাপপুণ্য কিছুই থাকে না। থাকে শুধু শাশ্বত মুহূর্ত, বিশ্বের বৈচিত্র্য। ছন্দস্পন্দনের ক্রিয়াময় শক্তির লীলা। কবিমনের মধ্যে বুদ্ধিকে স্বীকার করা হয়েছে যেমন, তেমনি মনের অভিজ্ঞতায় এসেছে রিচার্ড্‌সের ধারণা, কল্পনায় ধরা দিয়েছেন কোল্‌রিজ, প্রতিভার মধ্যে নব নব-উন্মেষময়তায় সংস্কৃতের কথা যেমন আছে, তেমনি ইংরেজি জিনিয়াসের প্রতিধ্বনি আছে—ইংরেজির প্রতিভাও মানুষের সহজাত আত্মিক শক্তি থেকে নতুন কিছু জন্ম দেয় (genius < gignere) আত্মিক শক্তির সৃষ্টি করা অর্থেই জিনিয়াসের ব্যবহার। জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলপ্রাপ্ত শুদ্ধ মনে যে-অভিজ্ঞতা ও কল্পনা-প্রতিভার জন্ম দেয়—সেখানেই বস্তুজগৎ রূপান্তরিত হয়ে অনির্বচনীয়তা আসে। এমনি-ভাবেই জীবনানন্দ বাইরের জগৎকে ভেতরে টেনে এনে বিশুদ্ধ জলের মতো স্বাভাবিক করে তুলতে চেয়েছেন, অথচ রঙিন ও বিচিত্র। '—কাব্যকে কবিমনের সততা-প্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা প্রতিভার সন্তান বলে স্বীকার করে নিলে, আধ্যাত্মিক সত্যে বা যে-কোনো সত্যে বিশ্বাস একজন কবির পক্ষে মারাত্মক দোষ নয়—'। অষ্টমত, রবীন্দ্রনাথ

বর্জোয়া-সভ্যতায় লালিত হলেও সৃষ্টিমহূর্তে তিনি সর্বমানবের। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাসী হলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও রাজনীতির কলুষতাকে উন্মোচিত করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন পাউণ্ড ও এলিঅটের চেয়ে : রবীন্দ্রনাথ যেমন আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাসী, এলিঅটও রোমান ক্যাথলিক। নবমত, 'রবীন্দ্রকাব্য আধুনিকদের অনেকের কাছে সজাগভাবে বিত্রস্ত;' কিন্তু অবচেতনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বারংবার অনভাবিত হয়েছেন—যেমন জীবনানন্দ নিজে; সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, আমিয় চক্রবর্তী। অনেকে মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নিসর্গের প্রাচুর্যের জন্যে অবসাদ আনে, আধুনিক কবিদের য়ুরোপীয় প্রতীকতা ও চিত্রকল্প-ধর্মিতা বিশেষভাবে আকৃষ্ট কবলেও রবীন্দ্রনাথের 'মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ' বিশেষ মূল্যে নিরন্তর কাজ করেছে একালের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথই আধনিক কবিতার সাহায্য ও ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভিত্তি তৈরি করেছেন। ঐতিহ্য এনে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ঘুরে ফিরে শেক্স্পিয়রেব কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও ববীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে—এই ধারণা প্রত্যেক যগসন্ধিব মখে নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ বলে বোধ হলেও অনেককাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হবে না—এই আমার মনে হয়।' (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলাকবিতা, ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে জীবনানন্দেব ছ'টি বা তার বেশি কবিতাই প্রমাণ কবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপন ঋণ কতোটা—কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করালেও জীবনানন্দেব কাছে রবীন্দ্রনাথেব বৈশিষ্ট্য কীভাবে ধরা পড়েছে তা স্পষ্ট হয়। এবং রবীন্দ্রনাথও পরিস্পন্দিত হয়েছেন তাঁর কাব্যে।

বিদেশিদেব কাছে প্রেরণা পেলেও রবীন্দ্রনাথের কাছেও আধুনিকদেব ঋণ কম নয়; সমাজচেতনা-ঐতিহ্যবোধ, দিব্যানুভূতি, বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগ, অর্থগৌরব, ভাবনাপ্রতিভার মধ্যে আধনিকেরা ববীন্দ্রনাথ থেকে সরে গিয়েছেন, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ' আধুনিকদেব অবচেতনায় কাব্যসৃষ্টির প্রেবণা দিয়েছে।

৩

এ-যুগের বিকার ও ক্ষয় টোমাস মানের 'ফাউস্ট' আলোচনায় জীবনানন্দ ধরতে চাইছেন: আজকের মানুষের অন্ধকার সঙ্কট-সঙ্কল্পকে কবি বা লেখক বোধিব মধ্যে নতুন রূপ দিতে পারলেই সৎ সাহিত্যের জন্ম হয়। গোয়েঠের 'ফাউস্টে'র থেকে মানের ফাউস্ট পৃথক্। গোয়েঠের ফাউস্টের মধ্যে সখভোগ ও জ্ঞানপিপাসা আছে, আর মানেব লেফের্‌কুনকে শিকার করেছে একালের বিকার ও বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা থেকে সুকুমার শিল্পী-মনে নিঃসঙ্গতার জন্ম হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে অসাধের; তাই সুকুমার শিল্পী-মনের সঙ্গে বিকার ও বিশৃঙ্খলার বিরোধ থেকে নিঃসঙ্গতা। সেই সঙ্গে শিল্পীর সহজাত প্রতিভা পৃথিবীকে পাপ ও বিকৃতি থেকে মুক্ত করবার শুভেচ্ছা তাকে স্থির থাকতে দেয় না; স্বার্থহীনভাবে তাকে উদাস ও বিমর্ষ করে। পুরাণের মধ্য দিয়ে একালের ক্লান্তি, নষ্ট সময়ের ও সভ্যতার নিহিত গভীর চেতনা ও সমাহিতিকে যেমন প্রকাশ করেছেন মান, তেমনি তার থেকে মুক্তিকেও আনতে চাইছেন। সমাজের সর্বক্ষেত্রে কী রাষ্ট্রে সমাজে শিল্পে যাথার্থ্যকে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। সত্যের সাধনায় তিনি একক অনুসন্ধিৎসু, অনবরত ভাঙছেন

সৃষ্টি করবার জন্যে। কী দেখেছেন মান যা থেকে উদ্ধার করতে চান মান! শহরের চুনবালির মধ্যে শবের বাড়ির ওপর ইঁদুরেরা মোটা হয়ে উঠেছে; রাশিয়ার কামানের বজ্র গড়িয়ে পড়ছে বার্লিনে। রাইন-নদী-পেরোনো ইংলণ্ডের দিকে যাওয়ায় ছেলেদের খেলা; হাজার বছরের ইতিহাস, সম্মান অসম্ভব, কোনো দাঁড়িপাল্লা নেই সমতার, দৈবী পবিত্রাতা উধাও, রাস্তা শূন্যের দিকে যাচ্ছে, অথবা হতাশায় উদাহরণবিহীন দেউলেপনার পাতালে তলিয়ে যাবার সময় গর্জনমুখর অগ্নিশিখার নীচে আলোকিত হচ্ছে সব। একে স্বীকার করা মানে আমাদের শৈশবে যাওয়া নয়, আমাদের প্রেমকে অস্বীকার করা নয়। লেফের্‌কুন জর্মন, পণ্ডিত, সংগীতশিল্পী, জর্মন দেশকে অতি ভালোবাসে। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সমস্যা, সম্ভাবনার বৈষম্য। তা থেকে উদ্ধার চাই আত্মার প্রকাশে, বিশ্বাসের উষ্ণতা ও আন্তরিকতায় আত্মা থেকে গান উদ্‌গীত হয়ে-ওঠা চাই। নরকের পুত্রের অনুতাপ, ঈশ্বর ও মনুষ্যসমূহের বিলাপ—ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে, সর্বদাই বিস্তারিত হতে থাকবে, সমস্ত বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে মারাত্মক অনুতাপ চিরন্তনভাবে পুনরায় উদ্ধার পাবে।

অন্য প্রবন্ধে বলেছেন : এ যুগ আত্মিকতার গর্ভস্রাব; মানুষ দরিদ্র রুগ্ন অন্যায়ভাবে অভিশপ্ত পাপলিপ্ত, এর শান্তি কোথায়?

ফাউস্টের মতোই জীবনানন্দও মনে করতেন তাঁর দেশ ও পরিস্থিতি, দেশের আত্মিক রূপ ও রাজনীতি বিকৃত ও বিকলাঙ্গ, জার্মানির মতো পাপগ্রস্ত, সন্ত্রাস জুগুপ্সা ভয়ংকরতা সর্বত্র, জার্মানির মতোই দানবিক স্ফূর্তি উপনিবেশে—আদিমতা বর্বরতা অবক্ষয় অত্যাচারের রক্তপাতে দেশ ভরে গেছে, দেহের ও রাজনৈতিক সিফিলিস আকাশবাতাসকে দূষিত করছে, লেফের্‌কুনের মতোই জীবনানন্দও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে দোলায়িত। তাই সর্বত্রই তাঁর লেখায় একটা টেন্‌শন। তাঁর মনের ভেতরের কথা ও কবিতার অভিজ্ঞতাই আলোচনায় প্রকাশ করেছেন।

৪

এই কারণে, প্রথম থেকেই জীবনানন্দ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধনিকতার চেতনা নিয়ে তর্ক করেছেন। যদিও আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ গোয়েঠে ও শেকস্‌পিয়রের সঙ্গে তুলনীয়। অন্তত বাংলা সাহিত্যে—তবে জীবনানন্দের এই তুলনা কিছুটা তোষামুদির এবং শান্ত করবার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের তুলনা চলে না, জীবনানন্দ ভিড়ের মানুষ, তাই ভিড়ে হারিয়ে যান, তিনি তুচ্ছ আর রবীন্দ্রনাথ বিরাট প্রদীপ্ত—এই ব্যবধান থেকেই যায়। তিনি জানান : 'সাহিত্যের বিষয়বস্তুই চিরন্তন', কিন্তু প্রকাশের বৈশিষ্ট্য নতুন রূপের জন্ম দেয়, এই নতুন রূপই আধুনিকতা।

এর আগে বলেছেন : রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী'। এবং রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কাছে 'আরাধ্য শক্তি' ও 'কল্যাণময় শান্তি'। হয়তো দুজনেই ব্রাহ্মসমাজের লোক বলে জীবনানন্দের পক্ষে এ-জাতীয় ভাষাপ্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

এর পরেই নিজের বক্তব্য বলেছেন : 'অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনো আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্যে উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও

তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিংবা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না।' (৩রা পৌষ, ১৩৩৭) প্রাচীন গ্রিকেরা serenity বা প্রশান্তির পক্ষপাতী হলেও তাদের সাহিত্যে অন্য ধরনের সুরও আছে। অর্থাৎ দুঃখের 'তুমুল তাড়না' নাটকগুলিকে মাতিয়ে রেখেছে। দান্তে বা শেলির মধ্যে প্রশান্তি খুব একটা নেই। তৎসত্ত্বেও এঁদের কাব্য শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। জীবনানন্দের মনে হয়েছে, বিভিন্ন দেশে ও পরিবেশে মানুষের মনে বিভিন্ন 'মুড' খেলা করে; এই 'মুডে'র প্রভাবেই মৃত্যুকে বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের মধ্যে মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অবক্ষয় বা অপচয়ের মধ্যেই, হতাশার ভেতরেই, কবিতা রচনা করে। কবির কাছে কোনো কিছু বস্তু বা ভাব প্রাণবন্ত হলেই প্রাণে সুরের আগুন লেগে কবিতার সৃষ্টি হয়। 'মুড', মনস্তত্ত্বে বলে, আক্রান্ত অবস্থা বা অ্যাটিটিউড; অথবা প্রধান অনুভূতি; কিছুকালের জন্যে স্থায়ী হয় বিশেষ অনুভূতির দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে বিশেষ মানসিক উত্তেজনায়। যতোক্ষণ এই উত্তেজনা প্রাণবন্ত থাকে, ততোক্ষণ সৃষ্টিক্রিয়া চলে। 'মুডে'র প্রক্রিয়ার মধ্যে সংবেদনা কন্‌সেপ্‌শন বোধ বদ্ধি অনুভব অনুভূতি একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ বলেছেন : এই 'মুড' সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হলে প্রশান্তি সব সময় না-ও থাকাতে পারে, না থাকলেও সৃষ্টি সুন্দর ও স্থায়ী হতে পারে। সৃষ্টির মধ্যে সুরবৈচিত্র্য আছে, সুতরাং একটা সুর বা ছন্দ অন্য ছন্দ বা সুর থেকে বেশি স্থায়ী হবে না কে বলতে পারে! রঙের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অন্ধকারও সুন্দর হতে পারে প্রাণের উত্তাপে, অনভূতির প্রাণবন্তরূপে; তাই জীবনানন্দের সিদ্ধান্ত : 'আমার তাই মনে হয়, রচনার ভেতর যদি সত্যিকারের সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলা করাও যেতে পারে।' উদাহরণ দিয়ে বলেছেন : 'বীঠোফেনের কোনো কোনো সিম্ফোনি বা সোনাটার ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে', এই অশান্তি সৃষ্টিধর্মে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বলেই আজো তাঁর সংগীত স্থায়ী হয়ে আছে এবং চিরকালই থাকবে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদার জন্যে। সুতরাং serenity বা প্রশান্তি সৃষ্টির মূল কথা নয়। সক্রিয় অনভূতির প্রাণবন্ত জ্বলন্ত রূপই সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সৃষ্টির ক্রিয়ার ও 'মডে'র পার্থক্যের মধ্যেই জীবনানন্দের আধুনিকতা বাংলাকাব্যে স্বকীয়তা পেয়েছে—এর সঙ্গে বিভিন্ন ধারা যুক্ত হয়েছে পরে।

৫

বদ্ধদেব বস জীবনানন্দের কবিতার ভাষা ও রচনাশৈলীসম্বন্ধে মোটামটি সমগ্র আলোচনা করেছেন সদর্থকভাবে—তাঁর কথাই অন্যেরা নিজের ভাষায় জাহির করেছেন জীবনানন্দবিষয়ক বইয়ে। জীবনানন্দের কবিতায় কিট্‌সের ইন্দ্রিয়ময়তার গাঢ়তা আছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্ররূপময়', আছে শেলি'র সাংগীতিক প্রবহমানতা, (সুইন্‌বার্ন ও প্রি-র‍্যাফেলাইটের প্রভাব বুদ্ধদেবের কবিতায় বেশি, জীবনানন্দের কবিতায় নয়), ছন্দের বাঁকাচোরা গতি কখনো-কখনো থেমে যায় ড্যাশে, কমায়, সেমিকলোনে; পুনরাবৃত্তি ও প্রতিধ্বনিতে সংগীত ও নতুন অর্থ উঠে আসে, অর্থের মধ্যে সুদূর নির্জনতা সংগীতের মতো কাজ করে, সংগীতের ছন্দেই আদিম বেদনা, উপমার ইঙ্গিত ও কল্পনার অসীমতা,

প্রতীকের বিচিত্র দ্যুতি যেমন আছে, তেমনি মূর্ত অবয়বের স্পষ্টতা চোখকে আটকে রাখে তাকিয়ে দেখবাব জন্যে; তত্ত্ব ও বুদ্ধিকে তিনি ইন্দ্রিয়ময় করে তোলেন বিচিত্রসূক্ষ্ম ছবির রঙিনতায়, ছবির মধ্যে দৃশ্য গন্ধ স্পর্শ ঘ্রাণ এক হয়ে জড়াজড়ি করে, প্রভাব থাকলেও অণুকরণ নেই, ফুলের মতো সহজ স্বতঃস্ফূর্ত। 'বলাকা'র ভাঙা ছন্দকে স্বকীয়তায় নতুন সুরে গুঞ্জরিত করেছেন জাদুর স্পর্শে, 'বলাকা'র ছন্দের তীব্র গতিবেগ নেই। বিলম্বিত মন্থর, থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমের ভেতরে নির্জন সুরের বেদনা আনে। শেষ হলেও ছন্দের সুর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, শিশিরস্নাত ও স্বপ্নময় মনে হয়, পাঠক এই কারণেই মুগ্ধ, অথচ প্রচ্ছন্ন টেক্‌নিক রয়েছে, সহজে ধরা পড়ে না। অনুপ্রাস, পুনরুক্তি, প্রতিধ্বনি, মিল, অন্তর্লীন মিল, সূক্ষ্ম সুরের বৈচিত্র্য ও কুশলতা সুদূরতা আনে; ব্যক্তিনাম ও বিদেশি শব্দ ছন্দের সরের প্রবাহে নতন ব্যঞ্জনায় দীপিত, রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম দিকে কবিতায় যক্তাক্ষর বর্জন করেছিলেন, জীবনানন্দও কবিতায় যক্তাক্ষর বর্জনের পক্ষপাতী, সধীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানেই প্রভেদ; সাধক্রিযা, নিস্তারিত সর্বনাম, ছন্দের বিস্তার ও প্রবহমানতাব জন্যেই ব্যবহার করেন জীবনানন্দ, তাঁর এলানো ভঙ্গি তাঁর এলানো ভাবের জন্যে, ক্লান্তি অবসাদ বিষাদ বিষণ্ণতাকে তীব্র করে এড়াবার সচেষ্ট শিল্পকৃতি; আধুনিক উপলব্ধিকে স্বভাবে ছন্দধ্বনিত করে তুলেছেন জীবনানন্দ পয়ার-ভাঙাপয়ার মিশ্রপয়ার, পয়াবের সঙ্গে গদ্যের স্পন্দিত ধ্বনিতে— এখানেই তাঁর ভাষা ও ছন্দে স্বকীয়তা ও নিজস্ব মুদ্রা; কখনো মনে হয় সুরে স্বগত উক্তি করছেন; ছন্দের সুরের মায়াবী গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখতে হয়; আপাত মনে হয় তাঁর স্টাইল শিথিল, তলিয়ে দেখলে এর নিবিড়তা ও সম্পৃক্তি আমাদেব বিস্মিত করে, বোধেব শুদ্ধতা 'মুডে'র নিবিড় শান্তি, বিচিত্র ছবির ও রঙের কারুকাজ, সচেষ্ট ভাঙাছন্দেব সরেব আপাত অসংলগ্নতায় নিবিড়তা কখনো-কখনো তাঁর কবিতাকে রহস্যময় দুর্বোধ্যতায নিয়ে যায়। তাঁর ছন্দসুরভাষা আধুনিক মানযেব উপলব্ধিব গভীরতা থেকে উঠে এসেছে। মনে হয়, অকাব্যিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, হযতো-বা কর্কশ, কিন্তু সুবেব ছন্দে ঢেকে যায।

কেন তিনি শুদ্ধতম কবি—এব বিশ্লেষণ জীবনানন্দই করেছেন তাঁর লেখায়। তিনি চবমতার সুস্থিবতা মানেন না, নিরন্তর অনুসন্ধানে রত; আত্মতৃপ্তি নেই। বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি কববাব প্রয়াস রয়েছে : 'যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে।—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়।' 'অন্তরচেতনায়' বা 'সাইকিকে'র (Psychic) মধ্যে আলোকিত করতে চান। এখানেই ভালোর ও ইয়েট্‌সের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। সব কিছু অন্তরচেতনায টেনে নিয়ে রূপান্তরিত করে নতুন রূপ সৃষ্টি করেন। এ-সম্বন্ধে সচেতন বলেই শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় আত্মবিশ্লেষণ করে বলেছেন . 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিশ—শুধু কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়। . . . আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার, কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যেব কোনো কোনো অধ্যায়

সম্বন্ধে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিশেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমলোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এতো তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যের; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড় সমালোচককে অবহিত হতে হয়।' —জীবনানন্দের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় 'মুড'-অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন বোধ ও ভাবনা এবং টেক্‌নিক্‌কে গ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে সব মিলে সামগ্রিক বোধ ও চেতনার প্রকাশ। অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটাতে চেয়েছেন, সমগ্র অভিজ্ঞতায় চেতনাই তাঁর লক্ষ্য।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে-লেখা চিঠিতে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যাদর্শ ব্যক্ত করেছেন ম্যানিফেস্টোর মতো : প্রেরণা কল্পনা ও অনুশীলন—এই তিনের সাহায্যে কবিতা গড়ে ওঠে। প্রেরণা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা যায় না। আবার কল্পনা ও অন্তঃপ্রেরণা থাকলেই কবিতা হয়ে ওঠে না। সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে। শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিতের কথা শুনে মনে হয় তিনি কাণ্টের 'পিওর রিজ্‌নে'র কথা বলছেন সর্বজনীনতার জন্যে। শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত তখনই আসে কবিতায় যখন ইতিহাস-চেতনায় কবিতা সুগঠিত হয়—এই ইতিহাস-চেতনা, আমার মনে হয়, অনেকটা হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। ভালো কবিতা লিখতে গেলে প্রেরণার সঙ্গে পরিশ্রমও চাই। তাই প্রথম লিখবার পরে পরিশ্রম ও অনুশীলনে আরো বেশি স্পষ্ট হয়। চারিদিককার প্রতিবেশরচনা ও শুদ্ধ প্রতর্ক নিয়ে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায় পুনরায় কল্পনার আশ্রয়ে। কবিতার প্রতিটি অংশে সুষম সামঞ্জস্যের যোগে পূর্ণ ফর্মের গঠন উঠে আসে। এর জন্যে চাই কল্পনা, কল্পনাকে শরীরী রূপ দেবার জন্যে চাই অবসর ও দৃষ্টি, সেই সঙ্গে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা ভিজ্‌ন (Vision), এগুলি ব্যক্তির মনের হৃদয়ের উপাদান, এই উপাদানের সঙ্গে কাল ও সময়-চেতনা যুক্ত হয়ে কবিতার কাব্যকে সঙ্গতি-সাধক অপরিহার্য সত্য করে তোলে। এর থেকে বিচ্যুতি নেই, তাঁর কাব্যে সময়-চেতনার নতুন মূল্যও আবিষ্কৃত হতে পারে। জীবনানন্দ প্রকৃতি ও সময়ের সুন্দর ভূমিকায় তৃতীয় বিশেষত্ব হিশেবে মানবসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনের সহযোগে অনাদি-উৎসের নিরুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—এখানেই আধুনিক কালে জীবনানন্দ বড়ো কবি, এই অনাদি-উৎসের নিরুক্তি খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষায়। এখানেই লিরিক কবি ও নাট্যপ্রতিভার প্রভেদ, প্রাতিভাসিক কাব্যজগতের একাগ্রতা নাট্যকার ভেঙে ফেলেন নাটকের প্রয়োজনে, কিন্তু লিরিক কবি ত্রিভুবনচারী হয়ে উঠলেও প্রকৃতি সমাজ ও সময়-চেতনাকে একাত্ম করে নেন, বিশ্লিষ্ট নয় নাট্যকারের মতোন। এই কারণেই নাটক ও উপন্যাসের মতো মানুষের মনকে শুধু সমূলে আক্রান্ত করেন না—'কবিতা মানসের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—তাকে নির্মলতর করবার জন্য—কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।' কবিতায় চরম বলে কিছু নেই। সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তিহীন, আছে শুধু বিশুদ্ধ জগৎসৃষ্টি করবার প্রয়াস। এই বিশুদ্ধ কাব্যজগৎকে বলা যেতে পারে 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স', মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়। এটাই হয়তো সুররেয়ালিজমের লক্ষণ। এর ফলে সমন্বয়ে নতুন জগৎ তৈরি হয়ে থাকে যা এক যুগ থেকে অপর যুগে নিয়ত চলে। মাঝে-মাঝে ক্ষণকাল কবিতাকে নষ্ট করলেও মহাকালের পটভূমিকা জীবনের

সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। পরিপ্রেক্ষিত অনেকদিন ধরেই আবছায়ার মতো থাকে। এর আয়ত্তের বাইরে বৃহৎকে ধরা দুঃসাধ্য।

৬

জীবনানন্দের কাব্যাদর্শে রাবীন্দ্রিকতা প্রায় একেবারেই ক্ষীণ, এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেকটা দূরে-দূরে থাকতেন। ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইতেন। সেই হেতু সমকালীন য়ুরোপিয় কবিদের অবসাদ ক্লান্তি ক্লিন্নতা, নাটকীয় ছেদ ও বিচ্ছেদ; মানুষ এখানে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে মরে থাকে, নাগরিক কুটিলতায় শিকার-শিকারীর হত্যাই উজ্জ্বল —যেমন 'ক্যাম্পে' মূল্যবোধ; ক্ষণিক বুর্জোয়া সভ্যতার অবক্ষয় প্রধান হয়ে উঠেছে নানাভাবে; সভ্যতার সঙ্কটে প্রধান হয়ে উঠেছে ক্ষয়িষ্ণুতা ও ভঙ্গুরতা, হতাশাবোধ, কখনো আত্মঘাতী ক্লান্তি; এও দেখা যায় মানুষ অন্তিম ব্যর্থতার দিকে এগিয়েও শান্তি ও সান্ত্বনা পায় নি; ফর্মের দিক থেকেও একই রকম ক্লান্তিকর একঘেয়েমি মনে হতে পারে—তব 'বলাকা'র ভাঙা পয়ার ড্যাশ ছেদ যতি পুনরুক্তি দিয়ে নতুন এক ফর্মের সৃষ্টি করেছেন যা জটিল ও কুটিল মনের পরিচায়ক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর মধ্যে নিহিত রশ্মির মতো অনস্যূত হয়ে নেই ঔপনিষদিক মানবতার আদর্শে। একথা ঠিকই, একালের অনভূতি ও বোধ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে গেছে; রবীন্দ্রনাথের আদর্শ একালে বিস্মৃত। জীবনানন্দ মানুষের প্রতি বিশ্বাস করেও মানুষের অন্তিম ব্যর্থতার কথা ভুলতে পারেন নি। বিরোধ সাপের সঙ্গমের মতো জড়িয়ে আছে কবিতায়—এখানেই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

একালে বাস করে বিচ্ছিন্নতা নৈঃসঙ্গ্য হতাশা ব্যর্থতা ক্লান্তি অন্ধকার ধূসরতা বীভৎসতা নিরাশ্রয়তা অনিকেত মনোভাব রিক্ততা দ্বিধাজড়িত-চৈতন্য বিপন্নতা মৃত্যুভয়, অবক্ষয়, হেমন্তের রিক্ততা ও বিষাদ যেমন আছে, তেমনি আছে বেঁচে থাকবার মধ্যেই মৃত্যু ও অন্ধকার—এর থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন জীবনানন্দ ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায়, সাধারণ মানবের প্রগতির মধ্যে; অবক্ষয়ের যুগের সঙ্গে তিনি বিচার করেছেন বিজ্ঞান ইতিহাস সমাজ ও অর্থনীতিকে—এগুলি ভেতর থেকে টেনে নিয়ে সংকীর্ণ সময়সীমাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন, বৃহত্তর ও গভীরতর প্রজ্ঞাদৃষ্টি যা ভিতরে রূপ দিতে চেয়েছেন, হত্যাময় রক্তাক্ততা থেকে মুক্তি এসেছে তাঁর কবিতায় এইভাবে : 'কিন্তু তবুও সময়প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।' (পূর্বাশা, কার্তিক, ১৩৫৩) সেই সঙ্গে অন্য বিস্তৃত শোভাময় ও মায়াবী প্রকৃতির অনন্তলীলা উৎসনিরুক্তির দিকে নিয়ে গেছে।

ইয়েট্‌সের মতোই তাঁর প্রেমে জ্বালা, দ্বিধাখণ্ডতা, রিক্ততা, কখনো প্রেমহীনতা, হেমন্তপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ধূসরতার নিঃস্বতা নিগূঢ় সংগীতের যন্ত্রণাময় মায়া জাগায়। 'বনলতা সেন' বনেরই লতা, প্রকৃতি, সৌন্দর্যের মায়া, সেখানেও অন্ধকার দুটি হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে থাকে, এ সৃষ্টির অন্ধকার নয়।

এবং স্বপ্ন মানেই নিরাশ্রয়তা, নিরাশ্রয় না হলে কেউ স্বপ্ন দেখে না। নারীকে জড়িয়ে ঘরে শুয়ে থাকবার নিস্তব্ধতা পেলে, তাকে চুম্বনে আরক্ত করতে পারলে কেউ

কবিতা লিখতো না। কবিতায় না-পাওয়া ও হারানোর বেদনা অবচেতনে অন্ধকার জলের ছায়ার মতোন, নিপীড়িত যন্ত্রণায়, অঘুমে জাগিয়ে রাখে প্রক্ষোভের শান্তির জন্যে। এই নষ্ট হারানো ক্ষয়ে-যাওয়া প্রেমের কবিতাই 'কুড়ি বছব পরে'; কুড়ি বছব পরে প্রিয়তমার সঙ্গে—যাকে ভালোবেসেছি—তার সঙ্গে দেখা হলে আবার কী হবে? একটা বিস্ময় ও কৌতূহল জাগে, আবার কি মিলন হতো! হারানো প্রেম ও দেহ জোড় মেলাতো! তাই 'যদি' শব্দে অনিশ্চয়তার ধূসরতা, মিলন ঘটতেও পারতো। যেখানে মিলন হতো কার্ত্তিকের মাসে— হেমন্তকালে ধানের ছড়ার পাশে—লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য, শ্রী নিয়ে, ভরা মাঠের ফসলের পূর্ণতায় তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কাক ঘরে ফেরে, নদী আকাশের হলুদ রঙে ছেয়ে আছে, শর-কাশ-হোগলা নরম-নরম হয়ে উঠেছে নারীর মতোন—আর দেখা হচ্ছে দুজনের মাঠের ভেতরে। একদিকে হেমন্তের ধানের ছড়া, সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারের কাকের কালো ছায়া এবং ঘরে-ফেরা নদীর নরম শান্ত এবং শান্ত জলে জটিলতার আবর্জনা শর-কাশ হোগলার—এর পরেই দুটি শব্দে অর্ধবাক্যে এবং বিস্ময়সূচক ছেদচিহ্নে অনিশ্চয়ভাবরহস্য। কবিতাটি সম্ভাবনার : 'যদি দেখা হতো;' তাই পরের স্তবকে অন্য দৃশ্যে বর্ণিত ভিন্ন চিত্র, ক্ষেতে ধান নেই, শূন্যতা ও নিঃস্বতা, অর্থাৎ ধান কাটবার ব্যস্ততা নেই, ধানের ছড়া কেটে নেওয়া হয়েছে; হাঁস ও পাখির নীড় থেকে খড় ছড়িয়ে মাটিতে অর্থাৎ নীড় শূন্য বা ভেঙে গেছে। তাই শীতের রাত্রির শিশিরের জলে মুনিয়া নিরাশ্রয়, অনিকেত, এখানেও বিস্ময়সূচক ছেদচিহ্নে অনিশ্চয়তা। এরপরে দুটি পঙ্‌ক্তিতে ধুয়াপদের মতো কুড়ি বছরের কথা। দীর্ঘ কুড়ি বছর নব ও নারীর জীবনে কেটে গেছে, কুড়ি বছরটা যেন কতো দীর্ঘ সময় : 'আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—' কুড়িকে দুবার ব্যবহার করবার জন্যে কুড়ি গুণিতক কুড়ি হয়ে উঠেছে যেন। আর 'পার' সমুদ্রের দুস্তর পার দীঘায়ত। কুড়ি বছরের পরে হঠাৎ যদি মেঠো পথে তাঁর অন্তবসঙ্গিনীকে আবার পায়, তাহলে কী হবে? সেই বিস্ময়ভবা অনিশ্চয়তার ছেদচিহ্ন।

এরপর প্রকৃতির অন্যরূপ, মাঝরাতে আকাশে হয়তো চাঁদ উঠেছে, চাঁদকে ছেয়ে আছে একরাশ পাতা; চাঁদের আলোয়, পাতার অন্ধকারে—আলো-আঁধারি রহস্য যেমন, তেমনি পূর্ণ চাঁদের মায়া নেই, অনাবৃত রূপের সৌন্দর্য নেই, তাকে অস্পষ্ট করে তুলেছে একরাশ পাতা, তাই শুধু চাঁদের রহস্য, যেমন নদীকে ঢেকে রেখেছে শর-কাশ-হোগলা—এ যেন মিল্টনের সমুদ্রের বাধা শয়তান অনুচরদের ভেসে-যাওয়ায়; সবই অস্পষ্ট আলো আঁধারির খেলা। একরাশ পাতার পেছনে আছে সরু সরু কালো কালো ডালপালা; ডালপালার মুখেই একরাশ পাতা—পদবিন্যাসের ব্যতিক্রমী রীতির স্বাতন্ত্র্য বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনাকে ও অস্পষ্টতাকে ধ্বনির সাহায্যে আরো গভীর ও গাঢ় করেছে। পরের দুটি পঙ্‌ক্তিতে চারটি বৃক্ষের কথা আছে অন্ত্যমিলের ধ্বনির সাম্যে। দর্শন-ইন্দ্রিয়ের স্পষ্টতায়, শিরীষ-জাম-ঝাউ-আম বৃক্ষশ্রেণী গভীরতর ছায়া সৃষ্টি করেছে। চাঁদকে আড়াল করছে, রহস্যময় করে তুলছে আবার, এতোক্ষণে সব মিলিয়ে স্পষ্ট হয়। শিরীষ-জাম-ঝাউ-আমের সরু সরু কালো কালো ডালপালার মুখে একরাশ পাতা চাঁদকে আচ্ছন্ন করে আছে; নইলে ক্রিয়াবিহীন ও কার্যশূন্য চারটি বৃক্ষের পরস্পর সংযোজন

বাক্যগত অতিদুর্বোধ্যতা উক্তিকে নিরন্তরতায় নিয়ে যায়; দৃশ্যের অস্পষ্টতাকে গাঢ় করে। এরপরেই কবিতাটির মূল বক্তব্য বিস্ময়ের আঘাতে হৃদয়কে পীড়িত করে : 'কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে!' যদি আসে, যদি দেখা হয়, তাহলেও সেই প্রেমিক আর হৃদয়ে জীবিত নেই। মানিকের শশীর অবস্থা—এখানেই রবীন্দ্রনাথের ও ব্রাউনিঙের প্রেমের থেকে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা আলাদা—অবস্তুক প্রেম বস্তুটি চিরন্তন হতে পারে না; সময়ের ব্যবধানে সে মরে যায়; অতি কাছে থাকলে যেমন সে অচেনা থেকে যায়, তেমনি ব্যবধানেও তার মৃত্যু ঘটে। যাকে মনে নেই তাকে দেখে আর কী হবে, সে তো অপরিচিত, অচেনা হৃদয়ের সঙ্গে কোনো যোগই নেই। এমনিভাবে কৌতূহলের অবসান ঘটেছে, প্রেম এখানে মৃত। 'র' ধ্বনির অনুপ্রাসে রিক্ততা জাগাবার জন্যেই 'তোমাকে' না লিখে জীবনানন্দ 'তোমারে' লিখে ধ্বনির পরিবর্তনে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন।

এর পরেই ধুয়াপদের মতো দুটি পঙ্‌ক্তি, কিন্তু এই দুটি পঙ্‌ক্তির অর্থ আলাদা, কুড়ি বছর বাদে আবার যদি দেখা হয়, সেই দেখা নিরর্থক, কেননা প্রিয়তমা নারীকেই তো মনে নেই, অচেনা—আগে ছিলো কৌতূহলের বিস্ময়ের, এরপরে নিরর্থকতার। কবিতার অনুভূতি এইভাবে এগিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য দিকে বাঁক নিচ্ছে—এই বাঁক নষ্টের হারানোর, ক্ষয়ের ব্যর্থতার, নৈরাশ্যের, চিত্রকল্পের ছবি ও ছবির প্রতীকে তাকেই রূপ দিয়েছেন জীবনানন্দ।

যেহেতু নারীকে মনে নেই, যদি তার দেখা মেলেও মাঠে, হামাগুড়ি দিয়ে প্যাঁচা নামে, অন্ধকারে রাত্রির সঙ্গী অন্ধকার জীবের মতো, চেতনা নেই। বাবলার অশথের জানালাগুলির অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখে প্যাঁচা। অর্থাৎ হারিয়ে যায়, কোথায় হারিয়ে যায় এ-ও বিস্ময়ের অনিশ্চয়তা। প্যাঁচার সঙ্গে মিলেছে শেষ পঙ্‌ক্তিতে চিল, প্যাঁচা ও চিল জীবনানন্দের কবিতায় দটিই প্রতীক; 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার শেষে আছে : 'থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে/চোখ পাল্টায়ে কয় : বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?/চমৎকার!/ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার—'। চেতনা ও সৌন্দর্যবিহীন শুধু জৈব প্রাণের ক্ষধারূপে প্যাঁচা এখানে উপস্থাপিত। আর প্যাঁচার বিপরীতে এসেছে চিল, এই চিল অন্য কবিতায় সোনালি ডানার চিল, প্রেমিক পুরুষ, তার প্রিয়াকে হারিয়ে ভিজে মেঘের দুপুরে ধানসিড়ি নদীর পাশে কাঁদে। তার প্রিয়া হয়তো রাজকন্যাদের মতো অন্য কোথাও চলে গেছে। তাই কবি তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন . 'তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিরি নদীটির পাশে!' কুড়ি বছর পরে এই প্রেমিকও চিলের মতো, চোখের পাতার মতো পৃথিবীতে কোথায় গোপনে, তার ডানা অর্থাৎ চলবার ক্ষমতা আর নেই, থেমে গেছে চিরকালের জন্যে, তাই ছেদচিহ্নের বদলে ড্যাশ। সে চারিদিকে গাছের ফাঁকের অন্ধকারে প্যাঁচাকে দেখে—যে অন্ধকারের জীব, যার শুধু জৈব ক্ষুধা প্রাণের; কুড়ি বছর বাদে এই পরিবর্তন ঘটেছে প্রেমের, প্রেমিকা প্যাঁচারূপে, প্রেমিক চিলরূপে, প্যাঁচা রাত্রের জীব আর চিল দিনের জীব—দুয়ের এই বিরোধ।

কবি যেন প্রেমিক চিলকে সংবাদ দিচ্ছেন, রাত্রির শিশিব শিকার করে নিয়ে গেছে

তাকে, সে যেন রাত্রির জীব আজ। এখানেও দটি ড্যাশ, প্রথম ড্যাশে সংবাদ, দ্বিতীয় ড্যাশে চিরন্তন বিদায় প্রেমিকার। আবার শেষ পঙ্‌ক্তিতে বিস্ময়ের অনিশ্চয়ের কৌতূহলের ছেদচিহ্ন. কুড়ি বছর পরেও ফিরে পাবার ইচ্ছে; কিন্তু এই ইচ্ছার মূলে যে বাস্তবতা নেই প্রেমিক জানে. কেননা তার স্মৃতি হারিয়ে গেছে, কুড়ি বছর পরেও কুয়াশায় কুয়াশার মতোই হারিয়ে গেছে, সে কুয়াশাকেই পাবে, নারীকে নয়।

এই পৃথিবীতে মানুষের অভিশাপ প্রেমকে পেয়ে হারানো, শারীরিক অর্থে হারানো যেমন তেমনি মনের দিক থেকে হারানো আরো দুর্বিষহ, অঘ্রান আসবার আগেই অঘ্রানের রিক্ততা এসেছে মনের মধ্যে দুজনের—'অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;/সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে/হেমন্ত এসেছে তবু;' এই অঘ্রানই 'কুড়ি বছর পরে' কবিতায় হেমন্তের নিসর্গের রিক্তবর্ণনায়। 'অঘ্রান প্রান্তরে' কবিতাতেও 'চিল উড়ে চলে গেছে'—প্রেমিক নেই, প্রেম নেই, এখানেও কুয়াশা ও প্যাঁচা, বাবলার আঁধার, শেষের স্তবকে নিসর্গের ছবিতে প্রেমের মৃত্যুর বিরোধ—'আলেয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে'—অথবা 'চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ'—প্রেম সনাতন এই ব্যর্থ ধারণা রবীন্দ্রবিরোধী—'সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে/প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে/যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে—', সেখানে প্রেমের জ্বালা নেই। প্রকৃতিকে এখানে আলম্বন বা প্রতীক করছেন না ছবির মতো বলায় : 'নিখিলের বৃক্ষ আজ বিকাশে নীরব!' এখানেও নষ্ট প্রেমের কথা : 'পৃথিবীর পুবনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,/প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়।' 'ঝরে-পড়া পাতার মতো প্রেম, যদিও 'কুড়ি বছর পরে' কবিতার দীর্ঘতর বিশ্লেষণে মনে হয়, এই দুটি কবিতা, শব্দে ছবিতে প্রতীকে তবু নারীর প্রতি নায়কের একটা সান্ত্বনা আছে 'দুজন' কবিতায়, কিন্তু অন্য দুটি কবিতায় নেই : 'বাসনার মতো ভালোবাসা/খঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইঙ্গিতেরে তার', কিন্তু পুরুষেব ভাগ্যে এই সান্ত্বনা ও আশ্বাস নেই—তার হৃদয়ে শুধু হেমন্তেব কুয়াশা জমাট বেঁধে থাকে।

৮

'কুড়ি বছর পরে' কবিতার গঠনভঙ্গিই, নষ্ট প্রেম নয়, উপলব্ধির গভীরতাকে তীব্র করেছে, এই গঠনের ফলেই এর পুরো অঙ্গসংস্থান আমাকে মুগ্ধ করে, অনুভূতির চিত্ররেখা ও গতিময়তা ও পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবই সম্ভাবনা ও 'যদি'র প্রশ্ন দিয়ে কৌতূহল জাগায়। উক্তি বা কথ্যভাষার ধ্বনি কাব্যের অর্থকে ছাড়িয়ে সর্বদাই অন্য এবং অনেক কিছু হয়ে উঠছে নরম আলোকের ঝাপসা অন্ধকারে, এবং ছবি শুধু অর্থ বলছে না; অর্থহারানো বেদনার বিষাদময়তা নিয়ে আসছে, তাকে সাহায্য করছে পদবিন্যাসের ব্যতিক্রমের বিশেষ রীতি; ভাঙা-পয়ারের ভাঙা করুণ দীর্ঘশ্বাস, অসমান পঙ্‌ক্তির মিলের মধ্যে হঠাৎ আঘাত-লাগানো অমিল, অনুপ্রাসে বিলম্বিত বিলাপের কান্না, মৃত্যু, প্রতীকের আইডিয়ার বিস্তার, দর্শন-শ্রবণ-গন্ধের ইন্দ্রিয়ের মিশ্রণ; ধ্বনি শুধু অর্থ বলে না, ছবি আনে না, বেদনার গন্ধকে ছড়িয়ে দেয় পাঠকের হৃদয়ে। এই বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয় সংগীতের সুরের আলো; অদ্ভুত সাংগীতিকতা তাঁর কবিতার সমগ্রতায় ছড়িয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথের পর এই সাংগীতিকতা অন্য

কোনো কবির কাব্যে নেই, এ-সংগীত নীরবতার সংগীত, সংগীত হয়েও নীরবতার দিকে যেতে চাইছে, তাই তার আকর্ষণ ও মোহ এতো বেশি—শুধু 'চিত্ররূপময়' হলে এটা হতো না। তাঁর ভাঙা-পয়ারের ও গদ্যকবিতার ছন্দের সুরের নরম কোমলতা মন্থর বিলম্বতা আধো ঘুমে আধো জাগরণে রক্তের মধ্যে গতিময়তার স্তব্ধতার সৃষ্টি করে। তাঁর গদ্যকবিতার ধ্বনির সুরের সঙ্গে 'পরিশেষ' কাব্যের ধ্বনি, 'পুনশ্চে'র ধ্বনি, লরেন্সের ধ্বনি এবং উচ্চনিনাদী হুইট্‌ম্যানের ধ্বনির কোনো মিলই নেই, সমর সেনের তো কথাই ওঠে না। তাঁর উক্তির ধ্বনি সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করে, এর গতি উন্নতি ও শুদ্ধতাময়; শব্দের স্রোতের দোলায়মানতার সঙ্গে তুলনা চলে, ছন্দের ধ্বনির বয়ন যুক্তিতর্কের শুদ্ধতা ঘটায়, আলোচনাকে বহুদূরে নিয়ে যায়, কারণ অচেতন অংশকে আশ্রয় নিয়ে এইসব গড়ে ওঠে, আগে পরে মনের কথা বলার ধ্বনি বাক্যের প্রতিটি বিন্দুকে বাঁধে। কন্‌টেক্স্টের গঠনেও কথাভাষার সুর লেগে থাকে, শব্দ বা ভাষার নয়। কথ্যভাষার ধ্বনির সুরে সত্তায় দীপিত হয়ে ওঠে—পরিচ্ছন্নতা বা পরিষ্কার হওয়া এর ধর্ম নয়। মঞ্চে অভিনয়কারীর কথ্যভাষা যেমন স্বাভাবিক, কবিতার কথ্যভাষার ধ্বনিও তেমনি সহজ ও ক্রিয়াময়, উচ্চারণের শ্বাসে স্বাভাবিক, যেমন এলিঅটের নাটকের ধ্বনির সুর । এর জন্যেই প্রতিটি বাক্যের ধ্বনি দোলায়মানতায় সক্রিয় হয়ে অসীমতার দিকে যায়, ইঙ্গিতময় আলোর আলো হয়ে আসে। ধ্বনির সুরে টেক্স্টের দোলায়মান গতি অনেক ছবি তৈরি করে। যদি কোথাও আইন থাকে, তাহলে তা কথ্যভাষার ঘটনার মধ্যেই আছে। প্রক্ষেপ, শব্দগতি, ছন্দস্পন্দ বোধগম্যতার অন্যদিক। অভিজ্ঞতার চাপে সবই পাল্টে যায়। বার্থে বলেন : ভাষা সব সময়ই শক্তির বিষয়, আর যখন কথা বলি আমরা, সেই শক্তির জন্যে ইচ্ছাকে চর্চা করতে হয়। কথ্যভাষার রাজ্যে নিষ্পাপতা ও নিরাপত্তা নেই।

সমালোচনা মানেই সঙ্কট, সঙ্কটময় মূল্যায়ন ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়, ঐতিহাসিক মুহূর্তের বিবেচনাও দরকার; যে-সমালোচনায় বহু অর্থের বিভাজন ও অর্থের ছলনা থাকে, ইতিহাসের দিক থেকে তাকে অধিকতর সার্থক মনে হয়। সমাজ আবদ্ধ হয়ে আছে বহু অর্থের যুদ্ধে, তাই যোগাযোগের নিয়মের বাধ্যবাধকতা তার মধ্যে রয়েছে। এই বাধাবাধকতাই সক্রিয় যাথার্থ্য তৈরি করে, বহু অর্থে পুরনো সমালোচনা এগিয়ে যায়, এর বাইরে যায় না। অন্য ভাবেও শব্দার্থের প্রবেশ ঘটতে পারে।

আইডিয়োলজির সমালোচনা, আজকে ঠিকমতো বলতে গেলে, চৌর্যক্রিয়ায় নিন্দিত। বস্তুবাদী কর্তব্যের উৎকর্ষ হলো সূচিত বস্তুর স্বাধীনতা. ধ্বংসের চেয়ে অর্থের ইল্যুসনে সহজেই তুলে নেওয়া যায়।

রোনাল্ড বার্থে বলেন, লেখার গন্ধ নেই, কথা বলবার সময়, এবং কথা বলা শেষ হলে, চিত্রকল্প ঘুরতে থাকে মাথাঘোবার মতো, যে-কিছু কথা বললেই তার কিছু অবশিষ্ট থাকে, এই অবিশিষ্ট থেকেই গন্ধ ছড়াতে থাকে। লেখায় পুরোপুরি কথ্যভাষাকে লুপ্ত করতে পারি না। কথ্যভাযাকে লিখতে বাধ্য হই অভিজ্ঞতার ইল্যাসনকে স্মৃতিকে অনুভূতিকে নির্দেশ করতে। যখন কথা বলি তখন বিষয় 'আমি', সে কথা বলে, লেখায় তার নির্দেশ কিছুটা স্থায়ী হয়, সেই গন্ধ ছড়ায় আমার নাসারন্ধ্রে।

যে-কথ্যভাষার ধ্বনি-ছন্দসুরের কথা বার্থে বলেছেন, বহু আগে এজরা পাউণ্ডই

বলেছিলেন। র‍্যান্‌সম্‌ নতুন সমালোচনার কথা বলেছিলেন। রিচার্ডস্‌-এলিঅট এই আলোচনাকেই দৃঢ় করেন, 'অব্‌জেক্‌টিভ কোরিলেটিভ্‌', 'ডিসোসিয়েশন অব্‌ সেন্সিবিলিটি' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু পাউণ্ডের কৃতিত্ব হলো সব চেয়ে বেশি। গদ্য-পদ্যের ভেদ ঘুচিয়ে কথ্যভাষার প্রতি ঝোঁক নির্দেশ করে অ্যাব্‌সলিউট রিদ্‌মের তাৎপর্য তুলে ধরে বার্থের সমালোচনার পথ দেখিয়েছেন। পাউণ্ড 'অ্যাব্‌সলিউট রিদম্‌' বলতে বুঝতেন : কবিতায় ছন্দস্পন্দ একেবারে যথাযথ হবে, ইমোশনের সঙ্গে অথবা ইমোশনের ছায়ার সঙ্গে প্রকাশ পাবে। মানুষের ছন্দস্পন্দ ব্যাখ্যামূলক হবে, সুতরাং অবশেষে এই ছন্দস্পন্দ হবে অকৃত্রিম, অকৃত্রিমযোগ্য।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় যে-ছন্দস্পন্দ ব্যবহার করেছেন বিশিষ্ট পদবিন্যাসে, পদকে পরিবর্তন করে, ক্রিয়াহীনতায়, মিলে-অন্ত্যমিলে-অমিলের সহযোগে, কথ্যভাষার গদ্যিকতাকে সঙ্গে করে, তাতে তাঁর হৃদয়ের ইমোশন যথাযথ প্রকাশ পেয়েছে। এর জন্যে তাঁকে পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয়েছে। হোরাসের ভাষায় বলা যায় : আত্মার আনন্দের জন্যে যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে ছিলো তার গভীর বিচার ও স্বাভাবিক সুবোধ। কবিতা চিত্রের মতো কাছে দাঁড়ালে যেমন ভালো লাগবে, মনের ওপর প্রভাব পড়বে, একটু দূরে দাঁড়ালেও তেমনি প্রভাব ফেলবে। এর জন্যে অন্ধকার কোণ চাই, সেটাও পূর্ণ আলোয় দেখার প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কবতে হবে। প্রথমবারে দেখলে যে-আনন্দ পাওয়া যাবে, প্রায়ই দেখলে সেই আনন্দই পাওয়া যাবে, একটা দিব্যতা ফুটে উঠবে। জীবনানন্দের কবিতা বারবার পাঠে আমাদের আনন্দকে ম্লান করে না কবিতার অঙ্গসংস্থানের জন্যে এবং অ্যাব্‌সলিউট ছন্দস্পন্দের কারণে। ধ্বনির মধ্যে স্বনিমের স্বকীয়তা পারস্পরিক সম্পর্কে জীবনানন্দের কবিতায় গড়ে ওঠে।

জীবনানন্দের রবীন্দ্রনাথ

১

'... রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে আজ যে-আধুনিক কাব্যের ঈষৎ সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম—বাংলাসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, সাহিত্যের ইতিহাস এরকম অজ্ঞাতকুলশীল জিনিশ নয়। ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে-যুগে ঘুরে-ফিরে শেকস্‌পিয়রের কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে—এই ধাবণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ বলে বোধ হলেও অনেক কাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত প্রমাণিত হবে না—এই আমার মনে হয়।' (১৩৪৮?)

আধুনিক কাব্য রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষিত হলেও আধুনিকেরা স্বীকার করে গিয়েছেন; বুদ্ধদেব বসুও এই মতের পক্ষপাতী; তাঁর আধুনিক কাব্যসংকলন শুরুই হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে। এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলাকাব্যের বিরাট ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত; এই ঐতিহ্য ভাঙা মানে শূন্যে বিলীন হওয়া। ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ চাই কাব্যের—এলিঅটের মতবাদের সঙ্গে এখানেই জীবনানন্দের সাদৃশ্য। এবং তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে শেক্‌স্‌পিয়রের সঙ্গে, এই তুলনায় অনেকে একমত হতে না পারেন। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। ইংল্যাণ্ডে শেক্‌স্‌পিয়র যেমন নিগূঢ় ঐতিহ্য, তাঁকে কেন্দ্র করেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা চলে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও একই উক্তি করা যেতে পারে; রবীন্দ্রনাথ—ভালো হোক মন্দ হোক, জীবনের সকল অনুভূতিকে ধরে আছেন—বিশেষ করে তাঁর গান।

কিন্তু কবিতায় জীবনানন্দ কী চোখে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথকে? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এতো কবিতা অন্য কোনো কবি রচনা করেন নি। নিজের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য দেখিয়েছিন একই স্তবকে; জীবনানন্দ নিজের স্বভাবগুণে নিরালোকে ঘোরেন; তাঁর চারদিকে 'আচ্ছন্ন কহুক, ছায়া, কুবাতাস', নিজেকে ও জগৎকে চেনা পুরো নয়, নিজের কবিতার জাদুও চেনা হয়নি, এর ফলেই নিজে ফুরিয়ে যাচ্ছেন, থমকে দাঁড়াচ্ছেন; আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে—'তুমি তাকে স্থির প্রেমিকের মতো অবয়ব দিতে/ সেই ক্লীব বিভূতিকে ডেকে গেলে নিরাময় অদিতির ক্রোড়ে।/অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেলে কালের দু'ফুট মরুভূমি।' (পূর্বাশা, ১৩৪৮, আশ্বিন), 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় (১৩৪৮ অগ্রহায়ণ) জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন সূর্য হিশেবে, গরুড়ের উড্ডীন কপাল দেখেছিলেন, তাঁর উদয়-অস্তকে এক করে দিতে ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা রাজবিহঙ্গের। তাই বৈকণ্ঠের দিকে উড়ে যান রবীন্দ্রনাথ। আবার মর্ত পৃথিবীতে নেমে আসেন। রবীন্দ্রনাথের বেদনার বাক্য নীলিমাসংগীত, মানুষের গরিমা ও মানুষের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন তিনি। কল্যাণের অর্থ জাগিয়েছেন, স্বাতী-শুক্রতারার মতোন ধীশক্তি প্রেরণ করেন রবীন্দ্রনাথ। তাদেরই মতো

আভা বিচ্ছুরিত হয় এবং আভা দেয়। এই সমাজ ও রাষ্ট্র শেয়াল, শকুন, শনি, বানরে ভর্তি, যেখানে রবীন্দ্রনাথের আভা পড়ে। সৃষ্টির আদি ও অন্তিমকে মিলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ; বৈদিক অগ্নির মতো ব্যাপ্ত তাঁর সংগীত; এই সংগীত থেকেই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ব্রহ্মাণ্ডের মানে বেরিয়ে আসে। সে-সুর নিমীল হয়, লেলিহান হয় এবং নিমীলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গান মহান; সব কিছু বলয়িত করে চিরদিন। রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির আগুনের উৎস থেকে' অর্থাৎ সূর্য থেকে জন্ম নিয়ে নিঃস্বার্থ আগুনে অর্থাৎ সূর্যের কাছেই ফিরে গেছেন তাঁর সৃষ্টি শেষ করে। রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করেছেন পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওরিজেন, হোমারের সঙ্গে; তাঁরা যেমন দাঁড়িয়ে আছেন পৃথিবীর ভাঙাগড়া শেষ করে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথও দানবীয় ছবির অন্তরালে তাঁর ভাস্বরতা নিয়ে পৃথিবীর ভাঙাগড়া শেষ করে দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাস্বরতার পাশেই 'নিবিড় দানবী' দাঁড়িয়ে আছে। অথবা, ছবি মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের ম্লান চোখে। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কাছে পুরাণপুরুষ, এই অল্প আলোকে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, মৃত্যুর পরে সেই 'অনুমেয়, অজ্ঞেয় আলোকে' ফিরে গেছেন। কবিতায় জীবনানন্দ 'বলাকা'র প্রবহমান পয়ার অন্য স্বরভঙ্গিতে এর গতি ও সুরকে নিয়েই কবিজীবনের শুরু ও শেষ করেছেন, মাত্রা-বৃত্ত নগণ্য, স্বরবৃত্তও তাই। কয়েকটি গদ্যকবিতার ছন্দ আছে। সতরাং অন্তর্মূলে তাঁর যুগ বিচ্ছিন্ন অন্ধকার এনেছে।

'পঁচিশে বৈশাখ' সংকলন, (শ্রাবণ ১৩৪৯) 'রবীন্দ্রনাথ' নামক ছোট কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন অন্য রূপে ঃ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে পৃথিবীর আহ্নিক গতি উতরোল হয়ে ওঠে, লুপ্ত হস্তির পর, রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি এবং কাছের লোক, এবং অতি প্রিয়। ফা-হিয়েন যেমন অন্ধমরুতে সূর্যের সোনা দেখেছিলেন, তেমনি অন্ধকার বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ সূর্যের সোনা, তাই তিনি বিশদভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়কে মনে হয়েছে জীবনানন্দের শতাব্দীসন্ধির অসময়, অসময়ে পাপী ও তাপীর শববহনে অধীর। এই অধীরতাই কি সাধারণ লোককে সাগরের বালির ওপরে অমৃত করে তুলবে? পাতালের বালি ক্ষয় করতে পারবে?

প্রকৃতির মধ্যে সময় নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে, বিশ্ব চলছে সময়ে, মানুষের রক্তের স্পন্দন স্বাভাবিক গতিতে চলছে, 'আড়াই চালের মতো।'

'ঊষা' পত্রিকায় প্রকাশিত, (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১) রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতায় জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ফুটিয়ে তলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মানুষের মনের দীপ্তির জন্যেই প্রতিদিন নক্ষত্র ও সূর্য মধুর হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথ আজ আর নেই। বর্তমানের ইতিহাস হিমে নিমজ্জিত, তাই সাধারণ মানুষ ভাবে সৃষ্টির প্রথম নাদ––শিব ও সৌন্দর্য লীন হয়ে গেছে শেষে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ ও সৌন্দর্য এবং মূল্যবোধ ফিরে আসবেই, কেননা ভবিষ্যতের কাছে রবীন্দ্রনাথ সার্বভৌম সত্য, এবং মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসরূপে প্রতীয়মান : 'তবুও মূল্য ফিরে আসে/নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন/মানুষের চেতনায় আশার প্রয়াসে।' তাঁর কবিতায় এটা আরো গাঢ় সত্য, শেষ পর্বের কবিতায়।

এগুলি কি শুধুই স্তুতি? না জীবনানন্দের চেতনায় ও উপলব্ধিতে কাজ করেছে? শীতের কুয়াশাময় রাত্রিতে যেমন নক্ষত্রের ক্ষীণ আলো দেখা যায়, তেমনি এ-যুগের অন্ধ নরকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুব আদর্শকে এমনি দেখা গেছে বিভিন্ন কবিতায়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাসের কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জীবনানন্দের ছ'টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত। ওপরের চারটি কবিতা আছে ওঁরই সংকলিত 'জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা' বইয়ে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পরে আরো কবিতা বেরিয়েছে।

বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার কবিতাগুলিই পরে কিছু পরিমার্জিত ও পরিশোধিত; তার ফলে বাচ্যার্থ স্পষ্ট হয়েছে। বাক্যের পদবিন্যাসের বক্রতা ও নতুন দেশীয় শব্দের ভিন্ন অর্থের ব্যবহারের জন্যেই জীবনানন্দের কবিতা, এলিঅটের ভাষায়, বুঝতে প্রথমত কষ্ট হয়, বুঝলে আনন্দ তো হয়ই; তখন 'এম্‌প্যাথেটিক ফিলিং' কাজ করে। অ্যারিস্টট্‌ল্ বহুকাল আগে তাঁর 'পোয়েটিক্‌সে'র একাদশ পরিচ্ছেদে বলেছিলেন · প্রতিটি শব্দ হয় পরিচিত, নতুবা অপরিচিত, উপমামূলক নতুবা অলংকারময়, নূতনভাবে গঠিত অথবা দীর্ঘায়িত, সংকুচিত অথবা রূপান্তরিত। জীবনানন্দের বাক্যে পদ প্রচলিতই, কিন্তু মাঝে মাঝে অর্থ বোঝা যায় না। অপরিচিত পদ দেশীয় 'ইডিয়মে'র ফলে : 'আড়াই চালের মতো রক্তের চঞ্চল তাল', 'এই আড়াই চাল' দেশীয় ইডিয়মের জানা না থাকলে অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়। অদ্ভুত লাগে। সুধীন্দ্রনাথের মতো নতুন শব্দ তেমন তৈরি করেন নি, অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেন নি কখনো। জীবনানন্দের কাব্যের প্রতিভা যেমন সাংগীতিক, বিলম্বিত সুরের আলাপে মন্থর গতিতে রক্তে অদ্ভুত বেদনা জাগায়, তেমনি উপমায় অপরিচিত নামকে স্থানান্তরিত করেছেন অ্যারিস্টট্‌লের মতো নানা উপায়ে। দুই অবস্তুক বিশেষ্য স্থানান্তরে নতুন হয়ে উঠেছে : 'অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোনো এক বলয়িত পথে/মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা/দেখেছি রাত্রির রঙে বিভাসিত হয়ে থেকে আপনার প্রাণের প্রতিভা/বিচ্ছুরিত করে দেয় সংগীতের মতো কণ্ঠস্বরে।' প্রীতি বিভা হয়ে যাচ্ছে, কণ্ঠস্বর সংগীতে রূপান্তরিত ও স্থানান্তরিত হচ্ছে। উল্লেখ, নির্দেশ ও অনুষঙ্গ তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতার আর এক কারণ। আমরা পতঞ্জলি প্লেটো মনু হোমার জানি, কিন্তু 'ওবিজেন'সম্বন্ধে অধিকাংশ পাঠকই ওয়াকিবহাল নয়। আলেক্‌জেন্ড্রিয়ার খ্রিস্ট ধর্মতাত্ত্বিক ও বাইবেলের ব্যাখ্যাতা ওরিজেন (মূল নাম Origenes Adamantius, খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫-তে জন্ম ও মৃত্যু খ্রিস্টাব্দ ২৫৪) কেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলিতে হলেন উল্লেখের সাহায্যে? রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক আত্মায় বিশ্বাসী, এই আত্মা সর্বজনের হৃদয়ে নিহিত, আবার বাইরে বিশ্বকর্মরূপে এই জগৎ প্রতীয়মান। এই প্রতীয়মান জগৎ খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তনের পর প্যাগানধর্মীয়, তাই পরিবর্জিত। কিন্তু সর্বজনীন আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে ওরিজেনের লেখা 'দে প্রিন্সিপিস্'-এর সাদৃশ্য আছে; তিনি যেমন খ্রিস্টতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি বলেছেন : যৌক্তিক আত্মার স্বাধীনতা, অশরীরী স্পিরিট, অশাশ্বত জগৎ ও আসন্ন বিচারের কথা; শেষের দুটো উপাদান রবীন্দ্রনাথে নেই। প্রথম দুটির সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রকৃত তত্ত্ব (Alethis logos) বইয়ে ওরিজেন বলেন : দার্শনিক মনের চিন্তা করবার অধিকার আছে; খ্রিস্টিয় নিয়ম ও বিশ্বাস অযৌক্তিক ভিড়ের সংস্কার নয়—এখানেই দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখেছেন জীবনানন্দ। অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার আর একটা কারণ জীবনানন্দের স্টাইল—এই

স্টাইল তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র; অ্যারিস্টটল্ স্টাইল দাবি করেছেন; স্টাইল হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; পরিচ্ছন্ন স্টাইল প্রচলিত ও যথার্থ শব্দ ব্যবহার করে—এই হচ্ছে ক্লাসিক মনের কথা। ভালেরি স্টাইলসম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, জীবনানন্দসম্বন্ধে সে-কথাই প্রয়োজ্য : স্টাইল রীতি বা ম্যানারকে তাৎপর্যবাহী করে, এই রীতির মধ্যে কবিরই প্রকাশ ঘটে। কী প্রকাশ করছে সেটা খুব প্রয়োজনীয় নয়; তার প্রকৃত চিন্তার চেয়ে তার স্বভাব ব্যক্ত হয়। এই প্রকাশের ক্রিয়ায় ব্যক্তি নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলে। আরো বলেছেন ভালেরি: তিনি বিশ্বাস করেন যে ভালো স্টাইল মৌলিকতার একপ্রকার সংস্থানকে ইঙ্গিত দেয়; একটা সংহতি বা সামঞ্জস্য আনে, কল্পনার অতিরেককে বর্জন করে। ভালো স্টাইল ব্যঞ্জিত হয়; কিন্তু সংজ্ঞার্থের নিয়মে ধরা যায় না; এই স্টাইল ক্রিয়া বা কর্মের, ব্যক্তিচরিত্রকে যথা-পরিমিত করে; একটা বিশেষ টাইপ বা মডেলের মর্যদা নিয়ে আসে। ‘গরুড়ের উড্ডীন কপাল’; ‘অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেলে কালের দু’ফুট মরুভূমি’; ‘নিঃস্বার্থ আগুন’ ‘ববিনে জড়ানো জমি— জমি দিয়ে জড়ানো ববিন’—এতে যেমন ইয়েট্‌সের অনুষঙ্গ আনে, তেমনি জীবনানন্দের স্টাইলে পেইটার-এর ভাষায় ঘটনা-ফর্ম-রঙ বস্তুর সঙ্গে আত্মা জড়িত হয়ে আছে; উপস্থাপনায় জড়িত হয়ে আছে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; তাঁর পছন্দ ইচ্ছায় ও শক্তিতে। এই রচনায় বিশেষ পদবিন্যাসে বাচ্যার্থের অতুলনীয় সংগতির ফলে কবিকল্পনায় ও কবির অন্তরের আলোড়নে বস্তুর অতীত এক অনির্বচনীয়তা গড়ে ওঠে। কবিচিত্তের আলোড়ন থেকে শব্দ ও অর্থের সুষম মিলনে, কবিকল্পনায় ও কবিপ্রতিভায়, কবির অভিপ্রেত অর্থ লক্ষণীয় বিন্যাসে পরিস্ফুট হয়, তাহলেই অভিনবত্ব আসে। অভিনবত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ততাই কাব্যের প্রাণ এবং কাব্যের প্রাণকে জীবিতও করে; জীবনানন্দের কবিতায় যে-বিশিষ্ট বাক্‌রীতি দেখতে পাওয়া যায় তা তাঁর অভিপ্রায়কে অর্থবহ করে তুলেছে, কেননা এই বাক্‌বিন্যাস তাঁর অন্তরের আলোড়ন বা বেদনা থেকে উঠে এসেছে বলেই বিশিষ্ট ও বস্তুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এবং তাঁর প্রতিটি শব্দ তুলনাবিহীন। তুলনাবিহীন হয়েছে কবির বেদনা থেকে উঠে এসেছে বলে, এবং কবির অন্তরের প্রজ্ঞাদৃষ্টিও সেখানে সক্রিয়, তাই অভিপ্রেত অর্থ সুস্পষ্ট, কষ্ট করে পদবিন্যাসেব বৈদগ্ধ্যকে বুঝতে পারলে, তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের আনন্দ দেয়; একটি শব্দ ও তার বিন্যাসকে কোনো বকমেই এধার-ওধার করা যায় না, করলেই ধ্বনি উবে যাবে, সংগীতের সুর লোপ পাবে। কবির অভিপ্রায় এবং অভিপ্রায়জাত অর্থও পাওয়া যাবে না। জীবনানন্দ এই রচনার বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধ সচেতন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছন : ‘তোমার বিভূতি, বাক্‌বেদনার থেকে উঠে নীলিমাসংগীতী/আমাদের গরিমার বিকিরণে ডুবে, গড়ে গেছে সব মানুষের প্রাণ .।’ (কাব্যসংগ্রহ, ৫৩৮) ‘বাক্‌বেদনার থেকে উঠে’ এই শব্দগুচ্ছসম্বন্ধে অবহিত হলেই জীবনানন্দের রচনার অদ্ভুত শব্দবিন্যাসপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বাক্ কবিচিত্তের বেদনা বা অনুভূতি থেকেই উঠে আসে; আবার বাক্‌ই বেদনাকে অনুভূতিকে, জ্ঞানকে জাগিয়ে তোলে। এই দুই অর্থই ‘বাক্‌বেদনা’র মধ্যে লুকিয়ে আছে। উল্লেখনির্দেশের অতিশয্যের জন্যে সকলেই বিষ্ণু-দে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতার দোষারোপ করেন; কিন্তু জীবনানন্দের উল্লেখ-নির্দেশ যে বিষ্ণু-দে সধীন্দ্রনাথের চেয়েও গভীর ও দূরবিস্তারী, ‘ওরিজেন’, ‘সল’ (Saul) ‘ডেভিডে’র উল্লেখ থেকে তার নজির পাওয়া যায় : ‘তারপর তুমি এলে/এ পৃথিবী সলের

মতন/তোমার প্রতীক্ষা ক'রে বসেছিল।' যারা বাইবেল না পড়েছে, ইস্রাইলের ইতিহাস যারা জানে না, তারা সলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা বুঝতেই পারবে না। সামুয়েলের আর্শীবাদ-বর্ষিত ইস্রাইলের প্রথম সম্রাট, যাঁর অবদানে ইস্রাইলে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ঐক্য এসেছিলো; তিনি বীর যোদ্ধা, তাঁকে ট্র্যাজিক মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিলো। এই কারণে পরবর্তী নৃপতি ডেভিড শোকগাথায় বলেছেন : The beauty of Israel is slain on thy high places : how are the mighty fallen! (ii Samuel 1:19) জীবনানন্দ এই কবিতার শেষের দিকে বলেছেন : 'অবনত রূঢ় বিদ্ধ একটি পীড়িত মুখে কোন্ এক দৈত্যসম্রাটের মতো/আমাদের পৃথিবী—শতাব্দী তাহা শুনিয়াছে/যেমন শুনেছে সল ডেভিডের গান/একদিন' (পৃ. ৭৪৫)

৩

'কাব্যসংগ্রহে' রবীন্দ্রনাথের ওপর নতুন দুটি কবিতা—'তার পর তুমি এলে' ও 'পৃথিবীর কোলাহল সব ফুরিয়ে গেছে' 'অন্যান্য কবিতা বিভাগে ৭৪৩ ও ৮২৪ পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, 'তারপর তুমি এলে' বেরিয়েছিলো 'প্রতিক্ষণে', (বৈশাখ ১৩৯১-এ), কিন্তু রচনা কবে হয়েছিলো তার তথ্য নেই 'কাব্যসংগ্রহে'। এবং ৮২৪ পৃষ্ঠায় গ্রথিত 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি বিষয়ে কোনো তথ্যই আমি খুঁজে পাই নি। আমি অনুসরণ করেছি সব সময় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত বইটি।

রবীন্দ্রনাথ লিরিক ও রোম্যান্টিক কবি; কিন্তু শেষ পর্বে কিছু কিছু কবিতায়, যেমন 'শিশুতীর্থ' 'পৃথিবী প্রণাম' প্রভৃতি কবিতায় যে-বিস্তারতা ও মহত্ত্ব এবং উদারতা দেখা যায়, তা আমাদের মনে সাব্‌লিমিটির অনুভব নিয়ে আসে। যদিও বৈশ্বিক পটভূমি—যা মহাকাব্যের প্রধান গুণ, সেটা হয়তো নেই। 'রবীন্দ্রনাথ'-বিষয়ে জীবনানন্দের একটি কবিতা, যার শুরু 'তারপর তুমি এলে/এ পৃথিবীর সলের মতন' সাব্‌লিমিটির গুণে অন্বিত : 'কীট পোকা ফরিঙ্ হরিণ পাখি মানুষের অবিশ্রাম জীবনের সাগরের ঢেউ-এর ভিতরে/মুহূর্তে-মুহূর্তে যেই বেদনারা এশিরীয় সৈন্যদের মতো বর্শা তুলে নেচে ওঠে/তারা পরাজিত হয়—' এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে সেই সাব্‌লিমিটি।

সাব্‌লিমিটিসম্বন্ধে লঙিনস যে-কথাগুলি বলেছিলেন এখানে তো প্রযোজ্য : সাব্‌লিমিটি নির্ভর করে পরম উৎকর্ষ ও ভাষার বৈশিষ্ট্যে; এটাই একমাত্র জরুরি ও জোরালো যে উন্নত ভাষার জন্যে বিস্ময়ে আমাদের টেনে নিয়ে যায়; শুধু সন্তুষ্টি দেয় না, সুপরামর্শ ও যুক্তির কাজ নয়; যুক্তিপরামর্শ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু সাব্‌লিমিটির মধ্যে অদম্য শক্তি ও দক্ষতা নিহিত। সমগ্র রচনার মধ্যেই আবিষ্কারের নিপুণতা, যথার্থ শৃঙ্খলা, উপাদানের উপযুক্ত বিন্যাস জড়িয়ে থাকে; বজ্রবিদ্যুৎ যেমন এক নিমেষে সমস্ত উদ্‌ভাসিত করে, সাব্‌লিমিটিও তেমনি সমস্ত উপাদানকে এক মুহূর্তে আলোকিত করে। শিল্পের বিষয় মেনে সাব্‌লিমিটি আসে না, এ প্রকৃতির সন্তান, যেমন প্রতিভা জন্মগত ও স্বাভাবিক। সাব্‌লিমিটির সমস্ত ক্রিয়ায় প্রকৃতিই প্রধান কারণ ও মৌল সৃষ্টিধর্মী সূত্র; সাব্‌লিমিটির ইম্‌পাল্‌সের সঙ্গে জ্ঞানের সাব্‌লিমিটিও থাকা দরকার। মানবজীবনে যেমন সৌভাগ্য ও সুবিবেচনার প্রয়োজন, সাব্‌লিমিটির ভাষার ক্ষেত্রে প্রকৃতিই হলো সৌভাগ্য এবং সুবিবেচনা, শিল্পকে রূপায়িত করে। বিশেষ ভাষার প্রভাব প্রকৃতি থেকেই আসে, একে আয়ত্ত করা যায় না।

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে শেষ পর্বের অন্য কয়েকটি কবিতার মধ্যেও এই সাব্‌লিমিটি আমি লক্ষ করি। 'রবীন্দ্রনাথ'-বিষয়ে এই কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিতে হার্ডির প্রভাব আছে বলে আমার মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় যেমন আছে; জীবনানন্দও বলেন : 'সব চেয়ে আসুরিক বিজয়ের সাম্রাজ্যের থাম ভেঙে সুন্দর পাবে না তুমি কিছু।'

৪

রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনানন্দ কী দেখতে পেয়েছিলেন: মানুষ প্রাণী কীট প্রভৃতির মধ্যে বেদনা, কীটের জীবনে সহিষ্ণুতা, পাখির জীবনে প্রেম, আর মানুষের মধ্যে ক্ষমা ও প্রেম : 'এক ক্ষমা—এক প্রেম—মানুষের হাতের প্রতিটি কাজে বেঁচে থাকে'; 'সৃষ্টি চলে সুন্দরের দিকে/ক্ষমা প্রেম স্থিরতার পানে/নক্ষত্রের শান্তির উদ্দেশে।' 'এরা কি সুন্দর নয়? ব্যথার সমুদ্রে ফোটে এই সব সূর্যমখী'; সল-ডেভিড যেমন গান শুনেছে, রবীন্দ্রনাথও শতাব্দীর গান শুনেছেন। এই শতাব্দী ও আমাদের পৃথিবী দৈত্য-সম্রাটের মতো—এরকম শতাব্দীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছিলেন : 'তুমি এই পৃথিবীরে তোমার গানের সুতা দিয়ে আকাশের অন্য সব নক্ষত্রের সাথে গেঁথে দিয়ে চলে গেছ/আজও তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে, সুন্দর নিকটে এত—শান্তি প্রেম ক্ষমা।' 'কবি তুমি ক্রমে ক্রমে হিম হয়ে পড়িতেছ বলে/সুন্দর যেতেছে মরে ধীরে-ধীরে/শান্তি আর থাকিবে না।' 'ব্যথা রবে শুধু!/সহিষ্ণুতা রবে।/প্রেম রবে।' শেক্‌সপিয়রকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যগে সঞ্চারিত হয়েছেন, বৃত্ত রচনা করেছেন, ব্যাপ্ত হয়েছেন; রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেও জীবনানন্দ প্রথম পর্বের অবক্ষয়ের জীবন থেকে সঞ্চারিত হয়ে ব্যাপ্ত হয়েছেন : শেষের দিকেও তিনি জানেন, এ পৃথিবীতে সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই : 'তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে/অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে/যে-অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের/ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার/বলয়ের নিজগুণ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।' পুরো বাক্যটিই সাব্‌লিমিটির নিদর্শন : 'চেতনার বলয়ে নিজ গুণ' যেন উপনিষদের আত্মা। একথা স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্রাহ্ম, জীবনানন্দও ব্রাহ্ম ছিলেন। দুজনেই বিশ্বাস করতেন, মানুষের আত্মিকতা থেকেই, সেই মহাত্মা ও বিশ্বকর্মা সর্বজনের হৃদয়ে নিবিষ্ট হয়ে আছে; অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে ওঠে; এ-অন্ধকারে শতাব্দীর সে-দৈত্য-সম্রাটের মতো দাঁড়িয়ে আছে : 'তবু' 'তবুও' এই অব্যয়ের ব্যবহারে শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করেন জীবনানন্দ : 'তবু আকাশ হংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।' 'তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ সুস্থ করে নিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,/সব ভবিতব্যতার অন্ধকার দেশ/মিশে গেলে; জীবনকে সকলের তরে ভালো করে পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো/অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।/একদিন স্বর্গে যেতে হ'তো'; 'সভ্যতার সঙ্কটে'র অন্তিম প্রার্থনা এখানে অনেকের মনে পড়বে। তিনি যুগের মধ্যে বাস করে দেখেছিলেন, এক বিপন্ন বিস্ময় কাজ করে জীবনে, তিনি নক্ষত্রকে মরে যেতে দেখেছেন; মৃত নক্ষত্রের বুকের শীত কবির শরীরে লাগছে। আলো-অন্ধকারে—স্বপ্ন শান্তি ভালোবাসা নয়, হৃদয়ের মধ্যে এক বোধ জন্মে,

এই বোধ থেকেই মানুষের শিশুদের মুখ দেখতে পাননি। এই যুগের ১৯২৯-৩০-এ, সার্বিক অবক্ষয় এই ভীষণতা বা 'ড্রেড' থেকে জন্ম নিয়েছে : 'চোখে কালো শিরায় অসুখ,/কানে যেই বধিরতা আছে,/যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে/নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,/যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে—সেই সব।' এই 'ড্রেড' বা ভীষণতাই মানুষকে শান্তি দেয় না, আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে; 'জানি—তবু জানি/নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;/ অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়—আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে; /ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;' 'এই ড্রেড' বা ভীষণতা—নিরানন্দময় অর্থহীন ঘটনার উপলব্ধির সূচনার ভয় ও উদ্বেগ আত্মঘাতী ক্লান্তির মধ্য দিয়ে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়—এই বোধ জীবনানন্দের শেষ পর্বেও অন্তর্হিত হয়নি, এর মধ্যে খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি আনতে চেয়েছেন; তার ফলে নারকীয় অন্ধকারে কিছু আলো জ্বলছে—এই আলো রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত উদাত্ত আহ্বানের মতো নয় : 'ব্যক্ত হোক জীবনের জয়' এবং অক্লান্ত বিস্ময়; সকল পথের বন্ধন ছিন্ন হলেও, মৃত্যু-আঘাত লাগলেও, পথে চলতে-চলতে কোথা থেকে তাঁর পরমের পরশ পান রবীন্দ্রনাথ; তাই রবীন্দ্রনাথ থেকেও রবীন্দ্রনাথ নেই জীবনানন্দে। আমার বারবারই একটা সাদৃশ্য মনে পড়ে জীবনানন্দের কাব্য পড়ে, বিষ্ণু দে বলেছিলেন : আমরা নরকে আছি, আমরা জানি না, তাই বর-বধূর মিলন হয় না; এই নরক তমসাচ্ছন্ন, পাপীদের শরীরের দুর্গন্ধে পূর্ণ, রক্তমাংসের কাদা চারদিকে, চুল হাড়, মৃতদেহ ছড়ানো, মশা-মাছি কৃমিকীট হিংস্র ভাল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগুন জ্বলছে সর্বব্যাপী। পাহাড়ের প্রেত ও গৃধ্র ঘুরছে চারিদিকে। রক্তমাখা ছিন্নপদ, ছিন্নবাহু, ছেঁড়া পেট পড়ে আছে মৃতদেহের পাশে—এসব দেখে যুধিষ্ঠিরের মনঃকষ্ট হচ্ছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, দুর্গন্ধ সইতে পারছে না—এই নরকের অন্ধকারেও যুধিষ্ঠির তার দিব্যতা নিয়ে উপস্থিত—জীবনানন্দ মারা যাবার পর (১৯৫৪) এই নরক আরো গভীর যন্ত্রণাময় ও ব্যাপক হয়েছে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছরে—দেশ টক্‌রো হয়েছে—এবার আরো টুক্‌রো-টুক্‌রো হবে—বিশ্বজনীনতার বদলে প্রাণিগ্রাসিতার প্রভুত্ব আজ। জীবনানন্দের সময়ে, দুই যুদ্ধের কালে, যুরোপীয় সাহিত্যের ও সমাজের প্রভাবে তিনিও এই ভীষণ নরককে দেখেছিলেন, যে-নরকের অন্ধকারে 'ড্রেড' মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখেছেন ঔপনিবেশিক শাসনে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও উৎসন্ন রূপ, নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তি, অস্থিরতা, মৃত্যুর তাড়না, শূন্যতা, নিরাশ্রয়তা, নিঃস্বতা, শরীর ও মাংসের জন্যে সম্ভোগের লালসা ও প্রেমহীন ভালোবাসা। এই নরক থেকে জীবনানন্দকে বাঁচিয়েছিলো খণ্ডকালের মধ্যে হেগেলিয় ইতিহাসবোধ এবং কালের চেতনা এবং প্রকৃতির স্নিগ্ধ শিশির আঁধার এবং কিছু স্বপ্নের পলায়ন। এই শেষের তিনটি উপাদানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কাছে টেনেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করেছেন সুন্দর, ক্ষমা, প্রেম, স্থিরতা, ঋত-নক্ষত্রের শান্তি; এই প্রার্থনার উপলব্ধিতে বুঝেছেন : মানুষ ও জগৎ যতোদিন থাকবে, মানুষের হৃদয়ে থাকবে ব্যথা সহিষ্ণুতা প্রেম। যখন কাব্য শুরু করেন, এগুলির অর্থ তেমন বুঝতে পারেন নি, তাই রবীন্দ্রবিরোধী হয়েই শুরু করেছিলেন অনাদের মতো : 'বীঠোফেনের কোনো কোনো Symphony বা সোনাটার ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু আজও তো টিকে আছে—চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকার

সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।' (রবীন্দ্রনাথকে লেখা-চিঠি, ১৩৩৭, পৌষ) serenity বা প্রশান্তি তাঁর সুর নয়, পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জরতা তো আছেই, এমনকি জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি খুব পরিস্ফুট নয়; গ্রিক নাটকে, দান্তের কাব্যে, শেলি'র রচনায় এই প্রশান্তি নেই; 'মুডে'র প্রভাবে, সময়ের পরিবর্তনে, 'মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে।' রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ্‌কে স্মরণ রেখেও অশান্তি আগুন, মৃত্যু অন্ধকার অপচয় হতাশার ভেতর তাঁর কবিতা শুরু করেছেন; যেহেতু রবীন্দ্রনাথ মনের মধ্যে রয়েছেন, তাই শেষ যুগে 'তবু' উঠে এসেছে। 'আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়/স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।' (আলোপৃথিবী) রবীন্দ্রনাথের গানের একটা কলি ভেসে আসে আমার হৃদয়ে : 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।/তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্যচন্দ্রতারা।'

রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে শেষ কবিতায় জীবনানন্দের মনে হয়েছে : রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কোলাহল ফুরিয়ে গেছে, নক্ষত্রের ভিড়ে ঘুম এসেছে বলে নক্ষত্রের আলো নিভে যাবে, অন্ধকার নিস্তব্ধ চরাচর পড়ে থাকবে; ভালোবাসারও চিরকাল হয়তো থাকবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যর পর 'সেই হিম অন্ধকারের শান্তির ভিতর/বিধাতার হাতের কাজ ফুরিয়ে যাবে।' হাতের কাজ মানে সৃষ্টি, সৃষ্টি ফুরিয়ে গেলে ঘুম অর্থাৎ মৃত্যু ছাড়া নক্ষত্রের ভিড়ে আর কী থাকবে! রবীন্দ্রনাথই জীবনানন্দের কাছে জীবন ও নক্ষত্রের আলো এবং গানে-গাঁথা ঋত।

৫

'কবি' কবিতায় জীবনানন্দ কী হতে চেয়েছিলেন, কী বুঝেছিলেন, কী উপলব্ধি করেছিলেন? সৃষ্টির ছায়াধূপে ভ্রমরীর মতো কবির মন ঘুরে বেড়ায়; তিনি নিদ্রাকর্ষক মাটির আঁখি; নেশাখোর চোখের স্বপ্ন; নির্জনে সুর সাধেন; কবির মানসীর বেণী বাঁধেন তিনি, এই কবিকে মানুষ দেখে নি ও চেনে নি; সবই চেনা-চেনা মুখ মনে হয়, তবু অজানা ও সুদূর সমস্ত দৃশ্য ও মানুষ—এ পর্যন্ত রোম্যান্টিক সেন্টিমেন্টালিটিকে প্রকাশ করছে; শব্দচয়নে মোহিতলাল ও নজরুলের অনুকরণ প্রকট।

এক কবিতারই একটু পরে তিনি বলেন : 'হেমন্তের হিম মাঠে', আকাশের কুয়াশা ভেদ করে এবং কুয়াশার মধ্যে বকবধূটির মতো শাদা ডানা মেলে উড়ে যান। এই কবির সুর 'দুপুর আকাশে ঝরাপাতাভরা' বড়ো নদীর পাশে শোনা যায়, তাঁর সুরের সঙ্গে ঘুঘুর সুর মেশে, পৌষ রাত্রিতে জলডাহুকির বুকে মিশে যায়, আর হলদ পাতার ভিড়ে ও শিরশিরে পুবালি হাওয়ায় তাঁর সুর ধ্বনিত হয়। এখানেই অপচয়, অবক্ষয় ও নৈরাশ্য ব্যক্ত হচ্ছে জীবনানন্দীয় চেতনায়, হেমন্তের ঠাণ্ডা মাঠ, আকাশের কুয়াশার সঙ্গে নিজের কুয়াশা, ঝরা পাতা, মৃত নদী, পৌষ রাত্রির জল—ডাহুকির সুর, হলুদ পাতা, শিরশিরে পুবালি হাওয়া—এইসব উপাদানে। এর সঙ্গে মিশেছে ভুতুড়ে দীপের চোখ, নিভে-যাওয়া প্রদীপের 'ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে'—এই সেই রবীন্দ্রবিরোধ, ঝরা পালকে আকাশ থেকে মাটিতে থুবড়ে পড়ার ট্র্যাজিডি যেমন আছে, তেমনি ধূসর ধোঁয়াযুক্ত

হয়েছে। একদিকে বিধবা যা রিক্ততার প্রতীক, অন্যদিকে জ্যোৎস্না—এই দুয়ের মধ্যে কবির আবির্ভাব ও তাঁর সরের উপস্থিতি; অথচ রোম্যাণ্টিক স্বপ্নও দেখেন। উস্‌খুশ্‌ এলোচুলে কিশোরীর নগ্ন মুখ, কিশোরীর নগ্ন মুখের পাশে তার সুর ভাসে, কবির উড়ুনি অলক্ষ্যে উড়ে যায়। রোম্যাণ্টিকের মতোই বলে ওঠেন বিষাদে : 'মনের হরিণী তার ঘুরে মরে হাহাকারে বনের বাতাসে', এরি মধ্যে জ্বলে ওঠে অন্ধকারে চোখ, কিট্‌সের মতোই বলে ওঠেন, অন্ধকারে খেয়া ভাষায় কোন্‌ পাষাণী—রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সঙ্গে কিট্‌সের নিষ্ঠুরা মিশে গেছে। কী তাঁর হারিয়েছে কবি জানেন না; তিনি শুধু খুঁজে বেড়ান একা; আঙুল হাতড়ান, পুবের বাতাস কাঁদে। জীবিত মানুষ নয়, শ্মশানে মৃতের বুকে পিপাসার শ্বাস জাগে—কবির জন্যেই মৃতা নারী মখ তোলে, শীতল চিতা শিখা জ্বেলে দেয়, দগ্ধ হয় বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা। রোম্যাণ্টিকতার সঙ্গে অবক্ষয়বাদীদের অপচয় একসঙ্গে মিশেছে—যদিও দৃঢ় ও নিটোলভাবে নয়, বড়ো শিথিল—তব জীবনানন্দীয়ের চেতনাকে এই দুই বিরোধে পাই। (প্রগতি, আশ্বিন ১৩৩৪); 'প্রবাসী' মাঘ ১৩৩৪-এ 'কবি' শীর্ষক কবিতায় দেখি কবি সৃষ্টির ছায়াধূপে খুঁজে বেড়ান আকাশে আলোকে। এই রূপের মধ্যে পৃথিবীর শোক ও ব্যর্থতা দেখেন, এই শোক ও ব্যর্থতার মধ্যে স্বপ্ন খোঁজেন, তিনি সুন্দরের পূজারী, তাই দীপ হাতে নিয়ে অন্ধকারে জেগে থাকেন। ঘৃণ্য নগরের মুখে শুভ্র গৌরব দেখতে পান; বীভৎস কুৎসিত কুণ্ডে ও পঙ্কে সুন্দরকে খোঁজেন তিনি; এইভাবেই রিক্ততাকে জয় করেছেন; কবির কাজ হচ্ছে বিকৃত তৃষ্ণার ব্যথা—বন্ধনের রক্তকৃষ্ণ রেখাকে অরুণিমা দেখানো রাত্রির যাত্রীর ভীত নিস্পন্দিত চোখে। অতিদূর অনাগত স্বপ্নের আলোকে ভবিষ্যতের ভাবলোকে উৎসব জাগিয়ে তোলা। এখানে সমাজচেতনতা ও রোম্যাণ্টিকতা দুই প্রকাশ পাচ্ছে একসঙ্গে।

১৯২৭ নাগাদ বিদেশি প্রভুদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সংগ্রামের ইতিবৃত্তও এই 'কবি' কবিতায় আছে। দিনরাত্রি রক্তদহনের আলো নিদ্রাহীন ব্যথা জাগায়। তবু এক অন্তর্নিহিত সুরকে জীবনানন্দ কবি হিশেবে ভালোবাসেন যার মধ্যে রোম্যাণ্টিকতা সক্রিয় : যা হারিয়ে গেছে, যাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না উষা ও গোধূলিতে, তারই খোঁজে তিনি খুঁজে বেড়ান, তারই জন্যে তাঁর অশ্রু ঝরে। কবি হচ্ছেন 'ব্যথার তাপস'; তাই বেদনাকে ভালোবাসেন; ঐশ্বর্যের যশ তিনি চান না, প্রসাদ-সম্মানও তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা : 'আমি কবি—পথে পথে গেয়ে যাব গান;/পদেপদে মৃত্তিকারে মঞ্জরীর মতো/বাজায়ে চলিব আমি—আমি অনাহত/আদি মানবের ছন্দে উঠিব ঝঙ্কারি/নীলিমার জয় গান, শ্যামশষ্প নিঙাড়ি নিঙাড়ি/ভরি লব শোণিতের সরাপাত্রখানা!' পথে গান গাওয়ার অর্থ সকল মানুষের গান করবার আকাঙ্ক্ষা, মৃত্তিকার মঞ্জরীর মতো চলা—এই পৃথিবীকে ভালোবেসে মঞ্জরিত মুকুলিত করে তোলা; রোম্যাণ্টিকদের মতোই অনাহত ও আদি মানবের ছন্দে নীলিমার জয়গান করতে চাইছেন তিনি; মঞ্জরিত মৃত্তিকা এবং নীলিমা একসঙ্গে তাঁর কবিতায় প্রকাশ পাবে; পরবর্তীকালে 'ঘাস' কবিতায় যে-অনুভবের কথা বলেছিলেন : 'আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে-গেলাসে পান করি,' ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান করছেন যেন; আর এখানে ঘাস নিঙড়ে নিয়ে দেহের রক্তের পাত্রভরে নিতে চান জীবনানন্দ, প্রকৃতির সঙ্গে রক্তের যোগ ঘটছে,

যেমন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের যোগ ঘটায় প্রকৃতি, চৌষট্টি নম্বর 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিই তার প্রমাণ। মানুষ, পৃথিবী ও আকাশ এবং প্রকৃতির গূঢ় রস—সব মিলেই কবিকে সমগ্র করে তোলে। আর কী চান জীবনানন্দ—না-আঁকা ছবি, অনামা অজানা রূপ শিশুর মতো সকালে সন্ধ্যার রঙে তিনি দেখবেন ঃ রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' কবিতায় বলেছেন : 'যা-কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন/দিতেছি চরণে আসি—/অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,/বিফল বাসনারাশি।' 'সাধনা'র সঙ্গে 'আবেদন' 'নগর সংগীত' প্রভৃতি কবিতার আভাস অনুভব করা যায় জীবনানন্দের 'কবি' কবিতায়, হয়তো রোম্যান্টিকতার সূত্রেও আসতে পারে।

সমুদ্রতীরে রোদে শুয়ে থাকবেন, শঙ্খচূর্ণ ধূম্র বালি গায়ে মেখে কোলাহলে পায়ে-চলা পথ দিয়ে যাবেন সমুদ্রফেনার মতো : এখানে রোম্যান্টিকতা—যার মধ্যে অসীমের দৃষ্টির আত্মিক উদ্‌ভাসন ও ধ্রুব আদর্শ প্রতীকিত হয় আলোয়—এবং রবীন্দ্রনাথের ছায়া সুস্পষ্ট : '...যে কথা কহে নাই কেউ/যে-গান গায় নি কেহ—তারি সিন্ধুঢেউ/তুলে যাব কূলে-কূলে,—পৃথিবীর প্রথম বয়স/ফিরায়ে আনিব আমি,—আদি উষা—আদিম দিবস,/ঊর্মিস্নাত মানবের অসীম উল্লাস,/প্রথম রহস্য ব্যথা—বিস্ময়ের ত্রাস, /প্রকাশ করিব মোর স্নায়র যৌবনে।' রোম্যান্টিকদের একটা প্রবণতাই—রুশোর আত্মজীবনীর মধ্যে যা সুস্পষ্ট—আদি ও আদিমতার প্রতি আকর্ষণ, অসীমের উল্লাস তাঁদের টানে, প্রথম রহস্য আলোড়িত করে, ব্যথা দূরে নিয়ে যায়, বিস্ময়জাত ত্রাসের মধ্যে উন্মাদনা—যা শেলি'র মধ্যে লক্ষণীয়। কবি যখন রচনা করেন, তিনি আদিম সন্তান হয়ে ওঠেন; তাই রচনার সময় রোমে-রোমে শিহরন জাগে, আর সোনার ধানের মঞ্জরী, দুপুরের রোদের বুকে নিজেকে ছিন্ন করে দেবেন। আদিম সন্তান, রোমে শিহরন, স্বর্ণশীর্ষ ধানের মঞ্জরী, দুপুরে রোদের বুকে নিজেকে ছিন্ন করা—সবই রোম্যান্টিকতার আদর্শ—এই রোম্যান্টিকতা কালো রোম্যান্টিকতা নয়, যদিও অবক্ষয় ও কালো রোম্যান্টিকতা তাঁর কবিতায় গভীরতর ছাপ ফেলেছে, অস্তিত্ববাদের স্মরণীয় মদ্রা আছে। 'প্রবাসী'তে 'কবি' কবিতাটিতে পত্রিকার জন্যেই রবীন্দ্রআলোকিত রোম্যান্টিকতার স্পর্শ বেশি।

জীবনানন্দ প্রবন্ধেও কবির লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে কল্পনার ওপর জোর দিয়েছেন। কবিদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভেতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা থাকে আর থাকে গভীর ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক জগতের যোগ। কোল্‌রিজের মতোই তিনি কল্পনাকে কবির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন কান্টের অনুসরণে, দ্বিতীয় অংশে ঐতিহ্যের ধারায় এসেছেন এলিঅট। এই রোম্যান্টিকতার পথ ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের যোগ : 'কাব্যের আকাশের ওপারে আকাশে স্বাদিত, অনাস্বাদিত নক্ষত্রের মতো সব খুঁজে পাওয়া গেলো যেন।' এবং প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঐতিহ্য হিশেবে গ্রহণের স্বীকৃতি: 'বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।' (কবিতার কথা, বৈশাখ, ১৩৪৫, কবিতা) সতরাং, রবীন্দ্রবিরোধিতা সনিশ্চিতভাবে কতোখানি তাঁর চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধিতে কাজ করেছে অনুধ্যানের বিষয়। যুগের দাবিতে ও বাস্তবতায় নিভে-যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ার সর শুনেছেন; কবিকল্পনা ও ব্যক্তিপ্রতিভার জন্যে অন্তরপরিস্পন্দিত পদবিন্যাসে সংগতি ও জাদু সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কবিতায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি স্বতন্ত্র।

৬

শেক্‌স্‌পিয়রকে কেন্দ্র করে সঞ্চারিত ব্যাপ্ত হয়েছেন ইংরেজ কবিরা, তাঁর মধ্যে মিল্টন ও ম্যাথু আর্নল্ডের দুটি সনেটের কথা মনে পড়বে, যার কিছু সাদৃশ্য জীবনানন্দের ভাবনায় আছে। মিল্টনের কবিতাটি রচিত ১৬৩০-এ; মিল্টন বলছেন ঃ শেক্‌স্‌পিয়রের কী প্রয়োজন? তাঁর সম্মানিত দেহের হাড়, যুগের পরিশ্রম, স্তূপীকৃত পাথরে; অথচ তাঁর জ্যোতির্বলয়িত ও জ্যোতির্ময় চিহ্ন লুকোনো থাকা উচিত নক্ষত্র-আলোকিত পিরামিডের নীচে? স্মৃতির প্রিয় পুত্র, খ্যাতির বিরাট বংশধর। তোমার নামের এরকম দুর্বল সাক্ষীর কী প্রয়োজন? তুমি আমাদের বিস্ময় ও আশ্চর্যে নিজেকে তৈরি করেছো জীবনব্যাপ্ত স্তম্ভ। ধীরে চেষ্টিত শিল্পের লজ্জার কাছে তোমার সহজ সংগীত প্রবাহিত হয়। এবং প্রত্যেকের হৃদয় তোমার অমূল্য পৃষ্ঠা থেকে। সূর্যদীপ্তিময় ডেল্‌ফির ভবিষ্যদ্‌বাণী তোমার কবিতার পঙ্‌ক্তি গভীর ইম্‌প্রেশনসহ গ্রহণ করে। তারপর তুমি; আমাদের কল্পনা নিজেই শোধ করে, আমাদের মার্বেল করে দিয়েছে, অতিরিক্ত ধারণা কল্পনায় আড়ম্বরে এইভাবে সমাধিস্থ; তুমি শুয়ে আছো; রাজারাও এই সমাধির জন্যে মরতে চাইবে। শেক্‌স্‌পিয়রের শিক্ষাবিহীন নৈসর্গিক প্রতিভা অতুলনীয় : For whilst to th', shame of slow-endeavoring art/Thy easy numbers flow, and that each heart/Hath from the leaves of thy unvalued book/Those Delphic lines with deep impression took, জন্‌সন্ বলেছিলেন শেক্‌স্‌পিয়রকে : তুমি এক স্মৃতিস্তম্ভ, সমাধি নয়,—এর আভাস আছে মিল্টনের কবিতায়। স্যার এডোয়ার্ড স্ট্যান্‌লির ওপর এফিটাফ্ জানতেন, এবং সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন মিল্টন। এই এপিটাফ্‌টি শেক্‌স্‌পিয়রে আরোপিত ধরা হয় : Not monumental stones preserves our fame;/Nor sky-aspiring pyramids our name;/the memory of him for whom this stands shall outlive marble and defacer's hands. শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এই জাতীয় সাধারণ আইডিয়া হোরাসই প্রথমত প্রকাশ করেন। মিল্টনের নৈসর্গিক প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত থাকলেও বিভিন্ন কবির অনুভব ও প্রকাশকে গ্রহণ করেছেন নিজের কবিতায়—ক্ল্যাসিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ ইংরেজি কবিতায় প্রথম থেকেই—ভারতীয়েরা ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছে বলে যুরোপিয় ক্ল্যাসিকের দৃঢ়তা ও শাশ্বত বোধের সঙ্গে বৈশ্বিক পটভূমিকা তেমন পায় নি; তাই যুরোপিয় সাহিত্যের তুলনায় বাংলাসাহিত্য অনেকটাই দুর্বল; মেকলের কথায় অতিশয়োক্তি থাকলেও কিছুটা সত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন ইংরেজিচর্চার সঙ্গে সংস্কৃতকে গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন বলে। এদিক থেকে মধুসূদন দুই ক্ল্যাসিকের মিলনে শাশ্বত সাহিত্যরচনায় প্রথম ও সার্থক পুরোহিত; তাঁর আদর্শই, আমার মতে, সার্থক রচনার পথপ্রদর্শক। ম্যাথু আর্নল্ডের সনেটটি মিল্টনের মতো গভীর নয় : অন্যেরা আমাদের প্রশ্ন মেনে চলে; কিন্তু তুমি (শেক্‌স্‌পিয়র) মুক্ত। আমরা জিগ্যেস করি এবং জিগ্যেস করি, তুমি হাসো আর শুধু হাসো। জ্ঞানকে ওপরে ছাড়িয়ে যাও; মহান্ উন্নত পাহাড় নক্ষত্রে তার মহত্ত্ব: মুকুট ফেলে রেখে তার দৃঢ় পদক্ষেপ সমুদ্রের নীচে প্রোথিত; তার নিম্ন মেঘময় রেখা ছায়া পরিহার করে, নশ্বরতার নষ্ট অন্বেষণ পর্যন্ত। নক্ষত্র ও সূর্যরশ্মি তোমাকে জানে; তুমি স্বশিক্ষিত, স্বনির্ণীত, সুসম্মানিত, স্বরক্ষিত; অননুমেয়ভাবে

তুমি এই পৃথিবীতে হেঁটে বেড়িয়েছো—তাই উন্নত। সব ব্যথা শাশ্বত আত্মা সবই সইবে : যে-সব দুর্বলতা নষ্ট করে, সব শোক নত হয়, একমাত্র ভাষায় জয়ী ভ্রূ'তে দেখা যায়। শেক্‌স্‌পিয়র মস্ত প্রতিভা, তাঁর রচনার রহস্য অজ্ঞাত, সমস্ত বিশ্বকে জড়িয়ে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ, পাহাড় নক্ষত্র থেকে সমুদ্রের নীচে পর্যন্ত; নক্ষত্রসূর্যরশ্মি তাঁর রক্তে; তিনি আয়ত্ত করেন নি কিছু, জন্মগত প্রতিভা থেকে জাত। তাঁর রচনা তাই উন্নত। ব্যথা, শাশ্বত আত্মা, সব দুর্বলতা, শোক তাঁর প্রতিভার কাছে নত হয়, ভাষার যথার্থ প্রকাশে জয়ী হয়েছে। জীবনানন্দের 'রবীন্দ্রনাথ'-বিষয়ক কবিতায় এই সনেটটির আভাস আছে : 'নিজের কেন্দ্রিক গুণে সঞ্চারিত হয়ে উঠে আপনার নিরালোকে ঘোরে।'

শেক্‌স্‌পিয়র সম্বন্ধে কোল্‌রিজের ও হ্যাজলিটের আলোচনা তুলনাবিহীন, কেউ তাঁদের সঙ্গে স্পর্ধা করতে পারে না; কোল্‌রিজ্‌ বলেন : শেক্‌স্‌পিয়র স্পিনোজার দেবতা, সর্বত্র বিরাজমান সৃষ্টিশীলতা—এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে : Shakespeare is the Spinozistic deity—an omnipresent creativeness. Milton is the deity of prescience ; His rhythm is so perfect that you may be almost sure that you do not understand the real force of a line if it does not run well as you read it. The necessary mental pause after every hemistich or imperfect line is always equal to the time that would have been taken in reading the complete verse. (Table Talk, 1830) এই উক্তির পাশে তারকনাথ সেনের প্রবন্ধের বিস্তার বড়ো ক্ষীণ ও ম্লান মনে হয়।

কিট্‌স্‌ শেক্‌স্‌পিয়রের প্রতিভার উৎকর্ষসম্বন্ধে বলেছেন 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি' : .. Shakespeare possessed so enormously—I mean negative capability, that is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason . .that with a great Poet the sense of beauty ovecomes every other consideration or rather obliterates all consideration. (Dec. 21, 1817, a letter to George and Thomas)

প্রথম জীবনে শেক্‌স্‌পিয়রের ত্রুটি স্বীকার করে টি. এস. এলিঅট শেষ জীবনে শেক্‌স্‌পিয়রের মহত্ত্ব-সম্বন্ধে বলেন : But, for the understanding of Shakespeare, a lifetime is not too long; and of Shakespeare, the development of one's opinions may be the measure of one's development in wisdom. এলিঅটের বক্তব্য জীবনানন্দ শুনে যেতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত; বেরিয়েছে ১৯৬২ সালে একটি ভূমিকায়। শেক্‌স্‌পিয়র যে-যুগে যুগে সঞ্চারিত ও ব্যাপ্ত হয়েছেন উদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণেই প্রমাণ; রবীন্দ্রনাথও এইভাবেই বাংলাসাহিত্যে হয়েছেন এবং হবেন, এলিঅটের কথার মতোই।

রচনাকাল, ২৮ আগস্ট ১৯৯৬

বিশুদ্ধ কবিতা ও জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দের-গদ্য কবিতার ছন্দের মতোই অসহায় দুর্বল ভঙ্গর, কিন্তু কবিতার মতোই সবুজ মদের মাদকতা চেতনা মনন ও বেদনাকে শাণিত করে, রক্তাক্ত করে, সমস্ত শরীরে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যতত্ত্বে দুটি ভাগ, একটিতে আছে কবির অভিজ্ঞতা কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে কীভাবে সক্রিয়, অন্যটিতে আছে সমালোচক হিশেবে কবিতাপাঠ কীভাবে করতে হয়। কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে বলেছেন কবি সকলে হয় না, সেই সকল ব্যক্তিই কবি যাদের হৃদয়ে কল্পনা এবং কল্পনার ভেতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে বিগত শতাব্দী ধরে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকিরণ তাদের সাহায্য করেছে। কবির এই বিশেষ সংজ্ঞার্থের মধ্যেই জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্বন্ধে চেতনা স্পষ্টীকৃত হয়েছে। তিনি এর মধ্যে কোনো নতুন কথা বলেন নি, তবে কাব্যসম্বন্ধে দীর্ঘকালের অধীত বিদ্যাকে সমন্বয় করে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতন রূপ দিয়েছেন। কোল্‌রিজ ও ইয়েট্‌সের মতো কল্পনাকেই কবির প্রধান শর্ত ধরেছেন, কিন্তু এই কল্পনা বুদ্ধি ও চিন্তাকে পরিহার করেন নি এবং এই সঙ্গে এলিঅটের মতো ঐতিহ্যকে একান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঐতিহ্য চিন্তা বুদ্ধি অভিজ্ঞাতার কল্পনার সাহায্যেই অলৌকিক আভায় আলোকিত হয়ে ওঠে। সুতরাং কল্পনাই নিয়ন্ত্রী। কিন্তু এই কল্পনার সঙ্গে জীবন এবং জীবনসম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও তত্ত্ব বর্জিত হয় নি, বরং গভীরভাবে স্বীকৃত হয়েছে, বিজ্ঞান কবিতাকে বাধা দেয় নি, বরং সাম্প্রতিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে আরো তীব্র করে, এখানেই মালার্মে ভালেরির সঙ্গে প্রভেদ, কিন্তু জীবনানন্দ বিশুদ্ধ কবিতাকেই শ্রেয় বলে গণ্য করেছেন। সমস্ত বস্তু অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনাপ্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি আনবে, কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে ভাবপ্রতিভাকে শুদ্ধ করতে হবে, তার ফলেই নূতন জীবনদর্শন গড়ে উঠবে এবং যুগের সঙ্গে ভাষা যুক্তি ও হৃদয়ের সংস্কার ও নতুন সঙ্গতির প্রয়োজন রয়েছে, এগুলির যোগফলই সার্থক কবিতার জন্ম দেবে, এবং তার মহৎ কবিতা সৃষ্টি হবে জ্ঞানের গভীরতায় ও প্রকৃত জীবনের সমন্বয়ে। কাব্য এ জগৎ থেকে নতুন আলোক দেয় বটে, তবু কাব্যের জগতে মানবিক জীবনই বিশেষ সক্রিয়। জীবনানন্দ জ্ঞানকে বদ্ধিকে কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে প্রাধান্য দেন নি ঠিকই, কিন্তু কবির চিত্তকে দীর্ঘকালের দেশের ও বিদেশের কাব্যচেতনার সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। যারা 'নিজের অল্প অভিজ্ঞতার পটে কমবেশি গভীরতা ফলিত হয়েছে', অভিজ্ঞতা বাড়াতে গেলে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বার সম্ভাবনার কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে যেন নিন্দাই করেছেন। জীবনানন্দ বিশুদ্ধ কবিতাকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার পবিসর ইয়েট্‌সের চেয়েও প্রসারিত করেছেন।

জীবনানন্দ দিব্য প্রেরণাকে স্বীকাব করেছেন। উপরোক্ত অভিজ্ঞতা ও বস্তু উপাদান কবির অন্তঃকরণে দিব্যতার সাহায্যেই একটি শৃঙ্খলা লাভ করে, প্রেরণার সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলেছেন, কবি-মানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান

অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিকভাবে বোঝবার সুযোগ করে দেয় এই প্রেরণা। এই প্রেরণাবশেই কবির অন্তঃকরণে পরিতৃপ্তি আসে, পরিতৃপ্ত করে-লেখা কবিতা একমাত্র ভালোবাসা ও দায়িত্বের জিনিশ। ইয়েটস্-উক্ত ব্যক্তিত্ব চেতনা তাঁর কাব্যের মতো কাব্যতত্ত্বেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভারাক্রান্ত হলে বা দিব্যতা এলেই বিষয়টা জীবনানন্দের কাছে অনুভূত হয়, তারপর তার রূপ আসে। রূপ ও বিষয়ের ব্যাপারে বিষয়ের অনুভূতিটা প্রথমে এসেছে। এই অন্তঃপ্রেরণার বশে অনুভূতিকে রূপে প্রকাশ করবার জন্যে ভালেরির মতো গাণিতিক অনুশীলন কামনা করেছেন। কবিতাটিকে স্পষ্ট প্রকৃতিস্থ ও দৃষ্টিলোকী করবার জন্যে অনুশীলনের সময় লাগে। 'চারিদকার প্রতিবেশ চেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে, কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায় পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে,' প্রেরণাকে স্বীকার করে ভালেরি ও এলিঅটের বিরুদ্ধে গেছেন, অনুশীলনের ব্যাপারে আবার তাঁদেরই একান্ত গ্রহণ করেছেন। জীবনানন্দের কাব্যচেতনায় আধুনিক কবিদের মতোই কালচেতনা বিশেষভাবে বিধৃত হয়ে আছে। লিরিক কবির ক্ষেত্রে সময়ধ্যান প্রকৃতি ও সমাজ একাত্ম হয়ে থাকে জীবনানন্দের বিচারে, আর জীবনানন্দ নিজে স্বীকার করেছেন তাঁর মধ্যে সময়চেতনা অপরিহার্য সত্যের মতো নূতনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে : 'মহাবিশ্বলোকের ঈশারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সংগতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো', সময় ও পৃথিবীকে অভিজ্ঞতার আধার করে কবি এক নূতন মাত্রাচেতনায় ও মনোমৈত্রীর মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করেন। কবি লোকশিক্ষা দেন না, কোনো সংকল্প কাব্যে প্রকাশ করেন না, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ও কল্পনার প্রতিভার সাহায্যে যে-কোনো সত্যে বিশ্বাসী একজন কবির কাব্যে মাত্রাচেতনা সমাজকে ভেঙে গড়ে সুসীম আনন্দের দিকে ইঙ্গিত নিয়ে যায়। সুতরাং, কবিকে যে-কোনো সত্যে বিশ্বাসী হতে হবে এবং ইয়েট্‌সের মতোই বলেছেন যে কাব্যকে কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সন্তান। কাব্যসৃষ্টির পরিণাম মাত্রাচেতনা ও সুসীম আনন্দ, এটা এসে থাকে অভিজ্ঞতাব গাঢ় বিশ্বাস থেকে। এই বিশ্বাস আধুনিক অনেক কবিদের মধ্যে দেখতে পাননি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এলিঅটের প্রথম যুগের কাব্যের সঙ্গে জীবনানন্দের বিরোধও এইখানে, যেখানে জীবনানন্দ ইয়েট্‌স্ ও রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন। কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষা ও ছন্দও আধুনিক অভিজ্ঞতার দোসর। এ-প্রসঙ্গে বলেছেন . 'কবি যখন ভারাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ; কোন্ ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময়।'

জীবনানন্দ প্রতিভার একদেশদর্শিতা স্বীকার করেছেন, যিনি কবি তিনি কবিতাতেই শুধু সিদ্ধি লাভ করবেন, অন্য বিষয়ে যাবেন না, এইটেই হবে তাঁর সততার পরিচয়। কিন্তু কবিচেতনার বিশেষ গণ্ডিবদ্ধ রূপ স্বীকার করেন নি, তাই চেতনাবাদী এলিঅটকে এবং নিশ্চেতনবাদী সুররেয়ালিস্টদের একই সঙ্গে নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় কবিতার সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে বলেছেন : 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু একধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিশ, শুদ্ধ কল্পনা বা

একান্ত বুদ্ধির রস নয়।' লক্ষণীয় হলো, বিশেষ সব অভিজ্ঞতার ও চেতনার জিনিশ, অভিজ্ঞতার মধ্যে সাম্প্রতিক চলমানতার প্রবাহ রয়েছে, হ্যামিল্টনের ভাষায় এই চলমানতাই সমস্ত জ্ঞানের গভীরে অন্তর্গূঢ় হলে চেতনার পরিণতি লাভ করে। সুতরাং এই বস্তুকে স্বীকার করে নিলে বিশেষ এক ধরনের কাব্যের প্রতি আনুগত্য কবির থাকতেই হবে, এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে ইতিহাসের কালের পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিহাস ও কালচেতনায় ও অভিজ্ঞতায় নবীভূত সারবত্তা গ্রহণে কাব্যশিল্পে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় একথা সংক্ষেপে বলেছেন : 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য, কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ...।' অনুভূতির এই সামগ্রিকতা ছিলো বলেই জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর কালে শ্রেষ্ঠ কবি।

পাঠক ও সমালোচক হিশাবে জীবনানন্দ যে-রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা-ও বিশেষ উল্লেখ্য। এলিঅটকে অংশত স্বীকার করেছেন, বরং বুদ্ধির জন্যে নিন্দা করেছেন বেশি, ইয়েট্স্ ও রবীন্দ্রনাথকে ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন। কোল্রিজের প্রতি শ্রদ্ধা কোলরিজের 'ইমাজিনেশন থিওরি'র প্রতি ঋণকেই স্বীকার করায়, ব্লেকের ও রোম্যান্টিক্দের দিব্যপ্রেরণা গভীরভাবে স্বীকার করেছেন, কোল্রিজকে স্বীকার করে, বাক্রীতিতে বিশেষ সংকল্পের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকেই সমালোচনা করেছেন; কবিতাকে স্বকীয় করে তোলবার জন্যে বিশুদ্ধ কবিতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং ফর্মের প্রতি অনুশীলন তাঁর কাব্যচেতনাকে মালার্মে ও ভালেরির প্রতি নিয়ে গেছে, আবার সমস্ত অনুভূতির ও তথ্যকে গ্রহণের ভেতরে শেলি ও এলিঅটের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবিতায় যেমন দেশবিদেশের দীর্ঘ ঐতিহ্যস্বীকৃতির কথা জানিয়েছেন, তেমনি সমালোচকের কাছেও সেই দাবি জানিয়েছেন, ইয়েট্সের মতো প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করতে চেয়েছেন, দেশবিদেশের আধুনিক কবিতাবিচারে কবিতার বিশুদ্ধ রূপ ও চিরন্তন পদার্থই দাবি করেছেন, যার জন্যে উৎকট আধুনিকদের মতো রবীন্দ্রবিরোধী হন নি। আধুনিক কাব্যবিচারে যেমন অডেনবিরোধী কথা বলেছেন, তেমনি একনায়কত্বের কথা বাদ দিয়ে সম্মিলিত যগপ্রতিভার কথা বলেছেন দেশেবিদেশে। তাঁর নিজের ও আধুনিক কাব্যবিচারে খণ্ড খণ্ড প্রতিভার কথাই স্বীকার করেছেন। বিশুদ্ধ কবিতার পরিবর্তে যেখানে অডেনের 'স্মরণীয় বচনে'র তীব্রতা দেখেছেন, যেমন করে সমর সেন সুভাষের মধ্যে ও রাশিয়ার কাব্যে, সেখানেই তীব্র নিন্দা করেছেন, সাহিত্যের শাশ্বত বস্তু নেই, কিন্তু মানুষের মনের চিরপদার্থ সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে দেখলেই রবীন্দ্রনাথের মতো তাকে চিরকালের আধুনিক আখ্যা দিতে চেয়েছেন তিনি। যদিও জীবনানন্দ খণ্ড কবিতায় সিদ্ধি লাভ করেছেন, তথাপি তাঁর আকাঙ্ক্ষা মহৎ কবিতার ব্যাপকতায়। তাই স্বকালের বিরোধিতা অস্বীকার করে, কবিস্বভাবের সততা ও শিক্ষার প্রতি জোর দিয়ে কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যালোচনায় নিযুক্ত

হতে কবিসমালোচকদের নির্দেশ দিয়েছেন। কবিরাই কবিদের একমাত্র আলোচনা করতে পারে। অকবি তীক্ষ্ণ সমালোচক নয়। এলিঅট প্রতিধ্বনিত এখানে।

জীবনানন্দ সৎ কবি বলে কাব্যের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ড ও কালের দিগন্তবিস্তৃতির কথা সত্য বলেই গভীরভাবে অনুভব করেছেন। তবু কবিতাপাঠ কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠকের অভিজ্ঞতার সহযোগে 'আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মতো, সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ' লাভ করতে চেয়েছেন জীবনানন্দ; 'অসঙ্গতির জট খসিয়ে সুসীম আনন্দের দিকে' যেতে চেয়েছেন সর্বদা। সমালোচনায় কবি ও পাঠকের অভিজ্ঞতা মেলাতে চেয়েছেন। জীবনানন্দের কাব্যালোচনা তাঁর কাব্যপাঠে অনুভূতিকে আরো গভীরতর করে। উল্লেখযোগ্য হলো, তাঁর প্রবন্ধ সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর মতো বুদ্ধির বিশুদ্ধতা নয়, অনুভূতির সত্যে গাঢ়, তাই কাব্যের সত্যের সঙ্গে একান্ত ও তাঁর কাব্যপাঠের সহায়ক।

জীবনানন্দের কবিতা ঃ 'রাত্রি'

জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতাটি 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) কাব্যের অন্তর্গত।

'সাতটি তারার তিমির' এই শব্দগুচ্ছে মালার্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ সাতটি তারা মিলে সপ্তর্ষি হয়। সপ্তর্ষির তারার উজ্জ্বলতার পাশেই অন্ধকার। এই অন্ধকার বা তামস রাত্রিকেই কবি 'রাত্রি' কবিতায় শহরের নিশীথের পটভূমিকায় চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনানন্দ যেমন প্রকৃতির ও নির্জনতার কবি, প্রকৃতির মধ্যে আবহমান কালের বাঙালি চেতনাকে প্রকাশ করেছেন রোম্যান্টিক অনুভবে। কখনও-বা ইয়েট্সের অনুসরণে, তেমনি তিনি নাগরিক কবিও বটে। শহরজীবনের কলুষ পাপ, অপরাধ, মানুষের অন্তরের বীভৎসতা অর্থনৈতিক জীবনের শোষণ, সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব, এবং আধুনিক মানুষের আত্মিক বিরোধ—এ সবই নগরজীবনের প্রভাব, যা আমরা বোদ্‌লেয়রের কবিতার মধ্যে দেখতে পাই, এই নাগরিক মনস্কতা প্রখরভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যে বোদ্‌লেয়ার থেকেই শুরু। এই শহরকে বোদ্‌লেয়রের মনে হয়েছিলো অবাস্তব। এবং তাকে অনুসরণ করে এলিঅটও তাঁর 'পড়ো জমি'-কাব্যে পৃথিবীর সমস্ত শহরকে বলেছেন Unreal city. বোদ্‌লেয়র থেকেই এই অবাস্তব শহরের ধারণা গড়ে উঠেছে : "Fourmillante cité, cité Pleine de de rêves/Ou le spectre en plein jour raccroche le passant" এলিঅটও নগর মনস্কতার কবি। তিনিও 'পড়ো জমি' কাব্যের শেষ অংশে এক জায়গায় বলেছেন, য়ুরোপের সমস্ত বিখ্যাত শহরের স্তম্ভ যেমন ভেঙে পড়ছে, তেমনি সব শহর অবাস্তব।

Falling towers/Jerusalem Athens Alexandria/Vienna London/Unreal.

সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের এই অবাস্তব রূপই জীবনানন্দ 'রাত্রি' কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এবং 'রাত্রি' কবিতার সঙ্গে তাঁর শেষের যুগের আর একটি কবিতার অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। 'অদ্ভুত আঁধার এক।'

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

এবং 'রাত্রি' কবিতাটির সঙ্গে '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটিরই অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সেখানেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন জীবনের ও সমাজের ধ্বংস, ক্ষয়, মানুষের অবমাননা, নিরাশা হতাশায় পুঞ্জীভূত ক্ষুব্ধ জ্বালা, রাগ, দ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ

পেয়েছে এই কারণে তিনি এগুলিকে স্বীকার করতে চান না। তাঁর জীবনের বোধে ছিলো, আলো অন্ন আকাশ নারী। এবং একটি মানুষ এই পৃথিবীতে মৃত্যুর আগে সুস্থির-ভাবে বাস করতে পারে যদি সে আলো অন্ন আকাশ নারীকে পায়। এবং এ-পাওয়া সস্থিরভাবে পাওয়া। এবং এগুলি পাননি বলেই জীবনানন্দের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ জ্বালা ক্লেশ, বক্রোক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

'তাহলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে/কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হতো।'

'রাত্রি' কবিতার পটভূমিকাতেও ('১৯৪৬-৪৭') সালের কবিতার মতো যদ্ধের সময়ের ও তার ধ্বংসের অবক্ষয়ের এবং ভারতবিচ্ছেদের ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার নির্দেশ ও অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে।

'রাত্রি' কবিতার অন্ধকারই জীবনানন্দের জীবনের মূলমন্ত্র নয়। 'সাতটি তারার তিমির' এই শব্দগুলোর মধ্যে যেমন তিমির আছে, তেমনি সাতটি তারাও আছে। এই সাতটি তারার মধ্যে নক্ষত্রলোকের আনন্দ এবং শাশ্বত বোধ আর ইতিহাসচেতনা একই সঙ্গে ব্যক্ত হয়। ঋগ্বেদে বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করেছেন যে রাত্রি এসেছে, এই অন্ধকার রাত্রিকেই ঋণের মতো আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও।

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত/উষ ঋণেব যাতয়। (১০. ১২৭.৭)

সেখানেও বৈদিক ঋষি অন্ধকারকে ঘন চিত্রিত দেখেছেন, গাঢ় তমসাপূর্ণ। এবং অনুভবসিদ্ধ। এই অনুভববিদ্ধ অন্ধকার কবিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। জীবনানন্দ এই রাত্রির অন্ধকারকে অতিক্রম করে উষার আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। এবং আলোই তাঁব মূল কথা। ওই '১৯৪৬-৪৭' কবিতার ভেতরই অন্ধকার থেকে উৎক্রমণের আশা ব্যক্ত করেছেন :

তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো—-তাব হৃদয়ের
ভুলেব পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ র'য়ে গেছে বলে মনে হয়।

আমাদের আলোচ্য কবিতায় 'রাত্রি' অন্ধকারের ও ধ্বংসের অনুভব নিয়ে আসে। অথচ এই রাত্রিকেই কবি সৃষ্টির উৎসরূপে দেখেছেন : 'তাঁর হৃদয়ের ভিতরে/সেই সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পান তিনি', এই সুপক্ক রাত্রি রিল্‌কের নবীন সৃষ্টিরই সম্ভবনা।

'রাত্রি' কবিতায় যুদ্ধকালীন সময়ের নগরের ধ্বংসের রূপ সুস্পষ্ট। প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই আছে : 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;' এ যেন জোলার প্রাকৃতিকতা; হাইড্র্যান্ট এবং কুষ্ঠ রোগী দুইটি শব্দের মধ্যেই অন্ধকার জীবনের ও ধ্বংসের রূপ প্রতিকৃত হয়েছে। এখানে শুদ্ধজল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। হাইড্র্যাণ্ট-এর জল চেটে নেয়; মানুষ যদিও, এ-মানুষ কুষ্ঠ রোগী। অর্থাৎ শহর হাইড্র্যাণ্ট ও কুষ্ঠরোগীতে ভরে গেছে; তাই পরের পঙ্‌ক্তিতেই বলেছেন : 'অথবা সে-হাইড্র্যাণ্ট হয়তো-বা গিয়েছিলো ফেঁসে।' এই ফেঁসে-যাওয়াতে বোঝা যায় হাইড্র্যাণ্ট-এর নোংরা জল সমস্ত রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর পরেই বলেছেন, দপুর রাত শহরে দল বেঁধে নেমে এসেছে। এই দপুর রাত্রের অন্ধকার যেন মানবের

দস্যুদলের মতো। সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে নিতে এসেছে। এর পরের চিত্রকল্প আরও ভয়াবহ: 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে/অস্থির পেট্রল ঝেড়ে'; এই মোটরকার আসলে বুর্জোয়া ও ধনতন্ত্রী, যাদের দয়ামায়া কিছু নেই। তাই গাড়লের মতো তাদের কাশির শব্দ, 'গাড়ল ' শব্দটির মধ্য দিয়েই জীবনানন্দের মনের ক্ষুব্ধ জ্বালা ও দ্বেষ, এই অর্থ-সামাজিক ও সমাজের বিরুদ্ধে , ব্যক্ত হয়েছে। 'গাড়ল' শব্দটি যদিও সংস্কৃত 'গড্ডল' থেকে এসেছে, তথাপি এই শব্দটির মধ্যে কবির দেশীয় অনুষঙ্গ মিলে তাঁর মনের ঘৃণা বিতৃষ্ণা ও গ্লানি অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর অস্থির পেটল ঝেড়ে—এই শব্দগুচ্ছে আধনিক নগরসভ্যতার কলঙ্কময় গ্লানিকেই জীবনানন্দ তুলে ধরেছেন। এই অস্থির পেট্রল প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্যকে নষ্ট করে দেয়। মানষের প্রাণবায়কে দূষিত করে এবং নগরজীবনের মানষের ফস্‌ফসের মাদকতা আনে। এর পরের পঙ্‌ক্তিতে আধনিক জীবনের মানষের মন ও অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন জীবনানন্দ। সেই মৌল অনুভূতি হলো ভয়াবহতা। এ-যুগে মানুষ যুক্তিতে বুদ্ধিতে অর্থে প্রতিপত্তিতে সতর্ক ও নিরাপদ থাকলেও ভয়াবহভাবে জলে পড়ে ডুবে যায়। এই ভয়াবহতাকেই অস্তিত্ববাদীরা dread নাম দিয়েছেন।

এমনিভাবেই শহরের রাত্রিতে চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জীবন ও দৃশ্যকে স্পষ্ট ছবিব মতো ব্যক্ত করেছেন একে একে। হাইড্র্যান্টের জল খাচ্ছে কুষ্ঠ রোগী, আবাব এই হাইড্র্যান্ট ফেঁসে গিয়ে জল উপ্‌চে পড়েছে রাস্তায়। এবং এর পরেই দুপুর রাত দস্যুদলের মতো নেমে এসেছে, এবং এই দস্যুদলের সঙ্গে ধনিদের তুলনা করেছেন মোটরকার-শব্দে। এবং এই ধনিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন গাড়লের। এবং এই গাড়লেরা যেমন কুৎসিত কাশি কেশে সমস্ত সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিয়ে যায়; এই ধনিরা তেমনি কুৎসিত কেশে চলেছে রাত্রির সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিয়ে, আর চারিদিকে পেট্রল ছড়িয়ে; অস্থির; সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট কলুষিত, এরপরই আর একটি ছবি, আবার তিনটি রিক্‌শা শেষ গ্যাসল্যাম্পের দিকে ছুটে মিশে গেলো, এই গ্যাসল্যাম্পের তিনটি রিকশোর কী গভীর যোগ আছে কবি স্পষ্টভাবে বলেন নি। কিন্তু মায়াবীর মতো জাদবলে এই শব্দগুচ্ছে কবি রিকশার আরোহীদের বোঝাতে চেয়েছেন, হয়তো-বা তারা বেশ্যালয়ে যাচ্ছে আর দপর রাতে বিকশাচালকের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে সাধারণ নিঃস্ব শ্রমিকদের অসহায় রূপও ব্যক্ত।

তৃতীয় স্তবকে দেখি আর একটি শব্দ 'হঠকারিতা'। এই হঠকারিতার মধ্যে একালের মানুষের আর এক অসুস্থতা বা গভীর অসুখ। এই আত্মিক অসুস্থতার জন্যেই কবি ফেয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে বেন্টিক স্ট্রিটে গিয়ে পৌঁছে দেখেছেন টেরিটিবাজার। এমনি করে কবি যেন রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত শহর পরিক্রমা করছেন। এবং এই শহরের বাতাস বিশুষ্ক, যে-বিশুষ্কতা চিনেবাদামের খোসায় ধরা পড়ে। তাই কবি বলেছেন; 'চিনেবাদামের মত বিশুষ্ক বাতাসে', এ যেন দান্তের নরকের বর্ণনা, এই বিশুষ্ক বাতাসের মধ্যেই রাত্রির মদির আলোর তাপ কবির গালে চুমু খায়। এবং চারিদিকের সমস্ত পরিবেশ মিলে শহরের রাত্রির জীবন সুস্থির রাখে। এই সুস্থিরতাকে ধনুকের ছিলার সঙ্গে তলনা করেছেন। কবি যুদ্ধকালীন শহরের বর্ণনা এইরূপ :

> কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট. চামড়ার ঘ্রাণ
> ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
> ধনুকের ছিলা রাখে টান।

এই কবিতায় চিত্রকল্পব্যবহারে জীবনানন্দ অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, একদিক থেকে নোংরা জীবন ও ধ্বংসকে প্রকাশ করবার জন্যে কবি যেমন অতিস্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি ন্যাচ্‌র্যালিজম্‌-এর পরপারে সুর্‌রেয়িলজম্‌-এর প্রভাবে কবির মনের অবচেতন থেকে অদ্ভুত ও স্বাধীন ছবি তুলে ধরেছেন। এবং সেই ছবির মধ্য দিয়ে বাস্তব-অবাস্তব দুই মিশে গেছে। এবং পরাবাস্তব প্রধান হয়ে উঠেছে : 'তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে মায়াবীর মতো জাদুবলে।'

কবিতার উত্তম পুরুষ এমনিভাবে শহরের বিভিন্ন রাস্তা হেঁটে মাইলের পর মাইল চলেছে রাত্রিবেলা। সেইসঙ্গে রাত্রিতে মাইলের পর মাইল পথ হাঁটার মধ্যে তার হঠকারিতাই প্রকাশ পেয়েছে। ফিয়ার লেন বেন্টিক স্ট্রিট টেরিটিবাজার সমস্ত পথ উত্তম পরুষ হেঁটেছে এবং এর পরেই দান্তের ইন্‌ফের্নোর মতোই একটি উপমা ব্যবহার করেছেন;—'চিনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে'—এই উপমাটির মধ্যেই 'রাত্রি' কবিতার মূলসুর স্পষ্ট। অর্থাৎ জীবন চিনেবাদামের মতো বিশুষ্ক, এখানে বাতাসও নিস্তেজ, শুকনো।

এর পরেই বিশুষ্ক বাতাসময় রাত্রিতে আলোর রূপ বর্ণনা করেছেন কবি। এই আলো মদের মতো অর্থাৎ কামনাময়। এই মদের আলোর তাপ উত্তম পুরুষকে গালে চুমু খায়। এই আলো ছড়িয়ে পড়ে কেরোসিন-কাঠ, গালা, গুনচট ও চামড়ার ওপর। এরই মধ্যে কাঁচা চামড়ার গন্ধ আর যন্ত্রসভ্যতার ডায়নামোর গুঞ্জন একসঙ্গে মিশে গেছে, কাঁচা চামড়ার গন্ধ বর্বরতার ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে ও ডায়নামোর মধ্যেও যন্ত্রসভ্যতা প্রতীকিত। তাই, একই উপায়ে জীবনানন্দ অদিম যুগের বর্বরতা ও যন্ত্রসভ্যতাকে একসঙ্গে মিলিয়েছেন এবং এই দুইয়ের যোগে যুদ্ধের সময়কার ইতিহাস প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ধনুকের ছিলা যেমন টান না রাখলে তীর ছোঁড়া যায় না, তেমনি এই বর্বরতা ও যন্ত্রসভ্যতা দুইয়ে মিলেই জীবনের ধারা বয়ে চলেছে।

তাই, পরের স্তবকে বলেছেন : 'টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে' অর্থাৎ অতীত সভ্যতা ও বর্তমান সভ্যতা ও সেইসঙ্গে বর্তমান জীবন। এরপরই উপনিষদের মৈত্রেয়ীর উল্লেখ করেছেন, এই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যাতে অমৃত ও ভূমা নেই তা নিয়ে আমি কী করব : সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং

তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্‌ বেদ তদেব ব্রূহীতি। বৃহদারণ্যক— ২.৪.৩

পরের পঙ্‌ক্তিতে হুন সম্রাট আত্তিলার উল্লেখ করেছেন। এই আত্তিলা য়ুরোপ আক্রমণ করেছিলেন এবং রোমানদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এখানে হুনদের বর্বরতা এবং উপনিষদের মৈত্রেয়ীর বাণী দুই বিরোধকে একসূত্রে বেঁধেছেন জীবনানন্দ।

কিন্তু এই বিরোধের মধ্যেও কবি ইহুদি অর্থাৎ ইসরাইলবাসী যিশু খ্রিস্টের গান—প্রেমের বাণী ও গান শুনতে পান এবং এই গান ওপরের জানালা থেকে অর্থাৎ উর্ধ্বলোক থেকে ভেসে আসে, কিন্তু বাইবেলে যিশুর প্রেমের গান আজকে আর কেউ শোনে না—তাই পিতৃলোক হেসে ওঠে এবং সোনা, তেল, কাগজের খনির সঙ্গে মিশে যায়।

এইসঙ্গে যুদ্ধকালীন কলকাতার রাত্রির পরিচয় দিতে গিয়ে বাইবেলের বিরোধী চিত্র এঁকেছেন জীবনানন্দ। ফিরিঙ্গি যুবকেরা—যারা য়ুরোপিয়দের জারজ সন্তান—তারা মদ ও মেয়েমানুষের জন্যেই রাত্রির আধো আলো, ছিমছাম হেঁটে চলে যায়। এই ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকদের পাশেই একটি লোল নিগ্রোর বর্ণনা দিয়েছেন কবি। এখানেও বিরোধ ও

নিগ্রোর হাসির মধ্যে দিয়ে ফিরিঙিদের উল্লেখে কবি আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করেছেন তীব্র। এই নিগ্রোর হাতে আফ্রিকা-দেশের ব্রায়ার পাইপ, সেই পাইপ পরিষ্কার করে, এই বুড়ো নিগ্রো এখনও হয়তো অতীতকালের বিশ্বাসকে মনে স্থান দেয়; কিন্তু বিশ্বাস মনে স্থান দিলেও তার চেহারা গোরিলার মতো। সুতরাং তার মূল বর্তমান জগতে জান্তব।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই কবিতার মধ্যে কবি জীবনানন্দ দক্ষতার সঙ্গে যেমন উপনিষদের উল্লেখ ও অনুষঙ্গ জাগিয়েছেন, তেমনি বর্বর হূন সম্রাট আত্তিলার উল্লেখ করে বর্বর সভ্যতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আবার ইহুদি রমণীর উল্লেখে বাইবেলে যিশুর প্রেমের বাণী যেমন আছে, তেমনি হিন্দুর বিশ্বাসে পিতৃলোকেও কথা বলেছেন, আবার ফিরিঙি যুবকের সঙ্গে নিগ্রোর বিরোধ সৃষ্টি করে। ব্রায়ার পাইপের সঙ্গে গোরিলা অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতা ও আদিম বর্বর সভ্যতা একসঙ্গে মিশে যায়।

এই লোল নিগ্রোর কাছেই যুদ্ধকালীন কলকাতার রাত্রিকে মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গল। লিবিয়ার জঙ্গলের মতো মনে হলেও সেই আদিম বর্বর যুগের সরলতা ও সহজতা নেই। তারা আগের মতো উলঙ্গ নয়, সভ্যতার স্পর্শে, লজ্জায় কাপড় পরে এবং নিয়মিতভাবে আর্থিক লোভে একটা নিয়মকে মেনে চলে। সুতরাং আদিম বর্বর যুগের থেকে ও বর্তমান যুগের মানুষগুলি শুধু জন্তু হয়নি; সেই জন্তুর স্বরূপ আরো ভয়ংকর, তাই কবির নিগ্রোর চোখে-দেখা আফ্রিকার জঙ্গল ও কলকাতার যুদ্ধকালীন রাত্রির তুলনা অদ্ভুতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতায় আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁর ঘৃণা ও বিদ্রূপ এতো তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে যা তাঁর অন্য কোনো কবিতায় এরকম দেখা যায় না। যদিও এই অবক্ষয় ও ধ্বংস থেকে পরবর্তীকালে তিনি নতুন বিশ্বাসে উন্নীত হয়েছিলেন।

জীবনানন্দের কবিতা ঃ 'বোধ'

জীবনানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন ঃ 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী। সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট।'

জীবনানন্দের কথাতেই বলা যায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র (১৯৩৩) অন্তর্গত 'বোধ' কবিতাটি নিশ্চেতনার, এই নিশ্চেতনা বলতে ফ্রয়েড যাকে unconsciousness বলেছেন, তারই কথা। অর্থাৎ চেতন, অবচেতন মনের আরও গভীরে এই চেতনা নিহিত থাকে, এই 'বোধ' নিশ্চেতনা থেকে গড়ে উঠেছে যাকে বাইরে কোনো বস্তু দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায় না। এবং এই বোধেরই সার্থক রূপ প্রকাশ করেছেন 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) কাব্যের অন্তর্গত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। সেখানে এই 'বোধে'র পরিচয় দিয়েছেন : 'নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;/অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়।' এই বিপন্ন বিস্ময়ই 'বোধ', একদিকে বিপন্ন অর্থাৎ dread, অন্যদিকে এই dread-অবলম্বনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে-যাওয়া, তাই-ই বিস্ময়। এবং এই 'বোধ' চৈতন্যের মধ্যে কাজ করলে চৈতন্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সার্ত্রে anguish বা ennuie-সম্বন্ধে বলেছেন : 'The reflective apprehension of the self, as freedom, the realization that a nothingness, slips in between myself and my past and my future.' এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সত্তার মধ্যে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে শূন্যতা প্রবেশ করে। এই শূন্যতাই চেতনাকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয় এবং এই দ্বিধাবিভক্ত চৈতন্যের রূপই একালের কবিতার আধুনিকতার স্বরূপ। এলিঅটও পিকাসোর ছবির আধুনিকতা বিশ্লেষণে উদ্ধৃতি দেন : 'fearful progress of self-consciousness' অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের মধ্যে ভয় এবং অগ্রগতি—এই দু'টোই কাজ করে। এদিক থেকে 'বোধ' কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ শতাব্দীর গোড়ায় এই বাঙালির সমাজ, জীবন ও চৈতন্যের দীর্ণতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং এই দিক থেকে 'বোধ' কবিতাটির শুধু জীবনানন্দের নয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিস্থানীয়।

'বোধ' কবিতায় প্রথমেই দিন-রাত্রি, অর্থাৎ আলো-অন্ধকারের কথা বলেছেন। এই দিন-রাত্রি মাথার ভেতরে ও হৃদয়ের ভেতরে সক্রিয়; বোধের জন্যে সমস্ত কাজ তুচ্ছ হয়ে যায়, সমগ্র চিন্তা পণ্ড মনে হয়, প্রার্থনা অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস শূন্য মনে হয়, এই বোধের তাড়না থেকে মানুষ মুক্তি পায় না। তাই কবি বলেন :

'আমি তারে পারি না এড়াতে', যে-মানুষ এই বোধের দ্বারা তাড়িত, সে সহজ লোকের মতো চলতে বা ভাষাব্যবহার করতে পারে না। সহজ লোকের মতো নিশ্চেতনার বোধ তার থাকে না এবং শরীরের বোধ ও প্রাণের আহ্লাদ, এই বোধতাড়িত মানুষের জ্ঞান থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। মাটি-জল-বায়ুর সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না। যে-কোনো

উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত হতে পারে না। চাষিরা যেমন শরীরের মাটির গন্ধ মেখে, জলের গন্ধ মেখে, উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে প্রাণে উল্লসিত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, জীবনবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন লোকের পক্ষে এই উপলব্ধি অসম্ভব; চাষি সহজলোকের প্রতীক; সে পৃথিবীর সঙ্গে জল, বায়ু, মাটির সঙ্গে একাত্ম। কিন্তু এ-যুগের মানুষ তার চৈতন্যের মধ্যে তার শূন্যতাকে নিয়েছে বলে তার একাত্মতা হারিয়েছে। তাই স্বপ্ন, শান্তি ভালোবাসা তার জীবনে মূল্যহীন। এবং এগুলির সঙ্গে বোধের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বোধ যার মধ্যে কাজ করে সে বিভ্রান্ত, ভূতের অর্থাৎ অতীতের দ্বারা তাড়িত। তাকে উপেক্ষা করলেও দূর করতে পারা যায় না। মাথার চারপাশে, চোখের চারপাশে, বুকের চারপাশে, নিছক ঘুরতে থাকে অর্থাৎ চেতনা চক্ষু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ময় সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন করে থাকে। কবি বলছেন : 'মড়ার খুলির মতো ধরে/আছাড় মারিতে চাই।' এই মড়ার খুলি অর্থাৎ অতীত তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এরপরই কবির প্রশ্ন : এই বোধ এভাবে যুগের মানুষকে কেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কেন তাকে আলাদা করে, কেন তাকে একাকী করে, সে কি নিজেরই মুদ্রাদোষে বা স্বভাবের জন্যে। এর উত্তর দিয়েছেন : আত্মসচেতন আধুনিক মানুষ এ পৃথিবীতে জৈব নিয়মে শুধু বেঁচে থাকতে পারে না—নির্বোধের মতো। অধিকাংশ সাধারণ মানুষই জন্ম নেয়, জন্ম দেয়, আবার মারা যায়। এবং এই সমস্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মসচেতন আধুনিক মানুষের প্রভেদ বিস্তর, তাই সে একাকী, নিঃসঙ্গ। প্রশ্নের মধ্য দিয়েই জীবনানন্দ উত্তর দেন :

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?
—তবু কেন এমন একাকী?

অর্থাৎ এদের মতো আধুনিক মানুষ নয়।

এর পরেই পূর্বের সাধারণ মানুষের জীবন বর্ণনা করেছেন। আধুনিক যুগের আগে সাধারণ মানুষ চাষির মতো লাঙল চালাতো, বালতিতে জল টানতো, কাস্তে হাতে ফসল কাটতো, মেছোদের মতো নদী থেকে মাছ তুলতো, মাছ তুলতে গিয়ে পুকুরে পানা-শ্যাওলা গায়ে মেখে পৃথিবীর গায়ের ঘ্রাণ পেতো—এসবই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বাদ। তখনকার জীবন ছিলো বাতাসের মতো অবাধ, নক্ষত্রের নীচে স্বাভাবিকভাবে ঘমোতে পারতো। জীবনকে অবাধ ও অগাধ বলে মেনেছে তারা। কিন্তু এখনকার মানুষ এই সাধারণ বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন . 'চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;' এখন ভালোবাসার রমণী মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। এই মেয়েমানুষকে ভালোবেসে, অবহেলা করে, ঘৃণা করে, একাত্ম না হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এবং এই মেয়েমানুষ বা নারীও তাকে উপেক্ষা করেছে, ঘৃণা করেছে, অথচ ভালোবাসার সাধনা ছিলো আকাশের দূর নক্ষত্রের, কিন্তু এই দূর নক্ষত্রগ্রহের চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। নারীর উপেক্ষার ভাষা, ঘৃণা, অবজ্ঞা অবহেলা করেও এ যগের মানষ ভালোবাসা পায় নি :

আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি; যে-নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ

আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা

এ-কারণেই একালের ভালোবাসা ইয়েট্সের মতো ধুলো আর কাদা বলে (The fury and the mire of human veins. — Byzantium) প্রতিপন্ন হয়।

এর পরের অংশেই দেখি এই বোধের জন্যে মানুষ, দেবতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে। সে ঘুমোতে পারে না। শুয়ে থাকবার আনন্দ নেই ; সে মানুষ, মানুষীর, শিশুদের মুখ দেখতে পায় না অর্থাৎ তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। কারণ, নিরন্তর এই বোধ তার সমগ্র চেতনাকে শূন্যতা দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। অথচ এই আধুনিক মানষের আকাঙ্ক্ষা আকাশের নক্ষত্রের পথে :

পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?

এবং এই বোধের জন্যে একালের মানুষ চোখে কালোশিরার অসুখে ভোগে, কানে বধিরতা আসে। মাংসে গলগণ্ড ফলে এবং হৃদয়ে নষ্ট শসা ও পচা চালকুমড়োর মতো হয়ে ওঠে। এই অবক্ষয়, এই ধ্বংস, এই নৈরাশ্য আসে এই বোধ বা dread থেকে। জীবনানন্দ বাংলাকবিতায় প্রথম এই চেতনাকে চিত্রিত ও কাব্যময় করে তুলেছেন। এখানেই আধুনিক কবিতায় জীবনানন্দের কৃতিত্ব।

তিনি নির্জনতার প্রকৃতির ও রোম্যান্টিক কবি হলেও এই বোধের উপলব্ধিই তাঁকে বিশ্বের আধুনিক কবিদের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতার প্রথম পর্ব

কোনো কবিই মৌলিক নয়, মৌলিক হলে ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ থাকে না। আর কবিতা মানবসন্তানের মতোই বংশপরম্পরায় এগিয়ে চলে, এমনকি আন্তর্জাতিক বিবাহও এই নিয়ম থেকে মুক্তি পায় না। জীবনানন্দের কবিতায় প্রথম পর্বেও এই সূত্র আমরা প্রয়োগ করতে পারি অনায়াসে।

কবিতাগুলির ভাষাছন্দেচিত্রকল্পে নিশ্চয়ই সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছেন। বাংলা ১৩৩৪ সাল, ইংরেজি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়। সে-যুগে সত্যেন্দ্রনাথ ও বিশেষ করে নজরুলই জনপ্রিয়, বোধ্য; সমসাময়িক ঘটনা কেন্দ্র করে লেখায় পরিচিত কবি কবিতার কোন্ মর্মমূলে নিয়ে যায়, এ-দুজনের কবিতা পড়ে তা বোঝা যায় না, মনে হয় একটা আলোড়ন চলছে। কিন্তু জীবনানন্দ যদিও এঁদের ভাষা ব্যবহার করেছেন, ছন্দ নিয়েছেন, তবু কবিতা যে-নির্জনতার ধ্যান, নীরবতার প্রশান্তির মধ্যে আমাদের মগ্ন করে দেয়, 'ঝরা পালকে'র অনেক কবিতায় তা প্রকট। নামকরণের মধ্যেই যুগের হতাশার সঙ্গে নিজের ব্যর্থতা ও নিঃসঙ্গতা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, পাখি নেই, পড়ে আছে তার ঝরা পালক। ঝরা পালকের মধ্যে পাখির জন্যে, স্বপ্নের ও জীবনের জন্যে গোমরানো ব্যথা, আর পড়ে-থাকা ঝরা পালকেব মধ্যে স্মৃতি উত্তেজী বেদনা ও হতাশা একই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই বাস্তব এবং বাস্তব-অতিক্রান্ত বেদনার কান্না নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে পরের ভাষায়, পরবর্তীকালে তিনি ভাঙা-পয়ারকেই একমাত্র ছন্দ বলে গণ্য করেছেন, তার মধ্যেই তাঁর মক্তি অনুসন্ধান করেছেন। ফলে মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দের কারুকার্য পরে অক্ষরবৃত্তের মধ্যে কাজে লাগিয়েছেন সঙ্কোচন ও প্রসারণে। কথ্য ভাষার সঙ্গে দেশি-বিদেশি শব্দের প্রয়োগও এখান থেকে।

কিন্তু জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য এখানে নয়, তাঁর বিশিষ্টতা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের চেতনায়, ঝরে-যাওয়া হৃদয়ের কান্নায়, অস্তিত্বের বিপন্ন সঙ্কটে, নিসর্গপ্রীতিতে, রোম্যান্সসুলভ অতীতচারিতায়, এই দুটি তাঁকে বেঁচে থাকতে প্রেরণা দিয়েছে। 'পিরামিড' কবিতাটি এদিক থেকে নানা কারণে স্মরণীয়। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতার অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে, পথিক অনন্ত যাত্রায় কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার স্মৃতি বুকে নিয়ে তাজমহল স্থবির দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিরামিড এ-যুগে কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু মৃত 'পিবামিড' এখনো পড়ে আছে তার স্মৃতি নিয়ে। কবিতাটি যদি এখানেই শেষ হতো, তাহলে জীবনানন্দের কবিতা কোনো সার্থকতা নিয়ে আসতো না। রবীন্দ্রবিরোধ কবিতার প্রথমেই সূচিত : 'ধূম্র মৌন সাঁঝে/নিত্য নব দিবসের মৃত্যু ঘণ্টা বাজে,' এই দিবসের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই পিরামিডের মৃত রূপ স্পষ্ট। এই রূপকেই কবি দেখাচ্ছেন, যা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন দেখেন নি। এই রূপ আরো প্রকট হয়ে উঠলা পরের চরণে :

শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে;
পান্থ ম্লান চিতার কবলে
একে-একে ডুবে যায় দেশ জাতি, সংসার সমাজ;
কার লাগি, হে সমাধি, তুমি একা বসে আছ আজ—
কী এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন!

'পিরামিড' এখানে মৃত অতীত। কিন্তু জীবনানন্দ ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে এই মৃতের অন্তরে প্রাণের সঞ্চার এনে দিতে চাইছেন, জিজ্ঞাসা করছেন প্রিয়তমার বক্ষের ওপরে জীবনচেতনার জন্যেই কি পিরামিডরূপী পুরুষ শবসাধনা করছে তান্ত্রিকের মতো। (জানিনা, এই তান্ত্রিক চিত্রকল্পনা মোহিতলালের কাছ থেকে এসেছে কিনা, কিন্তু 'শ্মশান' কবিতায় মোহিতলালের ভাষার অবিকৃত রূপ দেখি : 'কুহেলির হিমশয্যা অপসারি ধীরে/রূপময়ী তন্বী মাধবীরে/ধরণী বরিয়া লয় বারে বারে বারে।') কিন্তু এর পরেই শেষের দিকে বলেছেন নূতন কথা, তিনি স্পষ্ট করে বলেননি মৃত অতীতকে জাগাতে হবে, কিন্তু যে-চিত্র তিনি এঁকেছেন, তাতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। 'নবোৎফুল্ল মাধবীর গান' তাতে অতীতকে বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে দেয়, কিন্তু মাঝে-মাঝে সহসা 'স্মৃতির শ্মশান' অর্থাৎ অতীত আমরা অশ্রুময় আঁখি মেলে গড়ে তুলি, সেখানেই অতীতের সঙ্গে আমাদের যোগ রচিত হয়। যে-মুহূর্তে রচিত হয়, সেই মুহূর্তে আমরা রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন পথিকের আত্মার রূপ থেকে কালের চেতনায় বর্তমান মানসিকতায় অবতরণ কবি :

মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা-ঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি,
অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু—নবোৎফুল্ল মাধবীব গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে ;
অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে!

এই ইতিহাসচেতনাই পরবর্তীকালে 'সাতটি তারার তিমির' 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে। আর একটি জিনিশ লক্ষণীয়, জীবনানন্দ এখানে সকলকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা আমরা যতো দ্রুত গতিতে পড়ে শব্দের মহিমা এড়িয়ে যেতে পারি, জীবনানন্দের প্রথম যুগের কবিতার মধ্যেও আমরা তা পারিনা। তাঁর কবিতা ধীর, প্রতিটি শব্দ বুঝে, চিত্রকল্পের ও ছবির ব্যবহার উপলব্ধি করে, ধ্বনি ও সুরের সমন্বয় দেখে একটি সিদ্ধান্তে আসি। এবং একটা ঐক্যে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্তি পায়।

'সিন্ধু' কবিতায় পরবর্তী জীবনানন্দই স্পষ্টস্বরে নিজের বেদনার কথা বক্তব্যের আকারে বলেছেন। আব এ 'সিন্ধু' রবীন্দ্রনাথের সিন্ধু (সমুদ্রে প্রতি) নয় বিশ্ব-উল্লাসে :

ক্ষুরধার আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া চিতা
গড়ি তবু বার বার—বার-বার ধুতুরার তিতা
নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়া।
মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়—ঝরা পাতা, পুবালির হা হা!

এই রিক্ত হাহাকার 'আ'-কার ধ্বনিতে যেন অন্ধকার ব্যাপ্তির বিশালতায় আমাদের হারিয়ে দেয়। এর পরেই আছে :

'কাঁদে বুকে মরা নদী, শীতের কুয়াশা!'

এই মরা নদী ও শীতের কুয়াশারই তো কবি জীবনানন্দ! অতীতের জীবনের কথা স্মরণ করে এই জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী রচনা করেছেন তিনি :

আমার হৃদয়পীঠে মোর ভগবান
বেদনার পিরামিড্ পাহাড়প্রমাণ
গেঁথে গেছে গরলের পাত্র চুমুকিয়া;

এযেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই কথা :

পূজা—থালা হাতে ল'য়ে আসিয়াছে কত পান্থ, কত পথবালা
সহর্ষে সমুদ্রতীরে;

কিন্তু জীবনানন্দ? বুকে যার বিষমাখা শায়কের জ্বালা

সে শুধু এসেছে বন্ধু চুপে চুপে একা।
অন্ধকারে একবার দুজনার দেখা।

কিন্তু তবু জীবনের জয়গান কবির চিত্ত থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি :

বৈশাখের বেলাতটে সমুদ্রের স্বর,—
অনন্ত, অভঙ্গ, উষ্ণ, আনন্দসুন্দর!
তারপর, দূর পথে অভিযান বাহি
চলে যাব জীবনের জয়গান গাহি।

এই কাঙ্ক্ষিত আদর্শ জীবন, এবং বাস্তব ও ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই জীবনানন্দের কাব্যের ও তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐক্যশীল পরিণতি গড়ে উঠেছে। এগুলিই তাঁর সমগ্র জীবনে প্রভাবপাত করেছে কমবেশি। তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবনের আদর্শ ছিলো বলেই 'দেশবন্ধু' 'বিবেকানন্দ' 'হিন্দ-মসলমান' 'নিখিল আমার ভাই' জাতীয় কবিতা লিখেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের অনকরণেই নীলিমার আহ্বান করেছেন জগতের সংকীর্ণতা ও জীর্ণতা লুপ্ত করবার জন্যে :

লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে;

কিন্তু জীবনানন্দ এই সুরের কবি নন, তাঁর নির্জনতা তাঁর সংবেদশীলতাকে তীক্ষ্ণ করেছে,

নিখিলের বোন-ভাইয়ের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো মিলবার বাসনা তাঁর অনুকরণের বাসনা। আসলে তীব্র বেদনা তাঁকে শিখিয়েছে : 'কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই।' এই বেদনার সঙ্গে নিখিল আমার ভাই মেলে না। মেলে না চিৎকৃত নজরুলের স্বর : 'সে যে মন্বন্তর,—মৃত্যুর দূত, অপঘাত মহামারী—মানুষ তবু সে, তার চেয়ে বড়—সে যে নারী, সে যে নারী।' মেলে :

ভ্রমরীর মত চুপে সৃজনের ছায়াধূপে ঘুরে মরে মন
আমি নিদালির আঁখি, নেশাখোর চোখের স্বপন!
নিরালায় সুর সাধি,—বাঁধি মোর মানসীর বেণী,
মানুষ দেখেনি মোরে কোনোদিন,—আমারে চেনেনি!

... ...

চেনা চেনা মুখ সবই,—সে যে শুধু সুদূর—অজানা

করবীকুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে আছে চুপে,

সে যেন ঘাসের বুকে, ঝিলমিল শিশিরের জলে;
খুঁজে তারে পাওয়া যাবে এলোমেলো বেদিয়ার দলে, (কবি)

ভ্রমরীর মতোন সৃষ্টির আনন্দমধু পানই জীবনান্দের অভিলাষ, তাঁর নেশাখোর চোখের স্বপ্ন অতীতের রহস্য-ইতিহাসে নিয়ে যায় যেখানে তিনি 'প্রভাঁসে' ঐ বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হন, আসীরীয় সম্রাটের বেশে কুমারীর দিকে চেয়ে থাকেন রাতের নির্জনে, বাংলার মাঠে-ঘাটে ধনুহাতে ঘুরে বেড়ান, ব্যাবিলনে মিশরে ঈসিসের বেদিকার মূলে পথ-চাওয়া দুলালিব সঙ্গে অলস নয়নে চোর চোখে তাকান। (অস্তচাঁদে) এ সবই নিরালায়, মানুষের সঙ্গে নয়, বরং মানুষের কাছ থেকে দূরে, কোনোদিন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, এই নির্জন ও অপরিচিত কবির অন্তরে জেগে ওঠে এই সব বেদনা .

জোনাকির মত সে যে দূরে দূরে যায় উড়ে উড়ে—
আপনার মুখ দেখে ফেবে সে যে নদীর মুকুরে!
জ্বলে' ওঠে আলেয়ার মতো তার লাল আঁখিখানি।
আঁধারে ভাসায় খেয়া সে কোন্ পাষাণী!

জানে না তো কি যে চায়,—কবে হায় কি গেছে হারায়ে!
চোখ বুজে খোঁজে একা, হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে
কারে আহা!—কাঁদে হাহা পুবের বাতাস,
শ্মশানশবের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস!
তারই লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা—হিম চিতা জ্বেলে দেয় শিখা,
তার মাঝে যায় দহি বিরহীর ছায়া পুত্তলিকা! (কবি)

এই কবিতায় কবির 'আমি কবি, সেই কবি'র কোনো মিল নেই। এখানে যদিও কবি ঝরা পালকেব ছবি দেখেছেন, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের মতো বালক কিশোরের উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর রূপ দেখে উদ্বোধিত, 'ঝাউয়ের কাননে মিঠা' 'মাঠে মাঠে মটর ক্ষেতের শেষে—তোতার মতন চকিতে যখন আমি আসিয়াছি ভেসে।' কিন্তু নির্জন কবি যখন বর্তমান জগতের

সঙ্গে সংঘর্ষে সম্মুখীন হয়েছেন তখনই তাঁর দ্বন্দ্ব, তখনই তাঁর যন্ত্রণা তীব্রতর হয়েছে, সেই যন্ত্রণায় এই জগৎ তাঁর কাছে মনে হয়েছে নষ্ট শশা পচা চালকুমড়োর মতো। 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দলাল' কবিতায় স্বপ্নে-দেখা বাসর-বধূর রূপ যে-ভাবে মলিন হয়েছে, সেই ভাবে এই জগতের রূপকে তিনি দেখেছেন :

অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল, নরম লালিমা
জ্বলে গেছে,—নগ্ন হাত,—নাই শাঁখা,—হারায়েছে রুলি,
এলোমেলো কালো চুলে খ'সে গেছে খোঁপা তার, বেণী গেছে খুলি'!
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছ নাকের ডাঁশা, হিম স্তন, হিম রোপকূপ!
আমি দেখিয়াছি তারে, ক্ষুধিত প্রেতের মতো চুমিয়াছি আমি
তারি পেয়ালায় হায়!

কিন্তু দেখা সত্ত্বেও এই জগৎকে জীবনানন্দ পরিহার করেন নি, করতে পারেন নি, পৃথিবীর অপগত সৌন্দর্যে সদূর নীলিমায় তিনি যাত্রা করেছিলেন, পেছনে মাটির মায়ের ডাক শোনেন নি : 'ডেকেছিল ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস—জোনাকির ঝাড়/আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ—শ্মশানের খেয়াঘাট আসি।' তবু কবিকে নিবৃত্ত করতে পারেনি সুদৃঢ় যাত্রা থেকে। 'ধু-ধু মাঠ—ধানক্ষেত—কাশফুল—বুনো হাঁস—বালুকার চর—বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর/এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া!' স্ফীত সমুদ্রের তীরে, আর তখনি পৃথিবীকে তিনি দেখতে পেলেন, যদিও এই পৃথিবী ভ্রূণ ভ্রষ্ট সন্তান প্রসব করে, সন্তানের বৃদ্ধ পিতা মৃত, সূতিকা-আলয় এবং শ্মশানের চিতা একই সঙ্গে জাগ্রত, তবু মাটির বাৎসল্য অপরিসীম, তার প্রকাশ পৃথিবীর নিসর্গ শোভায়, ঋতুতে। মানবসন্তানের জন্যে তার স্তন স্নেহে ভিজে ওঠে। এই সব দেখেই জীবনানন্দ নিজেকে বলেছেন যে এই অপূর্ব গন্ধে-ভরা ধরণীর আকর্ষণ ছেড়ে দু'দণ্ডের জন্যে দূর আকাশে নেশাখোর মক্ষিকার নেশা জাগিয়ে বুকে লাভ কি? তাই :

নয়ন মুদিনু ধীরে—শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য—প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।

শেষ পর্যন্ত এই মর্ত্য-প্রীতিই জয়ী হয়েছে, এবং এই মর্ত্যেই মানবজীবনের বিকৃত রূপ দেখেছেন, এবং তা থেকে মুক্তির আনন্দ আনতে চেয়েছেন। এই কারণেই জীবনানন্দ শ্রেষ্ঠ কবিতাসংকলনে তিনটি কবিতা নির্বাচন করেছিলেন, 'নীলিমা', 'পিরামিঠ' ও 'সেদিন এ -ধরণীর।' নীলিমার আকাঙ্ক্ষা, পিরামিডে অতীত ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের যোগ, এবং 'সেদিন এ ধরণীর' মধ্যে নীলিমার চেয়ে মর্ত্যপ্রীতির জয় ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই ভালোবাসা একমুখীন নয়, বিরোধী দ্বন্দ্বে উন্মথিত।

দেহগত রূপতৃষ্ণা দু-একটি কবিতায় তীব্র থাকলেও কিট্‌সের ইন্দ্রিয়-বাসনায় প্রত্যক্ষ দেখা দিয়েছে : 'যে-কামনা নিয়ে মধুমাছি ফিরে বুকে মোর সেই তৃষ্ণা!' জেগেছে ইয়েট্‌স্ ও পাউন্ডের মতো অতীত স্বপ্নচারিতা, 'অলিভকুঞ্জে হা হা করে হাওয়া কেঁদেছে কাতর যামিনী ভরি!/ঘাসের শাটিনে আলোর ঝালরে মার্টিল পাতা পড়েছে ঝরি!/উইলোর বন উঠেছে ফুঁপায়ে—ইউ-তরু শাখা গিয়েছে ভেঙে।' সমস্ত পরিবেশটাই

বিদেশি। এর সঙ্গে দেখা দিয়েছে বিষ ও অমৃতের যুগল রূপ একই সঙ্গে, ভিজে ঘাস, হেমন্ত, জোনাকির ঝাড়ের সঙ্গে কঙ্কালের রাশি, দাউ দাউ চিতা এসেছে কল্পনায়। নজরুলের মতোই ভগবান সম্বন্ধে বলে উঠেছেন : 'ভগবান ভগবান তুমি যুগ যুগ থেকে ধরেছ শুঁড়ির পেশা'; এই পৌত্তলিক ঈশ্বর বিরোধিতা, পরবর্তীকালে আরো প্রকট হয়েছে। সন্দেহ নেই, অনেকের ভাষায় তিনি কথা বলেছেন, গদ্যের ও কথ্য ভাষার রীতি নজরুলের কাছ থেকে পেয়েছেন বিশেষ করে, কিন্তু এই ইমেজ এই দুই কবি রচনা করতে পারেন নি : 'হেরিলাম দুরে বালুকার 'পরে রুপার তাবিজ প্রায়।' এবং এই শব্দ-ব্যবহারের সাহসিকতা তাঁদেরও ম্লান করে দিয়েছে : 'সঙ্গে স্যাঙাত, সমুদ্র ডাকাত', 'গাড়তে যাবে যারা' 'হাড্ডি তাদের ফোঁপ্‌রা হয়ে ঝুরবে, বালুর মাঝে'। 'খিঁচে' শব্দ জীবনানন্দের আগে কেউ ব্যবহার করেছেন বলে জানিনা, পরেও 'হাঙরি' গোষ্ঠী ছাড়া কেউ করে নি, সেই সঙ্গে 'গাড়তে' শব্দও মনে আসবে। এবং তিনি যে বেদনার, বিষণ্ণতার, নিঃসঙ্গতার সুরধ্বনির সাহায্যে এনেছেন তা 'ঝরা পালকে'র মধ্যেই পরিস্ফুট। মর্ত এবং নীলিমা দুইই তাঁকে ডাকে, মর্ত্যেই তিনি আসেন ধরণীর স্তনের লোভে, কিন্তু শুষ্কস্তনের আঘাত তাঁকে পাগল করে দেয়, তখন তিনি 'বেদে'র মতো উধাও হতে চান, এবং ইয়েট্‌সের নাবিকের মতো সুদুরে উধাও হন; উধাও হন হয়তো ফিরে আসবার জন্যেই, শান্ত স্বস্তি কামনা করেন :

কবে তব হৃদয়ের নদী
নিল অসম্বৃত সুনীল জলধি!

ললাটে জ্বলিছে তব উদয়াস্ত আকাশের রত্নচূড় ময়ূখের টিপ,
কোন দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে!
বিচিত্র বিহঙ্গ কোন্ মণিময় তোরণের দ্বারে
সহর্ষ নয়ন মেলি হেরিয়াছ কবে।
কোথা দূরে মায়াবনে পরিদল মেতেছে উৎসবে —
প্রবাল-পালঙ্ক-পাশে মীননারী ঢুলায় চামর!
সেই দুরাশার মোহে ভুলে গেছ পিছু-ডাকা স্বর
ভুলেছ নোঙর!
কোন্ দূর কুহকের কূল
লক্ষ করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয় মাস্তুল
কেবা তাহা জানে
অচিন আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে কানে! (নাবিক)

লক্ষণীয়, জীবনানন্দের কবিতা প্রেরণার আবেগে স্বচ্ছন্দ ও বেগবান এবং স্বতঃস্ফূর্ত, এখানেই কবিতার আন্তরিকতা পরীক্ষা করা যায়। যদিও ভাষার মধ্যে বাহুল্য আছে এই পর্বে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই বোধই ভাষব্যায়ামে পরিশীলিত ও মার্জিত হয়েছে। আর 'কোন্ দুর কুহকের কূল লক্ষ করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয় মাস্তুল'-এর

মতো চরণ জীবনানন্দ খুবই কম লিখেছেন। এখানে ভাষাকে পুরনোপন্থী করে ভাবকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, 'সাতটি তারার তিমিরে' ভাষা ও ভাব একই সঙ্গে জীবনানন্দকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

রবীন্দ্রবিরোধিতা 'অস্তচাঁদে' কবিতাতেই সুস্পষ্ট :

> 'ভালোবাসিয়াছি আমি আস্তচাঁদ, ক্লান্ত শেষ প্রহরের শশী'

অস্তচাঁদের মধ্যে যেমন অন্ধকার, সেই অন্ধকারে মিশে আছে লকোনো আলো, শেষ প্রহরের চাঁদও মানুষের মতো ক্লান্ত; চাঁদহীন অন্ধকার ও ক্লান্তির পথেই তার যাত্রা—এ-যেন ভার্জিলের পাতাল জগতের সাদৃশ্য আনে : নিচু নির্জনরাত্রি অন্ধকার, কোনো মানুষ নেই; বনের পথ চলেছে এইভাবে; নীচে চঞ্চল চাঁদের অভিশপ্ত আলো; আকাশ বিষণ্ণ, পিচের মতো অন্ধকার, সমস্ত জগৎ বর্ণবিহীন। রবিকরোজ্জ্বল চেতনার পাশে অস্তচাঁদের ক্লান্তি ও অন্ধকারে আকাশব্যাপ্ত বিষণ্ণতা জাগায়।

জীবনানন্দ : অনন্য বোধের দ্যুতি

জীবনানন্দের লেখা পড়লে, ইংরেজি লেখা বাদে, অদ্ভুত বেদনার মধুর আগুন হৃদয় ও মনকে নিয়ত পোড়াতে থাকে, তার রেশ সারাদিন জড়িয়ে থাকে।[১]

এর কারণ কি? কারণ নিশ্চয়ই বিষয় ও বর্ণিত বস্তুর মধ্যে আছে। কিন্তু বিষয়বস্তুকে যে-উপায়ে গদ্যের বিন্যাসে বলেন, এই বিন্যাস থেকেই পদগুলি প্রতীকে সঙ্কেতে রূপকে ছবিতে নতুন হয়ে ওঠে। প্রেমহীনতা তাঁর উপন্যাসে ও কাব্যের একটি মূল বিষয়। যে-নারীকে আমি চাই, যে-নারী আমার পাশেই আছে, সে যদি আমার কাছে ঔদাস্যে নীরব হয়ে নিজের মনে গুটিয়ে থাকে, নিজের শারীর সখ শুধ অনভব করতে চায় শীতের রাতে উষ্ণ লেপের নিবিড়তায়, পান চিবিয়ে, ভালো খাবার খেয়ে, পরপুরুষের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, গান গেয়ে, সরমের সরসতা এনে, আমাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে, তাহলে তার প্রতি রাগ ঈর্ষা জ্বালা যেমন জাগায়, তেমনি নরনারীর সম্পর্কে অমেয় প্রশ্ন মনের মধ্যে আলোড়িত করে; তখনই চিন্তন ও মনন প্রধান হয়ে ওঠে; এই চিন্তার মধ্যে যৌন কামনাও অনিবার্যভাবে আসে; যৌন ভাবনা শুধু বিরোধী লিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবার কামনা-বাসনা নয়, দুয়ের যোগে মিলিত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বার দুর্বার কামনা, অপৃথিবীতে চলে-যাওয়া। এই কারণেই তো পুরুষ বাপ-মা থেকে আলাদা হয়, নারীর মধ্যে পথ কেটে রক্তে-মাংসে এক হয়ে যায়, এক হয়ে গেলে বিশ্বের, অতীত বিশ্বের, বিশ্বাতীতের অন্ধকার আদিম নক্ষত্রের দ্যুতির মতন চেয়ে থাকে; পরিব্যাপ্ত করে পুরুষকে; প্রচলিত কাহিনীতে আছে, একটি শরীর বিচ্ছিন্ন ছিলো, এই বিচ্ছিন্ন নারী ও পুরুষ প্রেমে এক হয়। যেখানে সে এক হতে পারে না, অপ্রেমে, বিরসতায়, নিরুৎসাহে, অন্য রঙিন শারীর কামনায়, স্মৃতির অতীত বাসনার রঙে, সেখানেই তো পুরুষের জ্বালা, এই জ্বালার সঙ্গে সে যদি যন্ত্রণা নিয়ে নানাভাবে নতুন করে নাড়ায়, তাহলে মৃত্যুই নিরাশ্রয়তার, নতুবা মনের অন্ধকার অতল জলে ডুবে গিয়ে শুধু মননের নানাবিধ 'হ্যাঁ-না' 'না-হ্যাঁ' এক হয়ে যায়; যে স্পর্শকাতর, সংবেদনায় অ্যান্টেনাকে ছাড়িয়ে যায়, তার কাছে এই দুঃসহ ব্যথার কোনো মূল্য নেই এ-জীবনে; নারীর কাছে পুরুষের জীবনের গোটা অস্তিত্ব বিলোড়িত হয়, অস্তিত্বের ঝুঁটি ধরে নাড়ায় বলেই সে সব সময় ভাবে, চিন্তা করে, মননের মনন দিয়ে সে তার নক্ষত্রকে নক্ষত্রের আলোয় উন্মথিত করে। পুরুষ ঈশ্বরের গৌরব ও ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি, নারী পুরুষের গৌরব। এই গৌরব হারিয়ে পুরুষ কীভাবে থাকতে পারে; তার পাঁজর দিয়ে তৈরি নারী; তার পাঁজর যদি চলে যায়, তার প্রাণবায়ু নিশ্বাস অন্তর্হিত। সে সময়ের মধ্যে, যে-সময় খণ্ডিত কালকে ছাড়িয়ে মহাকালে চলে যায়, সে-সময়ে মাঝে মাঝে যাওয়া যায় না, একথা ঠিক নয়; এবং মহাকালকেও যে গ্রাস করে তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারলে রক্ত-মাংসের ও ইন্দ্রিয়ের সব যন্ত্রণা লোপ পায়। সময় ও মহাকাল চেতনায় ব্যক্তি-মানুষ তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে, সেখানে কোনো অপ্রেমময়ী মানবীর তুচ্ছ উপেক্ষা, উদাস নীরবতা, নিগূঢ় অসফলতার পরম্পর বাধা, উড়ে যাওয়া শিমুলের মতো মনে হয়। নতুবা, ইতিহাস-চেতনা, যার মধ্যে অতীতের বর্তমান, বর্তমানের অতীত, অতীতের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের অতীত না-

---

১. প্রবন্ধের শীর্ষনাম দিয়েছেন স্নেহাস্পদ অজিত বসু

দেখা স্বচ্ছ জলের স্রোতের মতো গান, ব্যাপ্তির। কখনো কিসের উদ্‌ভাসে জানি না, জীবনে করুণার নৌকো অন্ধকার জলে সোনার মতো জ্বলে চলতে থাকে। সকলের মধ্যে আমি, আমার মধ্যে সকলে ঢুকে নিজেকে হারিয়ে ফেলি; হারিয়ে ফেললে বেদনা ও যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায়; কিন্তু কতোটুকু সময়ের মধ্যে পারা যায়! পুরুষতো নিয়ত জায়মান হতে চায় নারীর শরীরের অতল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে তার প্রেমে ও ভালোবাসায়। জায়মান হতে পারে না বলেই তো পুরুষের যন্ত্রণা সাপের বিষের মতো, অথবা আমার অস্তিত্বের পাতায় সাপ বিষ ঝরছে অনবরত। টাকা অর্থ পয়সা সম্মান যা পাওয়া যায় সবই পেতে পারি, কিন্তু যে-বেদনার আলো আলোর হয়ে নীলশাদা অন্ধকারে গান হয়ে উঠতে পারে এই পৃথিবীকে নিয়ে, এই পৃথিবীকে ছাড়িয়ে অ-বিশ্বে, তার স্পন্দন তো অধরা থাকে। এটা মূর্খের কথা, যৌনতা অশ্লীল; যৌনতার মূলধাতুর মধ্যে বিদেশে ও এখানে দুটো রূপ, একটি বিচ্ছেদ; বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যুক্ত হবার আকুল বাসনার দুর্নিরীক্ষ উদ্দাম স্রোত। পুরুষ সেই স্রোতে ডুবতে চায়, ভাসতে চায়, নিয়ত চলতে চায়। এই পৃথিবীতে অধিকাংশ নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমই বেশ্যার সঙ্গে যৌনসঙ্গম; শরীর দিয়ে সে শরীরের সুখ চায়, অন্য জিনিশের জন্যে দেহকে দিয়ে মজা লোটে, কাজের ও সুবিধে আদায়ের জন্যে নষ্টামির ও ধাস্টামির ভ্রান্তি ও মায়া সৃষ্টি করে। ধাস্টামো করতে না পারলে হেঁটে চলে বেড়ালেও শীতল ঠাণ্ডা মেরে থাকে, সিঁটকে থাকে; কখনো-কখনো আগুনের মতো চমকে ওঠে অন্য পুরুষের সঙ্গ পেলে; এই বেশ্যা-নারীর সঙ্গে থাকতে থাকতে পুরুষও ব্যভিচারী হয়, নতুবা ঈশ্বরের গৌরবত্ব হারায়; একালের মানুষ প্রেমহীন, নারীর কাছে সঙ্গম পেয়ে তার দিব্যতাকে হারিয়েছে এবং নারীও সন্তান দিয়ে স্বভাববন্ধ্যা, অন্ধকারের অন্ধকারে সে নিরুত্তর, কোনো কথা সে শুনতে পায় না। পুরুষ সৃষ্টির অন্তিমে অন্ধকারে জলকে চায়, এই জলের মধ্যে মহিলা উত্তমর্ণ হয়ে বিরাজ করে, তাই জ্ঞান ধর্ম উদ্যোগ কিছুই না এবং সৃষ্টির অন্তিমে বা আদিতে যে-জল, সেই জলের মধ্যেই সে তৃষ্ণার্ত এবং ঘাতক।

এরি কথা জীবনানন্দ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, নানান বৈচিত্র্যে ও বিস্তারে শব্দ পাল্টে, উল্টে, বিভিন্ন সুরের যোগে, রঙের উদ্‌ভাসে ও মিশলে নতুন এক ছবি তুলে এনে বলেন। জীবনানন্দ এই কারণে আমাকে টানেন, নির্জ্ঞান মন, মগ্নচৈতন্য, অবচেতন পাশাপাশি বা একই সঙ্গে ছবির উজ্জ্বলতায় ফুটিয়ে তোলেন অনায়াসে।

সৃষ্টির অন্তিমে জল, অথবা সৃষ্টি। সৃষ্টি বলতে নারীকেই বোঝায়, জীবনানন্দের নারী, উপন্যাসে ও গল্পে এ-সম্বন্ধে সচেতন। একটি গল্পে একজন নারী বলেছেন, সৃষ্টি নিয়ে এমন খেলা করবার মানে কি! 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের চিন্তায় ধরা পড়েছে নিজের মধ্যে জিজ্ঞাসায়; 'সমাজকে ভালো করা যেতে পারে হয়তো। অনেক কালের সাধনা দরকার। কিন্তু সৃষ্টিকে কে ঠিক করবে?' (২৯৮ পৃ. ৫ খণ্ড) প্রত্যেক পুরুষই নারীর মধ্যে মদিরতা খোঁজে, আনন্দ পেতে চায়; এই মদিরতা ও আনন্দই হয়তো ভালোবাসা, যার অন্য নাম অব্যয় জিনিশ। জীবনানন্দের উপন্যাস-গল্পের নায়কেরা এর খোঁজেই ঘুরে বেড়িয়েছে; কিন্তু পায় নি। তাই তাদের চিন্তামগ্নতা এমন তীব্র, তীক্ষ্ণ। নিজেকে নিয়ে এবং জীবনের সৎ ও অসৎকে নিয়ে তাদের নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের সঙ্গে এসে মিশেছে স্বপ্ন বাস্তব, মগ্ন চৈতন্য ও নির্জ্ঞান মন। প্রকৃতির উপমা, উপমার সঙ্গে অপৃথিবীর উজ্জ্বলতা, সময়ের বোধ, ইতিহাস-চেতনা, নিজের যৌন চেতনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যেমন সমাজ রাজনীতি অর্থনীতির মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে, তেমনি করুণা ও দয়ার মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করতে চাইছে; উৎপলার যে-অপ্রেম

এবং নিরুত্তরতা শরীরের দিক দিয়ে মাল্যবানকে জ্বালায় নরকের আগুনের মতো; সে-জ্বালারও উপশম ঘটে নিজের মায়ের সঙ্গে তার কন্যা মনুর মা উৎপলাকে যখন এক করে দেখে; সেখানে উৎপলা নারী নয়, মা; এই মাতৃত্বের মধ্যে আছে 'কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাণহীন আনন্ত্য'। সময়ও যখন কালে পৌছয় সেখানে সে অসীম। মানুষের নিয়তি এই যে সময়ের মধ্যেই তাকে বাস করতে হয়।

জীবনানন্দের চিন্তনের বৈশিষ্ট্যই হলো সমস্ত মনকে ধরা, সমস্ত বিরোধকে ফুটিয়ে তুলে তার সমন্বিত রূপকে ফুটিয়ে তোলা। তাই তাঁর নায়কের কল্পনার সঙ্গে অকল্পনা, চেতনার সঙ্গে অবচেতনা একসঙ্গে মিশিয়ে বিচিত্র বিস্তৃত রূপ, একক সূর্যের পরিবর্তে অন্তহীন নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে ও আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যোগ করেন, বিজ্ঞানের চতুর্থ বিস্তার ঘটনাকাহিনীচরিত্রকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়; সমগ্রের সমন্বিতরূপ ফুটে ওঠে বাইরের বর্ণনায় নয়, জীবনানন্দের ভেতরের উপলব্ধির গভীরতায়; তাঁর অর্থসমস্যা, অভাব ও দারিদ্র্য যেমন বাইরের, তেমনি সমাজ ও যুগের জন্যে দারিদ্র্য। তাই 'বোধ' কবিতার শেষে : 'যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে/নষ্ট শসা—পচা চালকমড়ার ছাঁচে,/ যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে/—সেই সব'। প্রকৃতি ও গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং অর্থাভাবে যে-কষ্ট পেয়েছেন, তা তাঁর উপলব্ধিতে রক্তাক্ত যন্ত্রণা হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তত্ত্বকে রূপায়িত করেন নি, তাঁর উপলব্ধির যন্ত্রণা বিচিত্র বিভিন্ন রূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। 'মাল্যবান' উপন্যাসের শেষে স্বপ্নবাস্তবতা, চেতন-অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা বাসনা, গদ্য ও কবিতার মিশলে কবিতায় কোরাস · 'পরলোকের কণ্ঠে শোনা', উৎপলার কথা একসঙ্গে মিশে কেমন বিস্তার ও অতল গভীরতা পায়। চেতন-অবচেতনে কথা বলতে-বলতে সমস্ত বিশ্বভুবন যেন ছবিতে রঙে সুরে বিচিত্র বস্তু-উপাদানের সমবায়ে বিরাট বিশালতা নিয়ে আসে; কেমন আলো, অন্ধকার, সূর্য, শিকার, বাজ, বড় বাতাস, মাতৃগণ, গণিকাগণ, উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের বোল শুনতে শুনতে মাল্যবানের ঘুম ভেঙে গেলো, ঘুমের ভেতরে শুকনো শক্ত চুনি-পান্নার ভেতর থেকে জল ঝরছে, অর্থাৎ ঘুমের স্বপ্নে অপ্রেমে কঠিন উৎপলার হৃদয় জল হয়ে ঝরছে, জল থেকে জলদেবী হয়ে উঠেছে সে। এই জলদেবীকে নিয়ে মাল্যবান শীতের রাতে শুয়েছে ঘুমে। সৃষ্টির অন্তিমে যে-জল, সেই জল থেকেই জলদেবী, তার কাঙ্ক্ষিত নারী। কিন্তু বাস্তবে ঘুম থেকে জেগে দেখে এঁটো টেবিলে সে পড়ে আছে মুখ-গুঁজে। তাকে মুখ-গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেও উৎপলা তাকে জাগায় নি, এঁটো পরিষ্কার করেছে, মশারি ফেলেছে, এবং তারপর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে শীতের রাতে। এই আঘাত মর্মান্তিক, কিন্তু সত্য। মাল্যবানের প্রতি বিরূপতা উৎপলার প্রচণ্ড, অথচ অমরেশের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে সে তৃপ্ত। তার শরীরে সরসতা এসেছে এক রকম লজ্জার, কথাবার্তায় ব্যবহারে প্রথম বিয়ের জল যেন দ্যুতি এনেছে, মেঘ থেকে সৃষ্টির জল পড়ছে। অথচ অমরেশও বুদ্ধিতে আচারে-ব্যবহারে জন্তু ও পশু ছাড়া কিছু নয়। সঙ্গমে তৃপ্ত হবার পরই জীবনানন্দ বর্ণনা দিয়েছেন উৎপলার : 'একটা পারুল ফুলের মতো প্রকৃতির থেকেই যেন উৎপন্ন জমিনের তাঁতের শাড়ি সে পরেছিলো—চওড়া লাল পাড়ের। আশাতিরিক্তভাবে পরিতৃপ্ত কেমন একজন সীতা, সরমা, দ্রৌপদী, চিত্রসেনীর মতন অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে।' স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্যপুরুষের সঙ্গে দেহবিনিময়ে উৎপলার মনে কোনো নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে নি। বরং সে তৃপ্ত। অমরেশ আসে রোজই, মাল্যবানের নীচের ঘরে মাল্যবানের নাকের ওপর দিয়ে। মাল্যবান সব জেনেও কিছু করতে পারে নি। তাই উৎপলা বীর্যে বলে উঠেছে :

'কী করতে পারবে?' নীতিহীন মানুষের কাছে অতি তীক্ষ্ণ সংবেদী মানুষ অসহায় নিরাশ্রয় নিরলম্ব। নিজের চিন্তার মধ্যেই মুক্তি পায়, সান্ত্বনা খোঁজে, নিজের সংকীর্ণতা থেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় উদারতায়; অতিরিক্ত চিন্তন ও মননই এই চরিত্রের দুর্বলতা ও পরাজয়ের কারণ। চিন্তনের সঙ্গে মিশেছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, একই সঙ্গে বহুবস্তুর উপমায় বিচিত্র ও গভীর। স্বামীর প্রতি তার অনিচ্ছা অরুচিকে অদ্ভুত চিত্রে তুলে ধরেছেন জীবনানন্দ মাল্যবানের উপলব্ধিতে : 'এই বারোটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা অরুচির বঁইচি-কাঁটা চাঁদা-কাঁটা বেতকাঁটার ঠাস বুনোন জঙ্গলে নিজের কাজ-কামনাকে অন্ধ পাখির মতো নাকেদমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কতো যে সজারুর ধাস্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেঙচি, কেউটের ছোবল, আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির।' চরিত্রপ্রকাশে শুধ বস্তুর প্রাণীর বিভিন্নরূপেই নয়, তাদের ভেতরকার সারবস্তু স্পষ্ট এবং মাল্যবানের চেতনায় স্রোতের মতো এই ছবিগুলি পরপর ভেসে উঠেছে; বস্তু ও উপমাতেই চরিত্রের বিশ্লেষণ; এই বিশ্লেষণ কবিতায় সম্ভব নয়। কবিতায় ইঙ্গিত ও সঙ্কেত বহু দূরে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু রূঢ় কঠিন বাস্তবের এই নির্মমরূপ কবিতায় বিস্তারে বাধা পায়, এই কারণেই হয়তো জীবনানন্দ গদ্যে হাত দিয়েছিলেন। একথা ঠিকই, কবিতায তিনি আরো জটিল, মায়াবী, বহুধা বিস্তৃত, কিন্তু উপন্যাসেব ফর্মের জন্যেই এই নির্মম বিশ্লেষণ সম্ভব হযেছে। কবিতায় যে-প্রশ্ন তলতে পাবেননি, এখানে বিভিন্ন বিরোধী ছবির মধ্য দিয়ে তাকে প্রকট করেছেন, অমরেশের মতোই এই যুগ, তার অন্তরাত্মাব ভেতর থেকে একটি সদৃঢ় সলভ আত্মতষ্টি চঁইয়ে পড়ে, আজ সবই শিশ্নোদরতন্ত্রী, শিশ্নোদর না হলেও উচ্ছৃঙ্খল, তাই মূল্য শৃঙ্খলা কোথাও নেই, ভালোমন্দের কোনো বোধ নেই। 'মূল্য বিশৃঙ্খলা? বিশৃঙ্খলরা একেই শৃঙ্খলা মনে করে।' (১৫৬ পৃ) উৎপলা অমরেশকে দেহ দিয়ে এই মূল্য বোধকেই পায়ে দলে মেরেছে। আর মাল্যবান শীতেব রাতে একটা বেড়ালছানার ডাকে অসহ্য হযে তাকে মেরেছে থেঁতলে। আর সেই থেঁতলে-মরা বেড়াল মাল্যবানের আত্মায় ঢুকে গেছে। এখানেই উৎপলা ও মাল্যবানের প্রভেদ। এই যুগে কোনো নীতি ন্যায় মূল্যবোধ নেই। তাই উৎপলা বলতে পারে, অমবেশ রোজ এলে মাল্যবান কী করতে পারে! কিছুই করতে পারে না চিন্তা ছাড়া, পরাজিত হওয়া ছাডা, এক্সপ্রেশনিস্ট ও সুবরেয়ালিস্ট্দের মতো অচেতন ও অবচেতনেব ছবি দেখা ছাড়া : 'দেখা গেল, উৎপলা মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে—সমস্ত চুল এলোমেলো, কপালে মাথায় সিঁদুর ধ্যাবড়া, পরনে আশ্চর্য!—বিধবার থান। মড়ার খাটিয়ার ওপর শুয়ে মরা নারী মনের, মাংসপেশীর নানারকম নম্র, উদ্দাম আক্ষেপে নিজের মৃত্যুর বেদনা সত্তোনকে জানাচ্ছে, কিন্তু শূন্যতা ও হাহাকার বিঁধছে মাল্যবানকে মর্মস্নায়ুতে।'

মাল্যবান চিন্তার সঙ্গে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের সংজ্ঞার্থও দিয়েছে সে। স্বপ্ন হচ্ছে সকলের শেষ পদার্থ। ছোট অন্ধকার ও বড়ো অন্ধকার মিলে টানা-পোড়েনে রাত্রির আলোয় শেষ ঘনিয়ে এলে স্বপ্ন উঠে আসে, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, স্নিগ্ধ স্বপ্ন সবই উঠে আসতে পারে।

জ্ঞান-নির্জ্ঞান-গ্রন্থি দিয়ে চিন্তায় ও মননে উৎপলার বিশিষ্ট সংকীর্ণ রূপকে বৃহত্তর পবিধির মধ্যে নিয়ে মুক্তি দিতে চেয়েছিলো মাল্যবান, পারেনি। এখানেই তাঁর দ্বন্দ্ব। সে বিশ্লেষণ করে দেখেছে, তার মনটা স্বাতীনক্ষত্রের শিশির হলেও শরীরটা শুক্তি নয় তার, শামুকগুগলির মতো ক্লেদাক্ত জিনিশ। শরীরের খাজে-খাঁজে মাংস, মাংসপিণ্ড, এর অনুভব সে এড়াতে পারে না। অদ্ভুত গলগণ্ডের মতন শরীর যেন তার : 'তার মন এক চিমটে সময়ের কিনার থেকে দুদিনের জন্যে ঝুলে আছে এই সৃষ্টির ভেতরে।' তাই করুণা ও দয়া —ক্ষণিক উদ্ভাস।

এতো যে জটিলতা, প্রেম ও অপ্রেমের যন্ত্রণা, মৃত্যুতে সব শেষ হবে, অথবা বহতো সময়েব বিরাটের কাছে : সচ্ছল সফল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, বিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতরে মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তিজীবন নয়, অফরন্ত অনির্বচনীয় সময়—সময় শুধু। এই বৃহত্তর সময়ের কাছেই মাল্যবান মুক্তি চায়। সাদৃশ্য কবিতার সঙ্গে এখানেই।

আধুনিক জীবনে অন্ধকারের মধ্যে ষড়যন্ত্রীর এক ছোরা ঝিকমিক করছে পেছন থেকে মারবার জন্যে, কাফ্‌কার রীতিতে এই বর্ণনা জীবনানন্দ এই উপন্যাসে অদ্ভুতভাবে তুলে ধরেছেন : অমরেশ ওপরের ঘরে উৎপলার সঙ্গে গানবাজনা বা দেহসঙ্গমে ব্যস্ত। অনেক গভীর শীতের রাত; নীচে মাল্যবানের ঘরের সামনে অমরেশের সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখা, সাইকেলটাকে দেখে মাল্যবানের মনে হলো নেপালি চাকরের মতো, আর সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে তার মনে হয়েছে যেন ভোজালি ঝলসে উঠেছে। কোমরে ভোজালি গুঁজে নেপালিটা থুপি বুড়ির মতো বসে আছে। অমবেশ যদি না নামে ওপর থেকে, নেপালি চাকরটা রক্ষা পাবেনা। মাল্যবানের কাছে এই নেপালি চাকর ও তার ভোজালিকে প্রতীকের মতো মনে হয়েছে আজকের পৃথিবীতে : ‘স্ত্রী-পুরুষেব সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ, সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে—সফলতা ও সবলতাও; হাবিয়ে ফেলেছে সরসতা, আজকের বিমূঢ় পৃথিবীতে সমস্ত পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক-গ্রন্থিকে ছেদ করে অপরিমিত গণ্ডমূর্খের অপরিমেয় মনোবল পথ কেটে চলেছে একটা নেপালি ভোজালির মতো। সময়কে প্রকৃতিকে পুরাণপুরুষকে (যদি থেকে থাকে কেউ) তবে কি হিসেবে ধ্যান কবা যাবে আজ। প্রভু হিসেবে? সখা হিসেবে? পত্নী হিসেবে? না, তা নয়। স্বামী, স্ত্রী বা সখাভাবে নয়, সাধা হবে নেপালি ভোজালিভাবে; ঘুম আসছে না মাল্যবানের’। (১৫১-৫২ পৃ. ‘প্রতিক্ষণ’ সংস্করণ।)

এই উদ্ধৃত অংশে জীবনানন্দেব অনুভূত বিষয়ের বিস্তার যেমন ফুটে উঠেছে স্ত্রী-পুরুষ, মানষের সঙ্গে মানষের সম্পর্কে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কে, তেমনি তার মধ্যে সময় প্রকৃতি পরাণপরুষ এর মধ্যে অন্তর্ভূত হয়েছে, কিন্তু সকলের ওপরে দৃশ্যত ঝুলছে নেপালি ভোজালি-- যা সব কিছু ভেদ করবে। এই প্রতীক দৃশ্য যেমন এক্সপ্রেশনিস্ট বাস্তব, তেমনি একালেব।

জীবনানন্দের শিল্পী হিশেবে কৃতিত্ব এইখানে, তিনি দটিকেই সমানভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং উভয়ের মধ্যেই তাঁর সহানুভূতি সমবেদনা সমানভাবে বিদ্যমান। ‘ক্যাম্পে’ কবিতায় এর রূপ সুস্পষ্ট : ‘আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো/যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে/এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি/জীবনের বিস্ময়ের রাতে/কোন এক বসন্তের রাতে?’ শিকারির বন্দুকের গুলিতে হরিণেরা মৃত, কিন্তু এই সব শিকারিদের হৃদয়ও ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে ব্যথা ও প্রেমের কথা ভেবে। বিশ্বপৃথিবীতে সকলের মধ্যেই এই ব্যথা ও প্রেমের বোধ। তাই কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি এইভাবে আসে : ‘বসন্তের জ্যোৎস্না’য় ওই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই। এই পরিপূর্ণতা ও সমগ্রতার জন্যেই তিনি হয়েও রোম্যান্টিকদের ছাড়িয়ে একালের আধুনিক কবি হয়ে উঠেছেন। রোম্যান্টিকদের। শুধু নিজের গভীর অতলে।

কবিতায় যে-সব বিষয়ের পরিচয় পাই, গল্পে উপন্যাসেও সে-সব কথা আছে, তার চেয়েও আরো নতুন রূপ ও বিষয় এসেছে; এর ফলে বিস্তার ঘটেছে প্রভূত। গদ্যের বিশ্লেষণ কবিতায় সাজে না, এই বিশ্লেষণে জীবনানন্দ নিজেকে বিস্তৃত করেছেন। তিনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের নিয়েই গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখেছেন; কবিতায় হিন্দু-মুসলমান ফিরিঙ্গি মজুরেরাও এসেছে;

মেসের ঝি বামুন, রাস্তার মেথর থেকে আরো সব অভুক্তদের স্থান দিয়েছেন। বিবাহিত স্ত্রীর অপ্রেম ও হৃদয়ের কঠিনতা, যৌন তৃষ্ণা, অবৈধ নারী-পুরুষের সঙ্গম, বহু আগে কৈশোর প্রেমের স্মৃতির বেদনার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক—এসব বিষয় ক্লান্তিকরভাবে পনরাবৃত্ত; পনরাবৃত্ত হলেও কোথাও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। জীবনানন্দের উপন্যাসের একটা বিশেষ ভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য, চরিত্রগুলি সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করছে। এই সংলাপমখীনতা কবিতায় ধরা অসম্ভব। এবং গল্প-উপন্যাসের ভাষা কবিতার থেকে বাক্যগঠনে অনেক সরল; সেই তুলনায় কবিতা ও প্রবন্ধের ভাষা অনেক জটিল, এবং এখানেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। এই কারণেই কি গল্প-উপন্যাসগুলি তিনি ছাপতে চান নি! না, ছাপাবার জায়গা পান নি? আমারই মতো?

সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ অনুভূতির মানুষ কষ্ট পাবেই, এই চরিত্রগুলির নাক কান যেমন খোলা, তেমনি 'সূক্ষ্ম পক্ষীসংস্কার', পশু-অনুভূতিও আছে, যা সফল সচ্ছল মানুষের নেই; 'কারুবাসনা' উপন্যাসের শেষে বৃদ্ধ যদুনাথ নায়ককে উপদেশ দিচ্ছে : 'ফকির সাজা না ঘুঘু সাজা, পৃথিবীকে যদি উপভোগ কবতে চাও তা হলে সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে শেখো, ভগবানও আশীর্বাদ করবেন, নারীও হাতের পুতুল হবে।'

উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে কবিতায় রূপান্তরিত করলে কীরূপ দাঁড়ায় 'কারুবাসনা'র শেষে উদ্ধৃত কবিতাটি তার উদাহরণ :

> দূর থেকে দূরে সরে যায়—
> অন্তর্গত পৃথিবীর সুনিশ্চয় ঘন পরিচয়; প্রত্যাবর্তনের পথ নিঃশেষে মুছে
> কীর্তি সফলতা আর উদ্যমের বিপুলতা দিয়ে।
> নির্বাসনের এক নীরন্ধ্র বলয় কাছে আসে।
> কারুবাসনার লয়, নীরন্ধ্র বলয়—

ইঙ্গিতে সবই আছে, কিন্তু বিশ্লেষণের বিস্তারের বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা অনুপস্থিত। চরিত্র-বিশ্লেষণে উপমা এবং বর্ণনার ভেতরে ভাষাব ব্যবহার অতল হৃদয় ও অচেতনকে অদ্ভুতভাবে জাগিয়ে তোলে : 'না, নম্র বশ্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খডখড়ে আগুন খড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনির মত হল মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ, আর বিবাহিত জীবন।' কেন হলো, সেকি সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রবৃত্তির জন্যে, না অন্য কোনো জৈব দুর্বলতা আছে মাল্যবানের, যা উৎপলাকে শরীরের তৃপ্তি দিতে পারে না। এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অভাব জীবনানন্দের উপন্যাসে-গল্পে থেকেই যায়, রবীন্দ্রনাথ যা উপমা ও প্রতীকের ইঙ্গিতে বলেন। মাঝে মাঝে জীবনানন্দও উপমা ও অনুষঙ্গে ভরিয়ে তুলতে চান বিশ্লেষণের তাৎপর্যকে, তাঁর বাক্যগঠনের মধ্যেই একই সঙ্গে আয়রনি বা বিরোধ থাকে, যা চরিত্রকে নিগূঢ়তাকে প্রকাশ করে : 'বিরূপাক্ষকে মণিকা ঘৃণা করে না, বিষাক্ত ব্যবসায়ী হলেও ওর হৃদয় হয়তো ঠিক সে অনুপাতে কঠিন নয়, মনটা সর্দার, কিন্তু সমীচীন নয়—স্থির নয়, এখনও রাধাচক্রে ঘুরছে'। 'রাধাচক্র' অনুষঙ্গের মধ্যেই সব কথা আছে। বিরূপাক্ষের ভাবনায় মণিকার রূপের বর্ণনায় সব বিরোধ মিলিয়ে নারী মহীয়সী : 'কী অপরূপই দেখাচ্ছে মণিকাকে, ভাবছিল বিরূপাক্ষ: যেন ভরা নদীর তীরে জঙ্গলের অন্ধকারে রাতের বাঘিনী সহসা অনির্বাণ মানুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে—অথচ বাঘিনীও বটে সে, তেমনি সাহসিকা, সুদৃঢ়া, মহীয়সী।'—ভরা নদী, তার সঙ্গে জঙ্গলের অন্ধকারে আদিমতা, আদিমতার পথ ধরেই এসেছে বাঘিনীর হিংস্রতা; একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করা যায় না। নারীর সঙ্গে পশুর প্রাণীর এবং সরীসৃপের একাত্মতা জীবনানন্দের

উপন্যাসে প্রায়শ মিশে যায়, যেমন নক্ষত্রের সঙ্গে প্রকৃতি ও ফুল মিলে নতুন সৌন্দর্য তৈরি করে। বসন্তবাউরি ফুলের সঙ্গে নক্ষত্র মিলে নতুন রূপ উদ্‌ভাসিত।

কবিতায় শুধু দেশি ও অশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেননি, উপন্যাসে অশিষ্ট অশ্লীল কর্কশ শব্দ ব্যবহার করে অচেতন ও হৃদয়ের গভীর নোংরা তলদেশকে খুঁচিয়ে তুলতে চেয়েছেন : 'ফড়কে উঠে বলল', এ শব্দের ব্যবহার কোথাও আমি দেখিনি বাংলাসাহিত্যে। ধ্বন্যাত্মক ও অশিষ্ট শব্দ ব্যবহারে জয়েসিয় কিছু গন্ধ আছে। উপচেতনার সঙ্গে চেতনার ঝগড়ায় অবচেতনা নায়ককে ঘুম অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে টানে; এই মৃত্যু রিল্‌কেরই মৃত্যুবোধ। উপন্যাসে বিভিন্ন উল্লেখও বিস্ময়ের, সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্য যেন উঠে এসেছে। সংলাপ-রচনায় জীবনানন্দের বাস্তবের পর্যবেক্ষণশক্তির তুলনা নেই। নিরুত্তর অপ্রেম কঠিনহৃদয় স্ত্রীর মুখের সংলাপ যে কতোখানি কদর্য ও অশ্লীল হতে পারে, উৎপলার সংলাপেই বিশিষ্ট, উৎপলার হৃদয়ের ভেতরটা যেন নগ্ন হয়ে উঠে এসেছে; সে যে মধ্যবিত্ত ঘরের নারী বোঝাই যায় না, স্বামী শীতের রাতে নীচের ঘর থেকে এসে স্ত্রীর সঙ্গসুখ চেয়েছিলো শুধু, স্ত্রী-ই স্বামীকে নীচের অন্ধকার ঘরে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। নারীর বর্ণনায় ও উপমায় কেন বারবার পশুর প্রসঙ্গ আসে জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসে, ভাষার মধ্যে তারও দৃষ্টান্ত : 'আ, গেল যা! বসলে! রাতদুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন্ ঢঙের কলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ। ও মা। ও মা! ও মা! বেরোও! বেরোও বলছি!' (১২ পৃ.) তার আগের উপমাটিও অপূর্ব, নিষ্ঠুর হৃদয়ের প্রকাশের : 'উৎপলা জেগে উঠে প্রথম খুব খানিকটা ভয় খেলে, তারপর বিছানায় ওপর উঠে বসে তার সমস্ত সুন্দর মুখের বিপর্যয়ে—মুহূর্তেই সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠে মরানদীর বালির চেয়েও বেশি বিরসতায় বললে : 'তুমি!' আবার বলে : 'মুখে নুড়ো ঠেলে দেবো আমি বেহায়া মড়াদের। ঘুমোবে? ঘুমোবে! রাত তিনটের সময়—' স্বামী-স্ত্রীর দুজনের মিলনের স্বাদের বর্ণনায় বাংলার চিরায়ত পল্লি-প্রকৃতির সংস্কার ও আবহ ভাষার মধ্যে উঠে এসেছে যৌন-তৃষ্ণার্ত নায়কের কণ্ঠে : 'হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভাল, তার চেয়ে মাটির শরীর; চালে-গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে, কপ্পুরে, ফোঁপড়ায়, নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি; তোমার কাছে এসেছি তাই, বসেছি তাই। দাও, দেবে না?'

নীচের ঘরের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও দুর্গতির ভেতর স্ত্রী-পরিত্যক্ত নচ্ছার মানুষ বলে নিজেকে সে বারবার প্রতিপাদন করে দেখতে চায় : ...'এ তার ভাল লাগে; নিজেকে অবিচারিত অভালবাসিত, বিড়ম্বিত মানুষ বলে খতিয়ে নিতে-নিতে মনটা লঘু হয়ে ওঠে তার; জীবনের থেকে কুবাতাস, দুর্ভাগ্য, অবিচার, অভালবাসা যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে পথ থাকে না আর।' বিশেষ শব্দগঠনেই হৃদয়ের অতল বোধ ব্যক্ত। এই নিষ্ঠরতা পেয়ে মনে হয়েছে যেখানে মানুষের পৃথিবী আজ পাগলাগারদ হয়ে গেছে, সেখানে মানুষের শিশুর, বেড়ালছানার একই অবস্থা। কথ্য ও অশিষ্ট শব্দের তালিকা করলে জীবনানন্দের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচয় কতো গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিলো স্পষ্ট; এখানে অশিষ্ট ও অশালীন শব্দের ব্যবহার চেতন-অবচেতন, অবচেতনের অতলকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে : 'মিকড়ে হারামজাদা,' 'খুপরির ভেতর এটাকে সট্‌কাল'; 'কখনো ন্যাং—ন্যাং করে হাঁটে না তারা,' 'বুড়ো ধাড়ির দেইজিপনা দেখ', টুই মুই টুই মুই করে হেঁটে,' 'পদে-পদে ভুড্ডু খেয়ে ফিরছে'; 'ডেস্কে-আঁটা নিখেট'; 'মনটা ঝুমুর দিয়ে ওঠে বটে'; 'লক্ষ্য উঁচু করে রাখলেও যে নীচে পড়ে ল্যাংচায় কে মানে তাকে'? 'বিরাজবাবুর দাবনা ঘেঁসেই যেন বসলেন,' 'উৎপলা ধরফড় চনমন করে উঠলো'; 'চেহারার চেকনাই';—ইত্যাদি। অপ্রেম, বিচ্ছিন্ন কঠিনতা, বিচ্ছেদ, অভালবাসা, সব যেন

একটি উপমায় ফুটে উঠেছে একটি বাক্যে : 'একটা ভাঙা গেলাসের কাচগুলোকে জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের।' জোড়াতাড়া জীবনের রূপ ফোটাতেই এইসব কথ্য অশিষ্ট অশ্লীল শব্দের সৃষ্টি। বোর্ডিঙের ঝি-সম্বন্ধে আছে : 'নানারকম সহজ সুলভ ছেনালিতে সরস।' এমনকি 'বাঞ্চোৎ' শব্দ ব্যবহার করতেও তাঁর বাধে না। এই অশিষ্টেরই সঙ্গে আছে জলের মৃদু সুরের নিবিড় নিভৃত কম্পনের শিহরনময় বেদনার ভাষা : 'কী মানে আছে এত বেশি শীতে শূন্যতায় প্রপন্ন রাতে দূর বাথরুমের অন্ধকারে মানুষের অস্তিত্বের?' মনুর মুখের 'বাথ্‌রুমে গেছে', নির্দেশের।' 'ত' 'র' যেন ধ্বনি সমারোহ তুলে এগিয়েছে, 'শীতে' 'রাতে' প্রায় অন্ত্যমিলের মতো মিলে যায়।

জীবনানন্দের এই জাতীয় লেখাগুলি উপন্যাস কিনা, এর উত্তরে বলা যায় এ-লেখাগুলো শিল্প। শিল্প তার নিজের ভঙ্গি ও আঙ্গিক নিজেই সৃষ্টি করে; নায়কের মনন ও চিন্তনের ভেতরেই গ্রাম ও শহর মিলে, চেতন-অবচেতন-অচেতনের সঙ্গে পৃথিবী ও আকাশ ছড়িয়ে এক অচেনা নক্ষত্রলোকের ইঙ্গিত দেয়—এবং এখানেই উপন্যাস হিশেবে এর সার্থকতা।

অনেকেই এমন প্রশ্ন তোলে, জীবনানন্দের শেষের দিক্‌কার কবিতায় আগের যুগের ছবি রঙ্‌ ও সুর আর নেই। 'স্টেটমেন্ট' বা বিবৃতিধর্মী : 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/ থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/ প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।' ছবি ও রঙ্‌ নেই ঠিকই, কিন্তু সুর আছে। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের অবিরাম চলার মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে সে মানব হয়ে ওঠে চেতনায়; ক্রিয়াশীলতার মধ্যে রূপান্তরে নতুন উজ্জ্বলবোধের জন্ম হয়। '১৯৪৬-৪৭' কবিতার প্রথমে বর্ণনার মধ্যেই পুরোটা ছবি, শেষের অংশটিতে জীবনানন্দের নতুন বোধের সঙ্গে জীবনানন্দের অবিস্মরণীয় ভাষার শৈলী গড়ে উঠেছে। আলো-কে বিশেষণ দিয়ে কান্তিময় করে তুললেন, কান্তিময় করবার পর তাকে শেষ করে দিলেন, এলো অন্ধকার, সেই অন্ধকাব রাত্রি মায়ের মতো মমতায় ভরা, অভাবাত্মক আলো স্নিগ্ধ অন্ধকার মমতায় পূর্ণ হয়ে এগিয়ে চললো সামনে। এই অন্ধকার মানুষের বিহ্বল দেহকে ধুয়ে দেয়, বিহ্বল আত্মাকে অন্তঃশীল করে বলেই অতীতের মধ্যে না গিয়ে শব্দহীন মৃত্যুহীন অন্ধকারকে ঘিরে রেখে সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপকে আর চায় না, ওগুলো আর আসে না বলেই হৃদয় শোকহীন হয়। স্নিগ্ধতা জাগে হৃদয়ে; হৃদয়ে শোকহীন স্নিগ্ধতা জাগলেই দেবদারু গাছের ভেতর থেকে বাতাসের প্রিয় কণ্ঠ ভেসে আসে; কেননা বায়ুই প্রাণ, একালের মানুষেব রক্তাক্ত আত্মা ও জীবন নির্মল হয়। তেরো পঙ্‌ক্তিতে একটি বাক্য শুধু এসেছে জীবনের সব উপাদান নিয়ে। কবি জিজ্ঞাসা করছেন, এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই উত্তর আছে, একালের 'মহানুভব অন্ধকার', 'সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা' আছে। তাই মানষ অন্ধকার দুর্দশা থেকে স্নিগ্ধ অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে; এই অন্ধকার থেকেই নতুন নগরী ও গ্রাম জেগে উঠছে, উৎসবের আনন্দ চারদিকে, এর কোনো অবনতি নেই; হৃদয়ে শোকহীন স্নিগ্ধতা জাগলে ভুল ও পাপের উৎসকে সে অতিক্রম করতে পারে, অতিক্রম করে চেতনাকে পায়; এই চেতনাই হচ্ছে মানুষের একান্ত গুণ—এই চেতনাকে পেলে মহানুভবতা গভীরতা পবিত্রতা সবই আসে। যদিও এই কবিতার পেছনে, আমার অনুভবে, গীতা ও দান্তের কিছু আভাস আছে, চেতনার বলয়ের নিজগুণ হয়তো-বা আরিস্ততলের প্রবাদ বাকাটি থেকে নেওয়া। কিন্তু কীভাবে সমস্ত কিছু অতিক্রম করে, বন্ধুর ও অন্ধকার পথ পেরিয়ে, নিয়ত সংঘর্ষে ও আঘাতের হোঁচট খেয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছচ্ছে কবির অনুভব ও জীবনদর্শনে, সেইটাই লক্ষণীয়। এই কবিতার রচনাকালও উনিশশো আটচল্লিশ, জীবনানন্দের তিনটি উপন্যাসের

রচানাকালও এই একই সালে; করুণা, দয়া, মহানুভবতা. সূর্যোদয়—এইসব অনুভবের সঙ্গে কবিতার অনুভব মিলে যায় একই সময়ে রচিত কবিতায়। কিন্তু কবিতার ভাষাশৈলী অনেক সংহত গভীর রহস্যময়, শিল্পরহস্যে অনির্বচনীয়, তীব্র দ্যুতি ও গতিময়, উপন্যাসের বিস্তারতা জীবনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে—বিচিত্রভাবে বিস্তৃত করে দেখেছে।[1] এই কবিতাটির মধ্যেই উপন্যাসের সব বিষয় আছে নিহিত কুঁড়ির মতো। উপন্যাসের স্বাদ স্বতন্ত্র।

তাঁর প্রবন্ধের ভাষার মধ্যেও কবিতার ভাষারীতিই কাজ করেছে ; তার ফলে, বুদ্ধদেবের লেখার মতো, জীবনানন্দের গদ্য তরতর করে পড়া যায় না। প্রথমে একটি বাক্য বলেন, সেই বাক্যটিকে অন্য প্রসঙ্গ এনে সরিয়ে দেন, ড্যাশ দিয়ে সেই বাক্যটিকে আরো বিস্তারিত ও পূর্ণ করে তোলেন। দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম বাক্যটির বিশ্লেষণ ও বিস্তার হয়। বন্ধনী ব্যবহার করে কোনো একটা প্রশ্নকে জোর দেন। তৃতীয় বাক্যে প্রথম বাক্যের অস্বীকৃতি ঘটে, এবং চতুর্থ বাক্যে নিজের সিদ্ধান্ত বলেন। যেমন : 'কবিতা 'ব্রহ্ম'র চেয়ে ঢের অল্প পরিসরের জিনিস'—(রুচি বিচার ও অন্যান্য কথা —চৈত্র, ১৩৫৬, পূর্বাশা)।

আলোচনার গদ্যেও এমন সব শব্দে বিশেষণ গড়ে তোলেন, প্রথমত থামতে হয়, ভাবতে হয়, বুঝে এগোতে হয় : 'সফল গভীর মুহূর্তে'।

'মানুষের আবহমান পৃথিবীর শীর্ষে এই নতুন পৃথিবী এবং মানুষের অনেকদিনেব চেনা সত্য-মিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে আজকের নতুন মিথ্যা ও সত্যের শরীরে অঙ্কিত বিজ্ঞানের স্বাক্ষর—এইসব নিয়েই আজকেব কবির সৃষ্টিবলয়।....যে-কোনো সময়ের যে-কোনো জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে. সে-আধার সক্রিয় কবি-মন—কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।' (কবিতার আত্মা ও শরীর, শারদীয় বসুমতী, ১৩৫৪)।

নতুন কথা কিছু বলেননি জীবনানন্দ, কিন্তু শব্দগঠনের অভিনবত্বে, বাক্যের বিচিত্র ভঙ্গিমায়, ঘাত-প্রতিঘাতে, এগোনো-পিছনোয়, পিছিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টায়—লেখকেব আন্তরিক আকৃতি ব্যক্ত হয়েছে। এই আকৃতিই জীবনানন্দ।

---

[1] এ-প্রসঙ্গে 'লা পয়েজি', ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় বার্ণিক রায়ের লেখা 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' নামে আলোচনা পঠিতব্য। 'জীবনানন্দ দাশের গল্পগুলি কবির হাতে লেখা, সুতরাং তাঁর কাব্যগুণ এর মধ্যে পরিপূর্ণ বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক জীবনের জটিলতা, টেনশন, নার্ভের সচল প্রবাহ, প্রেমকামপ্রবৃত্তি, সুখ ও আরামের সঙ্গে দুঃখের বিরোধ, হৃদয়ের অসাড়তা, অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে নারীলোলুপতা, স্বপ্ন ও বাস্তব, ব্যর্থতা ও হতাশায় অতিবাহিত যুবাপুরুষের মৃত্যু জড়িয়ে আছে। জীবনানন্দ কবিতার গহন গভীরতায় ত কখনোই এতো নাটকীয়তার তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন নি।' 'গল্পগুলির মধ্যে জয়েস হাক্সলি কাফকার সারাৎসার পাওয়া যায়, 'গ্রাম ও শহরের' গল্পের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মনের অনেক সাযুজ্য লক্ষিত হবে। গল্পগুলির মধ্যে বাস্তব-অবাস্তব স্বপ্ন ফ্যান্টাসি নাটকীয়তা চেতন-অবচেতন এবং কাব্য একসঙ্গে মিশে গেছে, জীবনের গভীরে, গোপন তলদেশে নিয়ে যায়, আমাদের চিত্তকে প্রশান্ত করে না, আশঙ্কা-আতঙ্কে ও কল্পনা আকাঙ্ক্ষায়, আমাদের শিহরিত করে, নানাবিধ বেদনায় দুলতে থাকে, আমাদের সত্তার সামগ্রিকতাকে ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দেয়। আধুনিক বাংলাগল্পে জীবনানন্দের গল্পের স্থান অনিবার্যভাবে স্বীকৃত।' —(পৃ ৪৪৩-৪৪৪)

জীবনানন্দের গল্পে-উপন্যাসে শরীরের স্বাদ, যৌনতা, শীতরাত্রির শারীর আবেগের তীব্রতা কি ব্রাহ্মধর্মের ভিক্টোরিয় যুগের নির্বোধ নীতিবাগীশতার বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ? না, 'কল্লোল'-প্রভাবিত?

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ

এক বাউল গানে বলেছেন : 'ডুবতে কিরে সবাই পারে? রূপসাগরের তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে'—রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক ঔপনিষদিক মনস্কতায় গেয়েছেন : 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।' প্রকৃতির জগৎই হলো রূপের জগৎ, অব্যক্তে অরূপে হয়তো আকাঙ্ক্ষার আনন্দে মানুষ ডুবতে চায়; কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব জগতের রূপের পারস্পরিক সম্পর্কে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পাওয়া, এই রূপেই আনন্দ ও অমৃত।

জীবনানন্দ কি রূপসাগরের তরঙ্গে ভেসে গেছেন, অর্থাৎ শুধু রূপই দেখেছেন, বাইরের জগতের রূপের সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে দিয়ে অনুভূতির অপরূপকে লাভ করতে চান নি? 'মৃত্যুর আগে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে অন্তর্ভূত কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন জীবনানন্দের কবিতা 'চিত্ররূপময়'; কিন্তু এরকম হঠকারী উক্তি তিনি করেন নি যে জীবনানন্দ প্রকৃত প্রকৃতির কবি : আরেকটি হঠকারী উক্তি হচ্ছে, জীবনানন্দ নির্জনতম কবি। যে-কবি লিখতে পারেন 'আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন।' ('সাতটি তারার তিমির') ইতিহাসচেতনা নিশ্চয় নির্জনতার কথা বলে না, বিমূর্ত অনুভবকে রূপময় ও চিত্রে দীপ্ত করে তুলেছেন 'পাখির উপমায়', পাখির মধ্যে গতি চঞ্চলতা মুক্তি দূরের আকাশ, আকাশ ছাড়িয়ে যার অদৃশ্য ইঙ্গিত প্রাণের স্পন্দনে আভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর চেতনায় মাটি ও আকাশ, আকাশ ছাড়িয়ে আরো কিছু দূরতম সুর আধো-আলোময় হয়ে ওঠে। সেখানে সজন-নির্জন মিশে থাকে, ভয়প্রেম জ্ঞানভুল-সমন্বিত মানবতা রোল আরো বড়ো চেতনার লোকে প্রবেশ করে। 'উত্তরপ্রবেশ' কবিতায় তার উজ্জ্বল রূপ 'আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।' তাঁর মৃত্যুর আগে উনিশ শ চুয়ান্ন সালের বিশে এপ্রিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় নিজেই বলেছেন তাঁর কবিতায় সামগ্রিকবোধের প্রকাশের কথা : 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার; অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী : সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়্যালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায়-সম্বন্ধে খাটে। সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিশেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুইই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ তারতম্যের, সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয়।' জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যের সুরের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কোথায়? আমার মনে হয় 'দু'দিকে' কবিতার মধ্যেই এর ইঙ্গিত আছে :

> পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
> আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
> অন্তহীন হরিতেব মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

প্রকৃতি-সম্বন্ধে সজাগ সব কবিই, প্রকৃতি মানুষকে জন্ম দিয়েছে, তাই রূপময় প্রকৃতিকে দেখে সংবেদনশীল কবি ও মানুষ বিস্মিত বিহ্বল; কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম করে আরেক যে

প্রকৃতি যার কথা বিখ্যাত জর্মন কবি বলেন, সেখানে কেউ পৌঁছোতে পারে না, তার আভাস শুধু গায়ে লাগে সুরের মতো, সেই আভাসকেই কল্পনার অনুভূতিতে বিচিত্র রঙিন করে তোলে কবিরা, জীবনানন্দও তাই করেছেন: 'অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।'

কোনো কবিই রোম্যান্টিসিজমের পর প্রকৃতিকে শুধু বস্তুরূপে বাইরে থেকে দেখতে পারে না, বাইরের প্রকৃতি হৃদয়ে আসে। মানবহৃদয় প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম হয়ে যায়, যখন একাত্ম হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো কবি মনে করেন, পৃথিবীর সৃষ্টির পরে সমুদ্রের ভেতরে অ্যামিবার সঙ্গে জন্ম নিয়ে কোটি জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছেন। জীবনানন্দ এতোটা মনে না করলেও জন্ম থেকে প্রকৃতির পরিবেশে যে-শান্তি স্থিরতা ও সমন্বয় দেখেছেন চেয়েছেন ও পেয়েছেন, তাতে জীবনানন্দের মনে হয়েছে প্রকৃতি আদিজননী, সে অদিতি, অন্ধকারের পর প্রথম চেতনার আলো দূরতম আকাশে, তাই প্রকৃতি তাঁকে সান্ত্বনা দেয়; পৃথিবীর ও মানুষের কোলাহলকে নিয়েই : ...'প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর; সেই কোন্ আদিম জননীর কাছে যেন, রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির কাছে।' (কবিতার কথা—১৩৪৫, কবিতা) এখানে 'যেন' শব্দটি উল্লেখযোগ্য, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেও, সান্ত্বনা পেয়েও একাত্ম হতে পারছেন না। যে-অর্থে কোনো কবিকে আমরা প্রকৃতির কবি বলি, জীবনানন্দের সঙ্গে এখানেই ভেদ। কোনো ইংরেজ রোম্যান্টিক কবি যখন প্রকৃতিকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিযে বলেন, তাঁর জীবনদর্শন ও স্বাদ আলাদা : বনের অমেয় শীর্ষতা, অক্ষয় জলপ্রপাতের স্তব্ধ ঝড়, প্রতি বাঁকে বাতাসের ফাড়, বাতাস বাতাসকে সংঘাত করছে, উন্মাদ পরিত্যক্ত, পরিচ্ছন্ন আকাশ থেকে খরস্রোত তীব্রবেগে ছুটে চলেছে। পাহাড় নিবিড়ভাবে কথা বলছে আমাদের কানে, কালো গুরিগুরি বৃষ্টি-ভেজা পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পথের পাশে কথা বলছে, যেন তাদের ভেতরেই কণ্ঠস্বর; উন্মাদ স্রোতের ক্ষীণ ও জমকালো দৃষ্টি, মুক্ত মেঘ, ক্ষুব্ধ ও শান্ত আকাশ; আলো-অন্ধকার—এই সব দৃশ্য ও ছবি একই মনের কাজ; একই মুখের বিচিত্র রূপ; একই গাছের বহু ফুল, বিরাট রহস্যের প্রকাশ হচ্ছে বিচিত্রভাবে, শাশ্বতের প্রতীক ও বিশিষ্ট রূপ; আদি মধ্যে অন্তে আছে অশেষ। প্রকৃতির মধ্যে শুধু জীবন নয়, জগদতীত জীবন আছে। এমনিভাবেই এই রোম্যান্টিক কবি জগৎকে দেখেছেন; জীবনানন্দ নিশ্চিত এভাবে প্রকৃতিকে দেখেন নি; তাই তাঁকে প্রকৃতির কবি বলাটা মূঢ়তা। বীভৎস মূঢ়তা আরো প্রকট এইরকম উক্তিতে, জীবননান্দের কবিতায় তত্ত্ব ও চিন্তাশীলতা নেই, ইন্দ্রিয়ময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। জীবনানন্দের কবিতা নিছকই কবিতা, কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়! অভিজ্ঞতা চিন্তাশীলতা ব্যতিরেকে কীভাবে গড়ে ওঠে আমার জানা নেই। তাঁর কবিতায় যে তত্ত্ব অন্তর্নিহিত, 'ক্যাম্পে' কবিতার বিশ্লেষণে তিনি নিজেই বলেছেন : 'যদি কোনো একটিমাত্র স্থির নিষ্কম্প সর এ-কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের মানষ কীট ফড়িংয়ের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়—'ক্যাম্পে' কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এইমাত্র। কবিতাটির এই সুর শিকারি, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল—পৃথিবীর ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়—বিষণ্ণ যতোখানি; বিষণ্ণ—নিরাশ্রয়।..... সৃষ্টি যেন তেমন এক শিকারি। আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার, সকল শিকার চলেছে; প্রেমপ্রাণ স্বপ্নের একটা ওলটপালট ধ্বংসের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সব দিকে।' 'কবিতার কথা'য় বলেছেন : 'কবিতার সত্য গণিতের মতো অব্যর্থ—স্বাদের

সমস্ত পার্থক্যের ভিতর দিয়ে।' গণিতের সত্যও যদি চিন্তাশীলতা ও তত্ত্ব না হয়, তাহলে চিন্তাশীলতা কী, আমি জানিনা।

কবিতায় শব্দধ্বনি, সুরে ছবিতে দেহের স্বাদের ইন্দ্রিয়ময় নিবিড়তা এতো গভীর ও ব্যাপক যে আস্বাদনটাই প্রথমে আমাদের পেয়ে বসে, আস্বাদনের পরে অর্থ বোঝাতে বাধ্য করে বুদ্ধি দিয়ে। এক বিদেশিনীর ভাষায় বলা যায় : জীবনানন্দের কবিতাপাঠের আনন্দ শারীব হয়ে ওঠে, যেন সূর্য মদ আঙুব ও যথার্থ প্রশান্তি ও তীব্র জীবনময়তা সম্মিলিত। জীবনানন্দের ভাষায় বলা চলে, দেহের স্বাদ কথা কয়।

প্রতিরাত্রে স্বপ্নে যাকে তিনি দেখেছেন তাকে সাজিয়েছেন প্রকৃতির বিচিত্ররূপে : 'ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, পাকা আপেলের লাল যার গাল/চুল যার শাঙনের মেঘ, আঁখি যার গোধূলির মত, গোলাপি রঙিন/ আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে,—স্বপ্নে—কতদিন!' স্বপ্নে প্রকৃতি ও মানুষ এক হয়ে গেছে। 'মৃতুর আগে' কবিতায় ছোট বড়ো বিচিত্র বস্তুর ছবি আলো-আঁধারময় সুরে চিত্রিত করে মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে জগৎকে মানুষকে ভালোবেসে নিবিড় আস্বাদন করতে চাইছেন, জানেন মৃত্যু অনিবার্য; অনিবার্য মৃত্যুতে পৌঁছুবার আগে সত্তার গভীরতার মধ্যে এই সব ছবি মায়াবী সুবে এঁকে নিচ্ছেন ; ধুন্দুল জোনাকিতে ভরে আছে ফসলহীন মাঠের ওপর চুপ করে দাঁড়ানো চাঁদ। মৃত্যুর আগে এই স্বপ্নময় মায়াবী ছবি দেখে সাধ মেটাতে চান তিনি। প্যাঁচার মধ্যে ক্ষয়ের ছবি প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যে : 'বাঁশপাতা—মরাঘাস—আকাশের তাবা,/বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা;/ধানখেতে—মাঠে/জমিছে ধোঁয়াটে/ধারালো কুয়াশা;/ঘরে গেছে চাষা;/ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী—/তবু পাই টের / কার যেন দুটো চোখে নাই এ-ঘুমের/কোনো সাধ।' ('প্যাঁচা') জীবনানন্দের কবিতায় শিশিরের সুব লেগে থাকে বলেই মদিব আচ্ছন্নতা পেয়ে বসে। 'রূপসী বাংলা' শব্দের মধ্যেই ইঙ্গিত, বাংলার রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ; জাম-বট-কাঁঠাল-অশথ ফণী-মনসার ঝোপ, শটীবন দেখে মনে পড়ছে চাঁদসদাগরের কথা, স্মৃতিতে ভাসে বেহুলাকে ; গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে ভেসে এইসব রূপ দেখেছিলো সে।' রাঙা মেঘ সাঁতরে অন্ধকারে ধবল বক ফিরছে : 'আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে', অর্থাৎ আবহমান বংলার সঙ্গে 'সমষ্টিগত অবচেতন' কাজ করছে।

প্রকৃতির ছবিব ভেতরে বোধের ও বোধির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলাই জীবনানন্দের কবিহিশেবে চরিতার্থতা : 'থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশথের ডালে ব'সে এসে,/ চোখ পাল্টায়ে কয় : বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?'

—